একাদশ বর্ষ ৩৯তম সংখ্যা
১৬শ ইন্টারনেট সংখ্যা

জয়ঢাক

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখার নাম		লেখা	আঁকা/গ্রাফিক্স
১	মলাট				ইন্দ্রশেখর
২	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		গৌরী গাঙ্গুলি	সোমা
৩	কমিকস্	ভারণ্ড কথা		দেবজ্যোতি	মৌসুমী
		চম্পক ঘোড়ার গল্প		অনুপম চক্রবর্তী	অনুপম চক্রবর্তী
৪	গল্প	(ক)	চিত্রকূট	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
		(খ)	হলিঙওয়ে ম্যানসনের ঘটনা	কোস্টা ক্যরুসো অনুঃ অমিত দেবনাথ	মৌসুমী
		(গ)	কমলরাম	ইন্দ্রনাথ	মৌসুমী
		(ঘ)	পদভূতের কারসাজি	অচিন্ত্য সুরাল	সোমা
		(ঙ)	পিকনিক	তাপসকিরণ রায়	অনুপম চক্রবর্তী
		(চ)	স্বপ্নের দেশে পঞ্চমী	সোনালী ঘোষাল	অনুপম চক্রবর্তী
৫	ভ্রমণ	ঈশ্বরের নিজের দেশে		ড পি বি গঙ্গোপাধ্যায়	সংগৃহীত
৬	বিচিত্র দুনিয়া	নেমে এসো		অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত
৭	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	দেবজ্যোতি
		(খ)	টেকনো টুকটাক	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(গ)	ভারতের বিজ্ঞানী	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
৮	বনের ডায়েরি	(ক)	বনের ছড়া	তরুণ সরখেল	মৌসুমী
		(খ)	ভারতের বনাঞ্চল	সংহিতা	সংগৃহীত
৯	**ছড়া**	(ক)	আষাঢ়ে গল্প	জ্যোতির্ময় দালাল	সৌভিক
		(খ)	বন্দি	লীনা ভট্টাচার্য	মৌসুমী
		(গ)	মহাকাশযান	রতনতনু ঘাটী	সৌভিক
		(ঘ)	রবীন্দ্রনাথের ব্রেকফাস্ট	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
		(ঙ)	মক্ষিরানি	সংহিতা	সোমা
		(চ)	রিংকির কাণ্ড	অচিন্ত্য সুরাল	সৌভিক
		(ছ)	সূর্যমুখী	জামাল ভড়	সোমা
১০	দেশ ও মানুষ	এক অটোওয়ালার গল্প			সংগৃহীত
১১	ধাঁধা- মজা- রহস্য	(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(খ)	ড্রুডল	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(গ)	কুইজ	ইন্দ্রশেখর	
		(ঘ)	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর	মহাশ্বেতা
		(ঙ)	হযবরল	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(চ)	জানো কি	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ছ)	মজার ইন্টারনেট	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(জ)	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
		(ঝ)	মজার খেলা	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি
১২	ধারাবাহিক উপন্যাস	বগাচি জাতির সন্ধানে		শৌনক হালদার	মৌসুমী
১৩	কাতুকুতু	(ক)	নতুন রূপকথা	সংগৃহীত	সংগৃহীত

		(খ)	ডাক্তারী	সংগৃহীত	সংগৃহীত
১৪	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	গোরস্থানে সাবধান	অরুন্ধতি	মুকুট
		(খ)	বাড়ি পালানোই ভালো (কমিকস্)	রঙ্গিত মুখোপাধ্যায়	রঙ্গিত মুখোপাধ্যায়
		(গ)	গ্যালারি		বউল, অন্তরা, সমাদৃতা, রূপসু
১৫	পুরান কথা	রাজা সোমকান্ত		টুপুর	মৌসুমী
১৬	রাশিয়ান গল্প	সিংহ আর কুকুরছানা		লিও টলস্টয়	সংগৃহীত
১৭	পুরাতনী	দূরের পাল্লা		সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	মৌসুমী
১৮	সেই আয়না			সুজয় রায়	মৌসুমী
১৯	স্মরণীয় যাঁরা	গসিনি		মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২০	সুরঢাক	এসো গান শুনি		প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
২১	খেলা	এভারেস্ট		এরিক শিপটন (অনুঃ)বাসব চট্টো	সংগৃহীত
২২	টাইম মেশিন	ঠগীর আত্মকথা		অলবিরুনি	মৌসুমী
২৩	বই পড়া	এশিয়ার উপকথা		মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
২৪	লোককথা	সমুদ্রের জন্মকথা		মহাশ্বেতা	মৌসুমী
২৫	ট্রেকিং	হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট		রাজকুমার রায়চৌধুরী	সংগৃহীত (ম্যাপঃ শান্তনু)
২৬	বিশ্বের জানালা	বুরুণ্ডি		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

অক্ষরবিন্যাসে

ফটোগ্রাফার উমাদি

ওয়েবকবি সংহিতা

কবি-পাহাড়ু শান্তনু

তুলিতে, মাউসে, ক্যামেরায়

দ্য হিন্দু-র সৌভিক,

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে,তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

সরকারী কর্মী মৌসুমী

রিজার্ভ ব্যাংকের সোমা,।

শিল্পী-এঞ্জিনিয়ার অনুপম

জয়ঢাকের কাজ করতে এগিয়ে এসেছে ইশকুলপড়ুয়ারাও। অক্ষরবিন্যাসে, বুক রিভিউতে এবং ছবি আঁকায়। এইখানে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম–

মহুল
অক্ষরবিন্যাস

মহাশ্বেতা
শিক্ষানবীশ সমপাদকঃ
পুরাতনী, বুক রিভিউ
ও স্মরণীয় যাঁরা বিভাগ

মুকুট
ছবি আঁকা

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদদেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)
অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়
আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদদুস।
ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন,
১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯
মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

জয়ঢাকি বোল

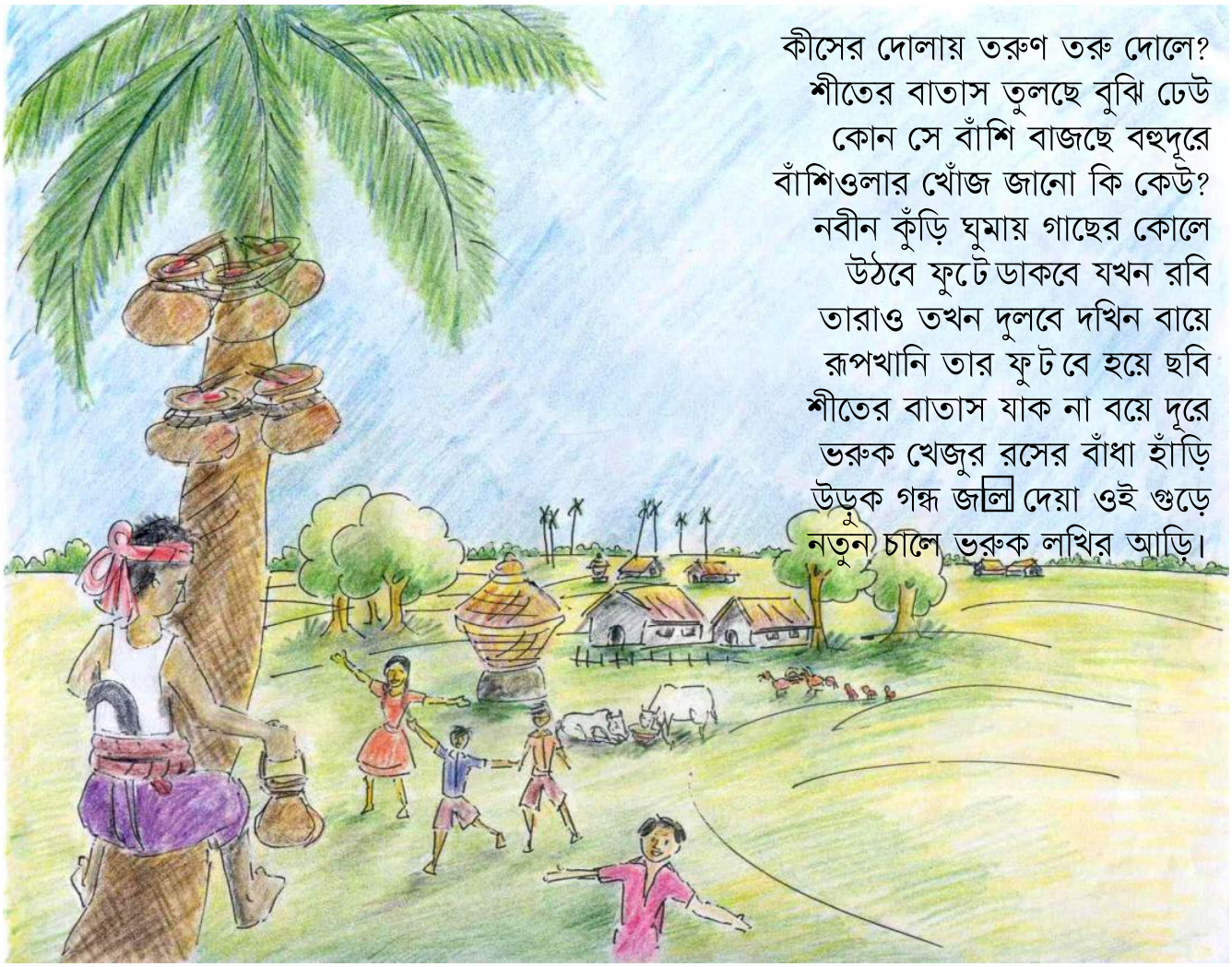

ভালো থেকো তোমরা সবাই। শীতের দিনে অনেক মজা কোরো। এই সংখ্যায় জয়ঢাকে বোল তুলেছেন তোমাদের গৌরী দিদিমনি মানে **শ্রীমতি গৌরী গাঙ্গুলি।**

ভালোবাসায় ,

তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা

ছবিঃ সোমা

লেখাঃ দেবজ্যোতি

ভারণ্ড কাব্য

ছবিঃ মৌসুমী

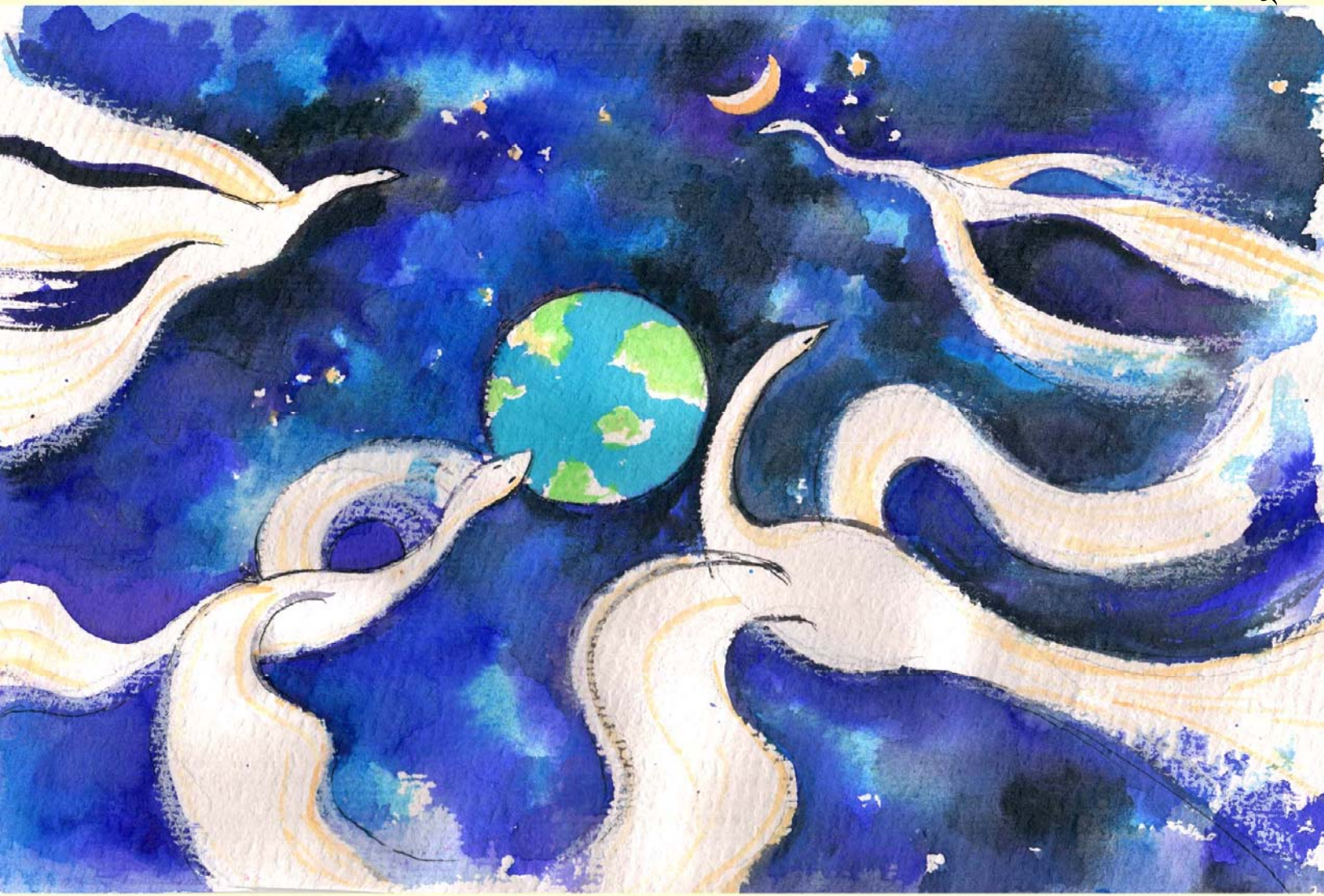

ভারণ্ড হেন দ্বিতীয় একটি পাখি
দুনিয়ায় নেই এ কথাটা জেনো ঠিক
কারণ সহজ যেন ঠিক জলবৎ--
পাখিটা কাল্পনিক!

কুয়াশা এবং আলো দিয়ে গড়া ডানা
মেলে তারা দেয় তারাদের দেশে হানা
কখনো সখনো একটু সময় পেলে
পৃথিবীকে ঘিরে গোল্লা ছুট্-ও খেলে

খেলতে খেলতে পৃথিবীতে নেমে এসে
পেঞ্চের বনে কালাপাহাড়ের পাশে
সূর্যাস্তের মিনিট কয়েক পড়ে
ডিম পেড়ে যায় বছরে একটা করে।

পাথরের সাথে মিশে থাকে সেই ডিম
পার হয়ে যায় গ্রীষ্ম, শরৎ, হিম
অবশেষে এক বর্ষার কালো রাতে
বিজলি যখন খেলে আকাশের ছাতে

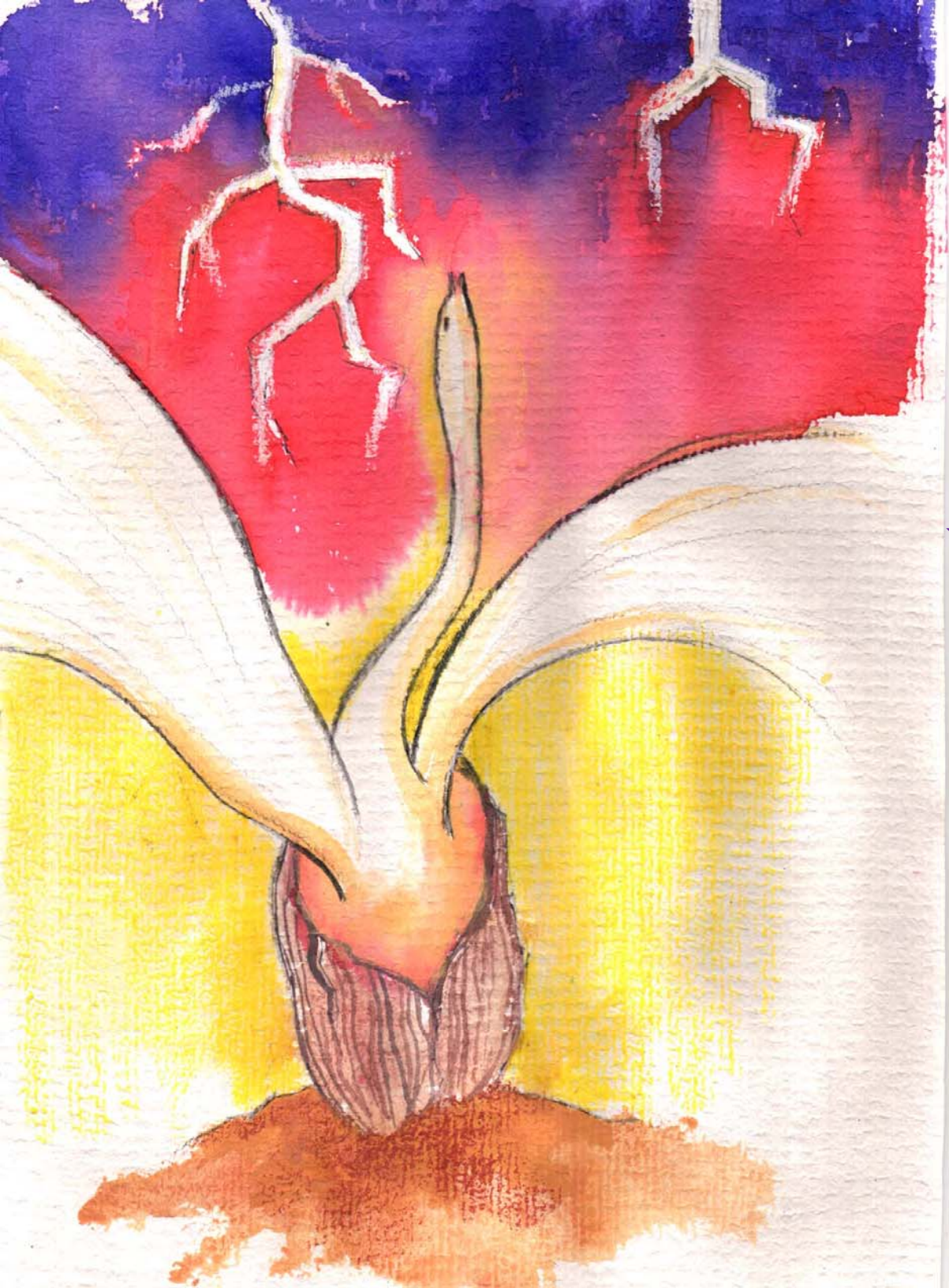

তখন হঠাৎ
ঘন অরণ্য থেকে
দু'হাজার বাজ
একসাথে ওঠে ডেকে
ফেটে গিয়ে সেই
পাথরের ডিমখানা
বের হয়ে আসে
আলো কুয়াশার ডানা
আকাশের দিকে চেয়ে
ফিক করে হেসে
পাখি ফিরে যায়
ফের তারাদের দেশে।

ভারণ্ড হেন
দ্বিতীয় একটি পাখি
দুনিয়ায় নেই
এ কথাটা জেনো ঠিক
কারণ সহজ
যেন ঠিক জলবৎ--
পাখিটা কাল্পনিক!

লেখা ও রেখাঃ
অনুপম চক্রবর্তী

চম্পক ঘোড়ার গল্প

এক দেশে ছিল এক ঘোড়া। তার নাম ছিলো চম্পক।

চম্পক থাকতো সেই দেশের রাজার ঘোড়াশালে মানে রাজার ঘোড়াদের আস্তাবলে। কিন্তু--

চম্পকের যুদ্ধটুদ্ধ একেবারে ভালো লাগতো না। ওর শুধু ইচ্ছে করতো জঙ্গলে গিয়ে খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে।

রোজ সকালে পুরো সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ হত। সেই কুচকাওয়াজ নিজে দাঁড়িয়ে দেখতেন সেনাপতি মারকুট্টিলাল

এই মারকুট্টিলাল ছিল ভয়ানক রাগী লোক। সব্বাই তাকে খুব ভয় পেত। আর চম্পক? চম্পকের খুব রাগ হত সেনাপতির ওপর।

কারণ ওই মারকুট্টিলাল রোজ সকালে তাকে যুদ্ধ শেখাতে আসতো

আর চম্পক শিখতে চাইতো না বলে তাকে চাবুক দিয়ে মারতো

৬

৭

চম্পকের মনে তাই ছিলো খুব কষ্ট। ওর ইচ্ছে করতো জঙ্গলে পালিয়ে যেতে।

৮

একদিন তো চম্পক মারকুট্টিলালের কথা শোনেনি বলে রেগে গিয়ে মারকুট্টিলাল চম্পকের লেজ দিলো কেটে।

৯

যুদ্ধের নাম শুনেই তো চম্পক ভয় পেয়ে গেল।

তার ওপর লেজ কেটে দেয়ায় রেগে গিয়ে ও চেষ্টা করলো সেনাপতিকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে।

কিন্তু মারকুট্টিলাল তাকে জোর করে নিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে গিয়ে তো চম্পকের আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

চম্পক যুদ্ধ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক করলো ওখান থেকে পালাবে।

সে তখন উল্টোদিকে লাগালো ছুট। সেনাপতি অনেক চেষ্টা করলো----

কিন্তু চম্পকের মুখ ঘোরাতে পারলো না।

চম্পক এত জোরে ছুটতে লাগলো--

যে মারকুট্টিলাল তার পিঠ থেকে পড়ে গেল।

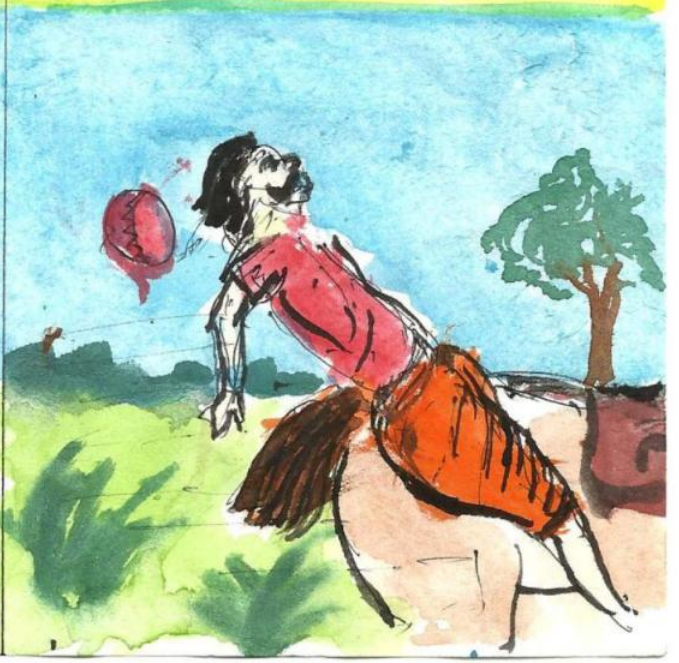

তাও মারকুট্টিলাল কোনমতে তার পিঠ আঁকড়ে রইলো।
তখন ছুটতে ছুটতে চম্পক একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা পুকুরে নেমে পড়লো। সেখানে অনেক জল।
তখন মারকুট্টিলালও জলে পড়ে গেল।
এদিকে যুদ্ধ শেষ করে রাজা তাঁর সেনাপতিকে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলে এলেন।
এসে দেখলেন তাঁর সেনাপতির অবস্থা। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার জন্য সেনাপতির ওপর রাজা খুব রেগেছিলেন।
রাজার সঙ্গে যে সৈন্যরা এসেছিলো তারা রাজাকে বললো যে মারকুট্টিলাল চম্পককে জোর করে যুদ্ধ করতে নিয়ে গিয়েছিলো, আর এ-ও বললো যে ও চম্পকের লেজ কেটে নিয়েছিলো।
তাই শুনে রাজা মারকুট্টিলালের ওপরে খুব রেগে গেলেন।
তিনি সৈন্যদের বললেন চম্পককে জঙ্গলে ছেড়ে দিতে, আর মারকুট্টিলালের গোঁফ কেটে দিতে।

মূল কাহিনিঃ কোস্টা ক্যারুসো- র মাইন হোস্ট – দ্য গোস্ট
অনুবাদঃ অমিত দেবনাথ

সারাটা দিন অসহ্য গরম ছিল। কিন্তু এখন একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশে শুরু হয়েছে মেঘের আনাগোনা। পথচারীরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে উৎসুকভাবে তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে। মেঘের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যকে দেখা যাচ্ছিল বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই মেঘের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতঝলক। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছিল চারদিক; ঐ শোনা যায় গুরুগুরু মেঘের গর্জন। প্রবল বৃষ্টি নামল বুঝি, আর দেরি নেই।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম আমি, দেখতে দেখতে বলে উঠলাম, "সৃষ্টির প্রথম সকালটা বুঝি এরকমই ছিল"।

"প্রলয়ের পর প্রথম সকালও হতে পারে"।

চমকে উঠে তাকালাম। পাশে কখন একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই করিনি। বেঁটেখাটো, শীর্ণকায় একজন মানুষ। মাথার চুল সব সাদা, চোখদুটো কালো আর উজ্জ্বল। কিন্তু লোকটা আমার কথা শুনলো কি করে? নিজের অজান্তেই কথাটা জোরে বলে ফেলেছি নাকি?

"মার্জনা করবেন, " লোকটা নম্রভাবে বলল, "কিন্তু আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি কি করে আপনার মনের কথা বুঝে ফেললাম"।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা নাড়লাম শুধু।

"এটা বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়, " লোকটা বলল, "আমি জানি যে তরুণ লেখকরা প্রথমে উপমা খোঁজে। সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে একই রকমের হয়। কাজেই আপনি নিশ্চয়ই এই দৃশ্যটাকেও সৃষ্টির প্রথম সকাল বলেই ভাববেন। কারণ ওটাই সবাই ভাবে, তাই আমি উল্টোটা বললাম"।

"আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি লেখক?"

একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল লোকটার ঠোঁটে, কিন্তু কথায় সেটা ধরা পড়ল না। বরং, বারটেন্ডার জর্জকে ডাক দিয়ে ভদ্রলোক আমায় বললেন, "চলুন, একটু পান করা যাক"।

ঠিক তখনই ফেটে পড়ল ঝড়। ঝলসে উঠল বাজ। ভয়ংকর শব্দে কেঁপে উঠল ঘরের দরজা জানলা। বৃষ্টি নামল মুষলধারে। ঝাপসা হয়ে গেল চারদিক। তারপর ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের চাবুক সারা আকাশকে ফালা ফালা করে দিতে লাগল।

"বাপস্!" আমি বললাম, "কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ বৃষ্টি ধরবে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"চলুন তাহলে বসা যাক"।

আমি রাজি হয়ে গেলাম, কারণ ভেবে দেখলাম এখানে যদি কয়েকঘন্টা কাটাতেই হয়, তাহলে এই বৃদ্ধ, পুরোনদিনের মানুষটার সঙ্গে কাটানোই ভালো। লেখালিখির কিছু রসদ জুটে যেতে পারে। অতএব একধারে দুটো চেয়ার দখল করে বসা গেল।

"গত আট ন বছরের মধ্যে এরকম ঝড়বৃষ্টি আমি আর দেখিনি", আমি বললাম আমার তো সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওই যে হলিংওয়ে ম্যানসনে বাজ পড়ে তিন ভাই মারা গিয়েছিল। মনে পড়ছে?"

ভদ্রলোক সোডা মেশানো স্কচে আরাম করে একটা চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, "হলিংওয়ে ম্যানসনে কোনো বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেনি"।

সবাই জানে ঘটনাটা। বাজ পড়ে হলিংওয়ে ম্যানসন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে পুড়ে মরেছিল ভিতরে থাকা তিন খুড়তুতো ভাই। এখন যদি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই ঘটনাটা সম্বন্ধে নতুন কিছু কথা, শোনান তো আমি শুনতে আগ্রহী।

"তাহলে কি হয়েছিল?", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওখানে ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়েছিল", বৃদ্ধ জবাব দিলেন। আরেক চুমুক দেওয়ার জন্য গ্লাসটা তুলেও থেমে গিয়ে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর লাগিয়েছিল এক প্রেতাত্মা"।

চমকে গিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, আমার চমকানিটা তিনি উপভোগ করছেন।

"দয়া করে আজগুবি গল্প শোনাবেন না", আমি বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে আমি ভূতপ্রেত বিশ্বাস করব"।

"নিশ্চয়ই না", বৃদ্ধ বললেন, "কিন্তু হলিংওয়ে ভাইরা করত"।

প্রচণ্ড কৌতুহল হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই বুড়োর কাছে দারুণ গল্পের রসদ আছে। একজন লেখকের কাছে এটা দারুণ পাওনা। অতএব ধীরেসুস্থে এগোন দরকার।

"আপনি নিশ্চয়ই লেখক?" আমি বললাম।

"ছিলাম," বৃদ্ধ উত্তর দিলেন। বাইরে বিকট শব্দে কোথাও একটা বাজ পড়ল। বৃদ্ধ হাসলেন।

"ঘটনাটা বলুন", আমি বললাম, "হলিংওয়ে ম্যানসনে বাজ পড়েনি, ওখানে একটা প্রেতাত্মা আগুন লাগিয়েছিল। ঐ তিনজন দুর্ঘটনায় মারা যায়নি, তাদের খুন করা হয়েছিল"।

"সেটা", বৃদ্ধ বললেন, "আপনি ভাবতেই পারেন"। তাঁর গ্লাসটা খালি হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং আমি জর্জকে একটা গোটা বোতলই আনতে বললাম। তারপর গুছিয়ে বসলাম গল্পটা শোনার জন্য। তিনি শুরু করলেন। বাচনভঙ্গীটি চমৎকার – এতই চমৎকার যে আমি যেন ফিরে গেলাম ন'বছর আগের সেই

সময়টায়, এক বর্ষণমুখর রাতে যখন হলিংওয়ে ম্যানসনের দেয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছিল জল, দূরে দেখা যাচ্ছিল এরিক হলিংওয়ের গাড়ির তীব্র আলো, গাছে ছাওয়া রাস্তা মাঝখানে দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়িটা এগিয়ে আসছিল পাঁচিল ঘেরা ম্যানসনের দিকে –

* * *

এরিক গাড়ি থেকে নেমে দমাস করে দরজাটা বন্ধ করেই কোটের কলারটা তুলে দিল। ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। তার আলোতে দেখা গেল ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদোপম খালি বাড়িটা। পরমূহুর্তেই অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। বৃষ্টি পড়ছিল অঝোরে। এরিক দৌড়োচ্ছিল বাড়ির দিকে, হোঁচট খেয়ে তাল সামলাতে সামলাতে। দরজার কাছে গায়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। স্যুইচ বোর্ড হাতড়ে স্যুইচ টিপতেই আলোয় ভরে উঠল ঘর। তারপর সবকটা ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, বাথরুম, খাটের তলা, আলনার পেছন – সব। তারপর ফিরে এলো ড্রয়িংরুমে, পায়চারি করতে লাগল ক্রমাগত।

আধঘন্টা বাদে চারনম্বর সিগারেটটা শেষ করে পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করে দেখল আরেকবার। তাতে লেখা আছে, "আজ রাত গ্রামের বাড়িতে এসো"।

ঠিক এই সময় বাইরে একটা আওয়াজ শুনে এরিক তাকিয়ে দেখল দরজার বাইরে তার খুড়তুতো ভাই জিম দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার জন্য সারা শরীর আর জামাকাপড় থেকে জল গড়িয়ে মেঝেতে একটা ছোটোখাটো পুকুর তৈরি হয়েছে।

"আমি এসে গেছি", জিম বলে উঠল, "কি ব্যাপার তোমার?"

"আমার কি ব্যাপার! তোমার কি ব্যাপার?"

"আমার আবার কি ব্যাপার," জিম বলল, "তুমি আসতে বলেছ, তাই চলে এলাম"। সে পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে দেখাল এরিককে।

এরিক পড়ে দেখল তাতে একই কথা লেখা। "তোমায় কে বলল এটা আমি পাঠিয়েছি?"

"মানে?" জিম বলল, "প্রথমে পুরো ব্যাপারটা তোমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, তাই আমি ভাবলাম - "

"আমার মাথা থেকে বেরিয়েছিল!" গর্জন করল এরিক, "বাজে বোকো না। আমরা সবাই ব্যাপারটাতে জড়িত। তুমি সেটা ভালোই জান"।

"সে তো ঠিকই," জিম বলল, "মাথা গরম করার কিছু নেই। তুমি টেলিগ্রাম না পাঠালে পার্স পাঠিয়েছে"।

"সেটা হতে পারে," এরিক বলল, "কিন্তু ও আসছে না কেন?"

জিম একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ফায়ারপ্লেসে ফেলে বলল, "একটু পান করলে হতো"।

"হ্যাঁ, ঐ পানই করো," এরিক গজগজ করল, "ঐ করেই একদিন সব ফাঁস করে ফেলবে। আমরা সবাই ডুববো"।

জিমের মুখটা একটু শক্ত হয়ে গেল, বলল, "হ্যাঁ, একদিন - ", কথা বন্ধ হয়ে গেল তার কারণ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে পার্স, সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে টপটপ করে।

"কি ব্যাপার?", জিজ্ঞেস করল সে, "কী হয়েছে?"

"তুমি টেলিগ্রাম পাঠাওনি?" জিম বলল।

"আমি? যাব্বাবা। আমি ভাবলাম," পার্স পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে জিমকে দেখাল। "আমিও তো আমি এটা পেয়েছি। আমি তো – "

"তাহলে কী হল ব্যাপারটা?" এরিক বলে উঠল।

আরেকটা বাজের শব্দে কেঁপে উঠল বাড়িটা, বিদ্যুৎ ঝলকে ঝলসে উঠল জানলার কাঁচগুলো। বৃষ্টির ফোঁটা বিচিত্র শব্দ করে ঝরে পড়ছিল ছাদের ওপর। কিন্তু ঘরের ভেতরটা আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত। শুধু শোনা যাচ্ছিল তিনজন মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ।

"তাহলে কেলস্টোন পাঠিয়েছে বোধহয়," অবশেষে মতামত জানাল জিম, "ও বোধহয় আমাদের সঙ্গে উইলের ব্যাপারে কথা বলতে চায়। উকিলি বুদ্ধি কিনা"।

"তাহলে ও নাম জানায়নি কেন?" পার্স বলল, "আর কেনই বা এতো জায়গা থাকতে মরতে এখানে আসতে বলল?"

"আমিও তাই ভাবছিলাম," এরিক বলল, "ও কি কিছু সন্দেহ করেছে নাকি?"

"আস্তে দেওয়ালেরও কান আছে," পার্স সাবধান করল।

"না না কোনো ভয় নেই। এখানে কিছু হবে না," এরিক বলল, "আমি পুরো বাড়িটা ভালো করে দেখেছি। কেউ কোথাও নেই"।

"কি জানি, আমার ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না," পার্স বলল, "আমি বরং চলি"। দরজার দিকে এগোল পার্স।

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও," এরিক বাধা দেয়, "কেলস্টোন হয়তো আসতে পারে"।

ততক্ষণে পার্স দরজার কাছে চলে গেছে। এবার সে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পেছনে ঘুরে তাকাল, মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। "দরজা বন্ধ"।

এরিক আর জিম লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। এরিক শক্ত করে হাতলটা ধরেই ঘোরাল প্রাণপণে, একবার এদিকে, একবার ওদিকে। তারপর দুহাত দিয়ে সর্বশক্তিতে চেষ্টা করতে লাগল হাতল ঘোরাবার, পুরো শরীরের ভার দিয়ে ঠেলা মারল দরজায়। দরজাটা ফাঁক হল না পর্যন্ত।

জিম ছুটে গেল জানলার দিকে। এক ধাক্কায় জানালাটা খুলতেই দমকা হাওয়ায় ভরে উঠল ঘর, বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ল মেঝের ওপর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিম বলে উঠল, "কি সর্বনাশ!"

"কী হল?" চেঁচিয়ে উঠল পার্স।

"রড", জিম বলল, "মোটা মোটা লোহার রড আটকানো। কে যেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে"।

“কি পাগলের মতো বকছ”। এক ধাক্কায় পার্সকে সরিয়ে এরিক ঝুঁকে পড়ল জানলা দিয়ে, যখন ফিরে তাকাল, তখন তার মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।

* * *

“তুমি আর পার্স দোতলাটা খোঁজো”, এরিক বলল, আমি নিচের তলা আর সেলারটা দেখছি”।

“তার চেয়ে সবাই মিলে গেলে হতোনা?” জিম বলল।

“কি ব্যাপার”, এরিক নাক সিঁটকাল, “ভয় পেয়েছ নাকি?”

“না, আমি ভয় পাইনি”, জিম বলল, “কিন্তু আমি যাবও না। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। একদিন আমি - ”

“কী করবে তুমি?” রুখে উঠল এরিক।

“বাদ দাও, বাদ দাও,” পার্স বলল।

“আমি বলতে চাইছি”, জিম বলল, “যে আমাদের সবারই এই বাড়িটা খুব ভালো করে খোঁজা দরকার। ব্যাপারটা কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বলা যায় না, এটা পুলিশের কোনো চালাকিও হতে পারে।”

“আরে! তাই তো,” বলল এরিক, “এটা একটা ভালো কথা বলেছ। আমি তো এদিকটা ভেবে দেখিনি!”

“ভাবার জন্য বুদ্ধি চাই!”

“আরে, তোমরা থামবে?” বলে উঠল পার্স, “কী বলছ তোমরা নিজেরাই জানো না। আমার মোটেই এ’সব ভালো লাগছে না”।

“চলো,” এরিক সেলারের দিকে যেতে যেতে বলল।

বাইরের ঝড়টা একটু কমে এসেছিল। আবার তেড়েফুঁড়ে এলো যেন। আগের চেয়েও জোরে। গাছের ডালগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছিল, থেকে থেকে বিদ্যুতের আলোয় তাদের ভুতুড়ে ছায়া পড়ছিল জানলার কাচে।

“দেখা তো হল”, এরিক সব দেখেটেখে বলল, “এখানে কোনো লুকোনো রেকর্ডার নেই”।

“এখান থেকে বেরোবার কোনো উপায়ও নেই”, জিম বলল।

“টেলিফোন!” বলে উঠল পার্স, “আরে টেলিফোনটা রয়েছে তো! এতক্ষণ মনে ছিল না”। দৌড়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল পার্স, একটু বাদেই রিসিভারটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। বাকি দুজন এতোক্ষণ সব দেখে যাচ্ছিল, এখন বলে উঠল, “কী হল?”

“ডেড”, ফিসফিস করে বলল পার্স।

“এরিক, তোমার মতলবটা কী বলতো?” জিমের গলা ভারি শোনাচ্ছে। এরিক মুখ তুলে তাকাল। হতভম্ব হয়ে বলল, “তুমি কি ভাবছ টেলিফোনটা আমি ডেড করেছি?”

“ভাবছি অনেক কিছুই। তুমি একা আছো না পার্সও তোমার সঙ্গে রয়েছে? এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব তো?”

খুব দ্রুত এরিকের মুখ বদলে যাচ্ছিল। কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। হতভম্ব ভাবটা বদলে যাচ্ছিল রাগে। “হতচ্ছাড়া ছোটোলোক। যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা!” কুঁজো হয়ে ধেয়ে গেল সে জিমের দিকে, “মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। মেরে তোমার - “

জিম নিচু হয়ে এরিকের হাত এড়িয়েই তার পা দুটো ধরে ফেলল। দুজনেই জড়ামড়ি করে পড়ল মেঝের ওপর। “ওকে ধরো, পার্স!” চেঁচিয়ে উঠল জিম, “তাড়াতাড়ি! এক্ষুণি ও বন্দুক বার করবে!”

পার্স এক মূহুর্ত ইতস্তত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু’জনের ওপর, কিন্তু পরমুহূর্তেই এরিকের জোরালো একটা লাথির চোটে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের একধারে। এরিক জিমের গলা চেপে ধরার চেষ্টা করছে।

“পার্স, তাড়াতাড়ি! ও আমাদের দুজনকেই মারবে।”

পার্স কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়েই আবার লাফ মেরে এরিকের পেছনে গিয়ে পড়ল। প্রাণপণে টেনে এরিককে সরিয়ে আনতেই জিম এরিকের হাতদুটো মুচড়ে দিল পেছনে। ব্যথার চোটে চেঁচিয়ে উঠল এরিক, “বাঁচাও! লাগছে, লাগছে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো, আমার কাছে কোনো বন্দুক নেই।”

হাতদুটো আলগা করে জিম বলে উঠল, “পার্স খুঁজে দেখ তো! ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই”। পার্স ভালো করে হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে বলল, “ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, জিম। কিছু নেই”।

ছেড়ে দিয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল জিম, “খুব সাবধান, এরিক। কোনোরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না। আমরা দুজন আছি, মনে রেখো”।

এরিক চেয়ারে উঠে বসল। হাঁফাচ্ছিল সে। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেটা মুছে নিয়ে বলল, “মূর্খ! মূর্খ তোমরা! তোমরা ভুল ভাবছ! আমি এসবের কিছুই করিনি!”

দুজনের কেউই অবশ্য পাত্তা দিলনা কথাটা। গুম মেরে গেল এরিক, তারপর প্রথমে পার্স, তারপর জিমের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমরা কি সত্যিই আমায় বিশ্বাস করছো না?”

“যেখানে এতো টাকা জড়িত, সেখানে আমি কাউকে বিশ্বাস করিনা”, জিম বলল, “তুমিই এখানে প্রথম এসেছ। আমরা কি করে বিশ্বাস করব যে তুমি সব প্ল্যানমাফিক করো নি, ঐসব টেলিগ্রামগুলো তুমিই পাঠাওনি?”

“তাহলে বাইরে থেকে দরজা আটকালো কে?” গজগজ করে উঠলো এরিক, “বোকার মতো বাজে না বকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো!”

জিম কয়েকমূহুর্ত চুপ করে থেকে পার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি এখানে শেষ এসেছ পার্স, এই ফাঁদ তুমি পেতেছো। তুমি - ”

* * *

পার্স ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছিল জিম তার দিকে এগোচ্ছে। দেখল এরিক চুপ করে বসে আছে। "না! আমি জানি না। এরিক, কিছু একটা বলো"।

আরেকটা বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। কারেন্ট চলে গেছে। সবাই চুপ করে গেছে।

"আমার মনে হয়, যে এসব করেছে, সেই লাইটের তারও কেটে দিয়েছে"। এরিক বলল, "মাথা গরম কোরোনা জিম। আমরা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই না"।

"কেউ তার কাটেনি, ঝড়ে তার ছিঁড়ে গেছে", জিম বলল, "আর জেনে রাখো আমি তোমাদের কাউকে বিশ্বাস করি না"।

"আপাতত এসব মুলতুবি রেখে, কোথায় মোমবাতি আছে, খুঁজে দেখলে ভালো হয়", এরিক বলল।

হঠাৎ কার্পেটের ওপর দ্রুত গতিতে কারুর চলার আওয়াজ, তারপরই চেঁচিয়ে উঠল পার্স, "আরে! আলো! অ্যান্ডারসনের বাড়িতে আলো জ্বলছে! ওটাও তো একই লাইন!"

"কেউ তার কেটে দিয়েছে", বিড়বিড় করল এরিক, "কেউ - "

আচমকা পার্স দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজার ওপর ঘুঁষি মারতে লাগল দরজার ওপর। "কে কোথায় আছো বাঁচাও! আমাকে এখান থেকে বের করো"। চিৎকার করতে লাগল সে, "আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও। আমাকে - "

"ওসব করে কোনো লাভ নেই", এরিক বলল, "আমি বরং দেখি কোথাও মোমবাতি পাই কিনা"। এগোতে গিয়ে চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে এরিক পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, কোনোক্রমে সামলে পকেট থেকে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে হলঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। পার্স একটা চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল। জিম কাছেই দাঁড়িয়েছিল একটা পাথরের মূর্তির মতো।

এরিক ফিরে এলে পার্স বলল, "কিছু পেলে?"

"পেয়েছি একটা", এরিক বলল, "তবে ছোটো। বেশিক্ষণ চলবে না"। মোমবাতিটা ধরিয়েই এসেছিল সে। কাঁপাকাঁপা আলোয় তার মুখের রেখাগুলো গভীর দেখাচ্ছিল, চোখের দুপাশে তৈরি করছিল অসংখ্য ছায়া। একটা ভয়ংকর মুখোশের মতো লাগছিল তার মুখটাকে। মোমবাতিটা একটা মোমদানের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারের মধ্যে বসল সে।

ঘরে এখন তিনজন মানুষ। কারো মুখে কোনো কথা নেই।তিনজনেই আলোর শিখার থেকে চোখ ফিরিয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিল। মুঠো হয়ে আসছিল হাত। শুধু হাতঘড়িতেই বয়ে চলেছিল সময়। এরিকই প্রথম মুখ খুলল। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে কাটাকাটা স্বরে বলল, "ওপরে কেউ একজন রয়েছে"।

জিম আড়চোখে তাকে দেখেই পার্সের দিকে তাকালো। ঘর এখন আবার নিস্তব্ধ। তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো। এরিক পিছিয়ে এলো একটু।

"আমি দেখেছি। স্পষ্ট দেখেছি।" এরিকের গলা ভাবলেশহীন। "আমি ওকে দেখেছি"।

"কাকে দেখেছ? লোকটা কে?" খিঁচিয়ে উঠলো জিম।

"জন জ্যাঠা"।

"অসম্ভব", ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠলো পার্স, "হতে পারে না"।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। জন জ্যাঠা হলঘরের ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল"।

"বোকার মতো কথা বলো না"। জিম বলল, "জন জ্যাঠা মরে গেছে। আমরাই তো মেরে ফেলেছি"।

"জানি জানি। এটাও মড়া"। এরিক বলল, "এটা নড়ছে না। কথা বলছে না। খালি দাঁড়িয়ে আছে"।

"অসম্ভব! তুমি ভুল দেখেছ", জিম বলল।

এরিক মাথা নাড়ল। "না আমি ঠিক দেখেছি"।

"আমি গিয়ে দেখে আসছি", জিম চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, "তুমিও এসো, পার্স। দুজনেই যাব। এরিকের ভুলটা ভেঙে দিতে হবে"।

"আমি দেখতে চাই না"। পার্স বলল। বলল বটে, তবে উঠেও দাঁড়াল, ধীরে ধীরে এগোল জিমের দিকে। বলল, "আমি দেখতে চাই না। আমি শুধু যাচ্ছি নিজেকে বোঝাতে যে ওখানে সত্যিই কেউ নেই"। তারা দুজনেই এগিয়ে গেল।

এরিক দুহাতে মুখ ঢকল। তার হাত দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল, এমন সময় শুনতে পেল পার্সের চিলচিৎকার। উঠে দাঁড়িয়েই দেখল ওরা ফিরে এসেছে।

"তোমরাও দেখেছ তাহলে"। এরিক বলল।

"হ্যাঁ", জিম বলল, "ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে"।

"কিন্তু জ্যাঠা তো মরে গেছে", পার্স বলল, "মরে ভূত হয়ে গেছে"।

"জানি", এরিক বলল, "যে পরিমাণ বিষ দিয়েছিলাম, তাতে ওরকম দশজন মরে যায়"।

"আমি জ্যাঠাকে কফিনে ভরেছি", জিম বলল, "আমি জ্যাঠাকে কবর দিয়েছি। মাটির ছফুট নিচে। আর কবরে থাকা মড়া হাঁটতে পারে না"।

মোমবাতিটা তখনই দপ করে উঠেই নিভে গেল।

* * *

বৃষ্টি এখন আর পড়ছে না। চতুর্দিক শান্ত। ঘরেও কেউ কোনো কথা বলছিল না। আচমকাই সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া গেল, কেউ যেন কারোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর শোনা গেল জামা কাপড়ের ঘষটানি, পায়ের আওয়াজ, অস্ফুট গোঙানি একটা বড়বড় শ্বাসের শব্দ। তারপর শোনা গেল জিমের গলা, "এরিক খতম! খতম!"

"মেরে ফেললে! তুমি ওকে মেরে ফেললে!" পার্স গুঙিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, শেষ করে দিলাম", জিম বলল, "কারণ ও- ই জ্যাঠাকে মেরেছে। এখন বোধ হয় মড়াটা খুশি হবে। চলেও যেতে পারে"।

"আলো জ্বালাও!"

জিম দেশলাই জ্বালাল। সেই আলোতে দেখা গেল এরিক চেয়ারে বসে আছে, কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে। গলায় বসানো ছুরিটা চকচক করছে আলোয়। তারপর নিভে গেল কাঠিটা।

"তুমি ওকে খুন করেছ! তুমি ওকে খুন করলে কারণ তুমি একাই সব টাকা নিতে চাও", পার্স বলল, "তার মানে তুমি আমাকেও খুন করবে!"

"না- না বিশ্বাস করো", জিম বলল, "দেখোনা ছুরিটা ওখানে বেঁধানোই আছে, আমি তুলিনি। আমি ওকে মারলাম যাতে জ্যাঠার মড়াটা চলে যায়। আমি তোমাদের কোনো টাকা চাই না"।

"আরেকটা কাঠি জ্বালো", পার্সের গলায় আদেশের সুর।

জিম আরেকটা কাঠি ধরালো। বন্য চোখে খুনির দৃষ্টি। কিন্তু আচমকাই সে দৃষ্টি বদলে গেল। কারণ পার্সের হাতে উঠে এসেছে একটা রিভলভার। সেটা তাক করা জিমের দুচোখের মাঝখানে। পরক্ষণেই ট্রিগার টেনে দিল সে।

সব টাকা একাই ঝাড়ার মতলবে ছিলে, তাই না", পার্স বলল, "এমনকি আমাকেও খুন করার মতলব ভাঁজছিলে। এখন জাহান্নামে যাও। পুরো টাকা আমার"। কথাগুলো প্রতিধ্বনি হল ঘরের মধ্যে তারপর সব চুপচাপ।

ঠিক তখনই ওপরের হলঘরে কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, তারপর সিঁড়িতে। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

"ওটা নেমে আসছে", আতঙ্কিত গলায় বলে উঠলো পার্স, "নেমে আসছে আমাকে ধরবে বলে"। আচমকা পাগলের মতো হেসে উঠলো সে। "ধরতে পারবে না"। রিভলবারটা তুলে ধরল নিজের মাথা লক্ষ্য করে। "ধরতে পারবে না। আমি চললাম - "। তারপর গর্জন করে উঠলো বন্দুকটা।

* * *

একটা বড়ো মাপের পানীয় গ্লাসে ঢেলে সরাসরি গলায় ঢেলে দিলাম। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম গল্পটা। বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমি কী বলি, সেটা শোনার আশায়।

"চমৎকার গল্প", আমি বললাম। ভাবছিলাম গল্পটার নাম কী দেওয়া যায়।

"গল্প নয় মশাই, সত্যি ঘটনা। আপনি কি এখনও বিশ্বাস করছেন না?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, "গল্প হিসেবে দারুণ, কিন্তু ভুতে কী করে বিশ্বাস করি বলুন?"

বৃদ্ধ মানুষটি হাসলেন, স্মিত হাসি। "সে তো এরিক, জিম আর পার্সও বিশ্বাস করত না। কিন্তু ব্যাপারটা বা ব্যাপারগুলো যেই তালগোল পাকাতে শুরু করল, অমনি উত্তেজনার চোটে ওরাও বিশ্বাস করে ফেলল, আর ভয়ে পাগল হয়ে গেল"।

"কিন্তু আপনি যে বললেন জন জ্যাঠা মারা গেছে?"

"উঁহু, আমি বলিনি। *ওরা* বলেছিল যে জন জ্যাঠা মারা গেছে। যেটা আসলে ঘটেছিল, উনি হার্টের অসুখের জন্য একটা ওষুধ খেতেন, ঐ ওষুধটাই ওরা যে বিষ খাইয়েছিল, তার প্রতিষেধকের কাজ করেছিল। শুধু বিষের ধাক্কায় উনি বেশ ভালোরকম কাবু হয়ে পড়েছিলেন"।

"অতবড় একজন ধনী মানুষের পক্ষে কোনো ভাস্করকে দিয়ে নিজেরই একটা নিখুঁত প্রতিমূর্তি বানানো কি একেবারেই অসম্ভব যেটাকে তাঁর বদলে কবর দেওয়া হয়েছিল? পরের ব্যাপারগুলো তো খুবই সাধারণ"।

চমৎকার গল্পটাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তখনও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল না। আমি যেটা জানতাম, সেটা হল বাড়িটায় বাজ পড়েছিল এবং আগুন ধরে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, ভেতরে ছিল তিনজন মানুষ, যারাও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িটাতেই পুড়ে মারা যায়।

"কিন্তু বাড়িটায় আগুন ধরল কিভাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেটার কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?"

“ওঃ, আগুন! আসলে ব্যাপারটা তো শেষ পর্যন্ত খুনখারাপি হয়ে খুব বিচ্ছিরি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তার ওপর কাগজওলারা ঘটনাটা জানতে পারলে কি হতো কে জানে! তাই আমি সেলারে গিয়ে তেলের ট্যাঙ্কটা ফুটো করে আগুন ধরিয়ে দিই”।

“*আপনি!*”

“আমি? আমি আমি বললাম? ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা জন জ্যাঠা হবে”। ভদ্রলোক উদাসভাবে তাকালেন। “গল্পটা বলতে বলতে আমি নিজেকে জন জ্যাঠা ভেবে ফেলেছিলাম”।

“কিন্তু এতোসব ঘটনা আপনি জানলেন কী করে?”

আর ঠিক তখনই আমার মনে পড়ল একটা কথা। জে. জে. ড্রেক নামে একজন লেখক এ ধরনের গল্প লিখতেন। সেটা ছিল ছদ্মনাম। আর এই ছদ্মনামের আড়ালে যে ভদ্রলোক লিখতেন, তার চেহারা ছোটোখাটো, শীর্ণকায় আর তাঁর আসল নাম ছিল জন হলিংওয়ে।

ছবিঃ মৌসুমী

ইন্দ্রনাথ

ভারারি বাজারের মুখটাতেই বসেছিল কমল। খদ্দেরের আশায়। খদ্দের মনে ট্রেকিং - এ যাবার লোকজন। তাদের মাল বয়ে দেবার কাজ করে ও। কাল থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি, পড়বে কোত্থেকে ? পকেটে পয়সা থাকলে তো! আজকাল বাজারেও মাল বওয়ার কাজ পাওয়া যায় না। বাসরাস্তা একেবারে বাজার ছাড়িয়ে আরও এক কিলোমিটার এগিয়ে যাবার ফলে, গাড়ি এসে দোকানের দোরগোড়াতে থামছে। আগে পাহাড়ি পাকদন্ডী পথে নীচের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মাল বয়ে ওপরে তুলতে হোত। এখন সে গুড়ে বালি। ভারারি খুব সুন্দর জায়গা, সরযূ নদীর পাশে। বাগেশ্বর জেলার একটু উত্তরের দিকে। লোকালয় ছাড়িয়ে পূবের দিকে তাকালে একটুখানি বরফের চূড়াও দেখা যায়। তবে সেদিকে মন নেই কমলের। পেট চুঁই চুঁই করছে।

কমলের বড়ি ওয়াছম গ্রামে। ভারারি থেকে দিন দুয়েকের পথ। ও অবশ্য কখনো কখনো একদিনেও পৌছেছে, তবে সন্ধ্যা নেমে গেছে। মাঝপথে উমলা গ্রামে দাদির বাড়ি। বেশিরভাগই সেখানে একরাত কাটিয়ে পরদিন সকাল সকাল বাড়িতে যাওয়া। কমল ফাঁক পেলেই আশপাশের পাহাড়ি গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। সবুজ বনের মাঝে, হলুদ সবুজ লাল নানা রংয়ের চাষের খেতে ঘেরা ছবির মতো এক একটা গ্রাম। কত যে গ্রাম, আর কী সুন্দর সুন্দর তাদের নাম। সং, মুনার, ঝুনি, খালঝুনি, খাইবগড়, বিনসি, খাতি, উমলা, জাতোলি এমনি সব। ফসল পেকে আসবার সময়টাতে রামদানার খেত লাল হয়ে ওঠে।

তার পাশেই হয়তো সূর্যমুখীর হলুদ রং-এ ভরে থাকা মাঠ। কী যে অপূর্ব লাগে। রামদানার শস্যদানা পিষে আটা তৈরি হয় আর তা থেকে সুস্বাদু রুটি। কমলদের গ্রামে আটাচাকি আছে একটা। মানে যেখানে আটা তৈরি হয়। ঝরনার জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বড়ো বড়ো পাথরের চাকা ঘোরে। এমন দুটি পাথরের মধ্যে শস্যদানা ঢেলে পিষে আটা বার করা।

দলবেঁধে গিয়ে যে যার ভাগের দানা থেকে আটা বার করে নাও। আর তার এক অংশ চাকি-মালিককে দাও। পারিশ্রমিক হিসেবে। এভাবে পাওয়া তার ভাগের আটা থেকে সে খানিক নিজে রুটি বানায়, খানিক বাজারে বিক্রি করে নুন তেল তরিতরকারি কেনে। যতক্ষণ আটা বানানো হয় সে সময় ঝরণার পাশে পাথরের ওপরে বসে চুটিয়ে গল্প করো কিংবা পাশের গাছ থেকে বুনো জাম পেড়ে খাও। বুনো জাম আবার ভালুকদের দারুণ প্রিয়। অবশ্য দলবেঁধে থাকলে ভালুক কাছাকাছি আসে না। ভালুক এমনিতে অমন নিরীহ গোলগাল দেখতে হলে কী হবে, সামনা সামনি পড়লে আর নিস্তার নেই। ধারালো নখ দিয়ে ফালাফালা করে দেবে। আর যদি সেটা সঙ্গে বাচ্চা নিয়ে মা ভালুক হয়, তাহলে আর রক্ষা নেই। প্রাণ বাঁচানোই দায়। বুদ্ধিমানের কাজ হল নি:শব্দে কেটে পড়া। যাতে ও বোঝে যে তুমি ওর কোনোই ক্ষতি করতে আসো নি। কমল অবশ্য সামনা সামনি ভালুক দেখেনি এখনো। ভাগ্যিস। তবে ওর গ্রামের অনেকেই এমন বিপদে পড়েছে। কেউ কেউ ভালুকের আক্রমণে মরতে মরতেও বেঁচে ফিরেছে।

ভারারি বাজারের লালাজির দোকানের ভেতর থেকে বিনায়ক সিং ডেকে উঠলো, 'এ কমল, ইধার আ।'

কমল রাস্তার উল্টোদিকের পাথরটার ওপর থেকে নেমে রাস্তা পেড়িয়ে লালাজির দোকানে এসে ঢুকল।

২

কাজ জুটেও গেছিল। সেদিনই। চারজনের একটা দল নিয়ে সে আর বিনায়ক সিং, এলাকার নামকরা গাইড, পিণ্ডারি গ্লেসিয়ার ঘুরে এসেছিল। ভারারি থেকে যাতায়াত মিলিয়ে সাতদিনের পথ। যারা এসেছিল তারা বেশ ভালো লোক। কমলের সঙ্গে খুব মজা করেছে, খুব বেশি মালপত্রও বইতে হয়নি ওকে। একজন তো ওকে ঠিকানাও দিয়ে গেছে। বলেছে ট্রেনে করে সোজা দিল্লি চলে আসতে। বড়ো শহর। সেখানে কিছু না কিছু কাজ ঠিক জুটে যাবেই। গ্রামে তো চাষবাসের কাজ আর মাঝে মধ্যে এমন মাল বহনের কাজ, এছাড়া তো তেমন রোজগারের সুযোগ নেই! হ্যাঁ, এখন বাড়ি তৈরি, রাস্তাঘাট বানানো এসবে কিছু কাজ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তা আর কত? লোক অনেক, কাজ কম। ওদের গ্রামের অনেকেই ভাইবোনেরা মিলে জঙ্গলের ছোটো বাঁশের কঞ্চি কেটে এনে ঝুড়ি বানিয়ে বিক্রি করে হাটে। তাতেই বা আর কতখানি আয় হয়। শহরে যাবার কথাটা তাই মন দিয়ে শুনেছে কমল কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

ওরা যেদিন পিণ্ডারি পৌঁছল, সেদিন, আকাশ মেঘলা ছিল। শীত পড়তে শুরু করেছে। ভেড়াওয়ালারা তাদের ভেড়বকরি নিয়ে নীচে নেমে আসছিল। ওপরের বুগিয়ালে ছমাস ঘাস খেয়ে বেশ স্বাস্থ্যবান হয়েছে চারপেয়েদের দল। এবারে নীচে নামার পালা। বুগিয়াল বরফে ঢেকে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। আবার বরফ গলার সময় নতুন ঘাস গজাবে গরমের শুরুতে। তখন ফিরে আসা। এমন একজন ভেড়াওলা কমলদের এসে বলল ওর একটা ভেড়া পা পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে পড়ে মরে গেছে। কমলরা যদি চায় মাংসের জন্য সেটা কিনতে পারে। দাম কিছু সস্তা হবে। দলের যে লিডারদাদা, সে তক্ষুণি সায় দিতে কমলের উৎসাহ দেখে কে! ও দৌড়ে গিয়ে সেই ভেড়ার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে কুটে নিয়ে এল। বেশ কজন ভেড়াওয়ালা সে রাতে ওখানেই ছিল, রাতে তাদেরও ভুরিভোজে ডেকে নেওয়া হল। কমলকে রাগিয়ে দেবার ঘটনাটা ঘটল তার পরদিন সকালে। বেশ খানিকটা কাঁচা মাংস তখনও রাখা, পরে খাওয়া হবে বলে। তাঁবুর পাশে পাথরের আড়ালে প্লাস্টিকে ঘেরা অস্থায়ী রান্নাঘর বানানো। সেইখানেই ছিল মাংসের তালটা। সেখানে কেউ নেই দেখে দুটো কুকুর ঝপ করে এসে মাংসের তালটা নিয়ে কেটে পড়লো। দূর থেকে দেখে কমল তো খেপে আগুন। অমনি তাড়া করল আর পাথর ছুঁড়তে লাগল কুকুরগুলোকে। কিন্তু তারা ততক্ষণে ওর নাগালের বাইরে। 'ইসস অতোখানি মাংস !' কমলের আফশোষ দেখে লিডারদাদা আদর করে ওকে বলেছিলো ভারারি বাজারে এসে মাংস খাওয়াবে। তা অবশ্য হয়নি। ওরা ফেরবার দিন কী কারণে বাজারের দোকানপাট বন্ধ ছিল। লিডরদাদাও আফশোষ করছিল। আর ফেরবার দিন কমলের মন খুব খারাপ করছিল। এতদিন একসাথে থাকা একটু তো মন খারাপ করবেই।

তবে এবারে একেবারে ঘরের কাছে এসে ভালুক দেখা হল। মানে ভালুকের মুখোমুখি। এখনো ভাবলে কমলের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হল কী, ভারারি নেমে যাবার আগেরদিন খালিধার বাংলোতে পৌঁছনোর কথা। বিকেল হয়ে আসছে, কমল পা চালিয়ে চলে। সংগে টিমের একজন দাদা, নাম রতন, কমল তাকে রতনদাদা বলেই ডেকে এসেছে এ কদিন। ওকে বেশ স্নেহই দেখিয়েছে রতনলাল বলে পদযাত্রী মানুষটি। দিব্যি আসা হচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢালের শেষে উঁচু মতো একখানা ঢিবি পেরোতেই কমল দেখে ভালুক। সঙ্গে দুটি ছানা। পাহাড়ে, বিশেষত হিমালয়ে, মা ভালুক তার সঙ্গে ছানাপোনা থাকলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সে আক্রমণ করবেই। আর কোন রক্ষা নেই। রতনদাদা একেবারে পেছন পেছনই উঠে এসেছে। কমল শুধু ইশারায় মুখে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে বারণ করল, তারপর খুব অস্ফুটে পেছনে লাফিয়ে পড়তে বলেই, নিজে লাফ দিল। দেখাদেখি রতনদাদাও। ফুট বিশেক গড়িয়ে আসার পরই নীচের দিকে দে দৌড়। কমলের পায়ের আওয়াজ পেয়েই ভালুক মা এদিকে ফিরে দেখেছে, একটা গাছের ডালে উঠে উঁকিঝুঁকিও মারতে শুরু করেছে। জঙ্গল তাই নজর ততো চলে না। কমল এক লহমা দেখেছে আর অপেক্ষা করেনি। লাফ দিয়ে দৌড়ে হাঁচড় পাচড় করে যতটা পারে পাহাড়ের নীচের দিকে পালিয়ে চলে এসেছিল। নীচের দিকে নামার সময় ভালুকের চোখের ওপরকার লোম চোখের

ওপর এসে পড়ে, ফলে ওদের দেখতে অসুবিধে হয়, সেকথা মনে ছিল কমলের। তাই বাঁচোয়া। তারপর ঘুরপথে বাংলোয় আসা। তখন অন্ধকার নামতে সামান্যই দেরি। সবাই মিলে মশাল টশাল জ্বালিয়ে রাখা হল সে রাতে, চৌকিদারকে ডেকে আনা হল, তাকে থাকতে বলা হল। সে বেচারা রাতে গ্রামে নিজের ঘরে শুতে যায়, সেদিন আর তার যাওয়া হল না। ভালুকবাবাজি অবশ্য আর দর্শন দেননি, পাশের জঙ্গলে চলে গিয়েছিলেন।

রতনদাদা বলেছিলেন, কমলের জন্যই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কমলের সাহস আর বুদ্ধি দুইই আছে মানতেই হবে। বিনায়কজিও খুব তরিফ করেছিল কমলের, 'বহোত আচ্ছা বেটা' বলে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। কমলের তো ভালো লাগবেই। এ তল্লাটে বিনায়কজি শুধু বিখ্যাত গাইড নন, একজন গণ্যমান্য লোকও বটে। পাহাড়ে এই অঞ্চলের প্রধান দেবী নন্দার পূজারি উনি। তাই সকলেই ওকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বর্ষাকালে নন্দাযাত্রা হয়। প্রতি বছর। এখানে বলে নন্দাজাত। আর বারো বছর অন্তর অন্তর হয় বড়ি নন্দাজাত। তখন এলাহি ব্যাপার ঘটে। কত লোক। নন্দাদেবী নিচের কোনো গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে আপন মন্দিরে যান।ঠাকুমার মুখে শুনেছে কমল এটা আসলে নন্দা মায়ের বাপের বাড়ি থেকে শিবঠাকুরের বড়িতে ফেরার যাত্রা। আশপাশের সব পাহাড়ি গ্রাম থেকে দলে দলে সবাই পাহাড়ের অনেক উঁচুতে নন্দাদেবীর মন্দিরে পূজা দিতে যায় এসময়। এই যাত্রা ঘিরে নানান গানও আছে গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফেরে সে-যাত্রার গান। বিনায়কজি সেই বড়ি জাতের সময়েও প্রধান পূজারি। সে রতে কমলদের উনি নন্দাজাতের গান শোনালেন। গোল আগুন জ্বালা হয়েছিল। ক্যাম্পফায়ার। আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছিল সকলে। এ গান আগেও শুনেছে কমল। কিন্তু সেদিন রাতে বিনায়কজির গলায় একই গান শুনে অন্যরকম লাগল ওর। মনে হল এ গান যেন ও আগে কখনো শোনেইনি। এমন চমৎকার গলা আর তার সুর।

রতনদাদা ছোটোমতো একটা যন্ত্র বার করে বোতাম টিপে কীসব করছিল গানের সময়ে। পরে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওটাকে রেকর্ডার যন্ত্র বলে। আর তাইতে গাওয়া গান হুবহু নকল হয়ে গিয়েছিল। শুনে দারুণ লেগেছিল কমলের। এমন যন্ত্র সামনাসামনি হাতে নিয়ে ও এই প্রথম দেখল।

৩

বরখার আজ সাতদিন জ্বর। জড়িবুটি করেও একটুও সারেনি। এখন যদি ডাক্তার ডাকতে হয় তাহলে এক-দেড়বেলা হেঁটে গিয়ে কাপকোট বাজারে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে নয়তো বলে ওষুধ আনতে হবে। এদিকে গ্রামে ডাক্তার আসে মাসে একবার। কখোনো তাও না। এটা সেটা করেই হাতুড়ে চিকিৎসা করেই সকলে আছে কোনোমতে। বরখার দাদা বিক্রম। বিক্রম পাঁওয়ার। আরেক ছোটো ভাই যুগন। ওদের বাবা নেই। মা আছেন। বিক্রম চাষের কাজ করে। অন্যের ক্ষেতেই বেশি। নিজেদের আর কতটুকু জমি। তাও তাতেই চাষ করে। আলু, টমেটো, মরিচ এইসব ছোটোখাটো। মাঝে মাঝে রাস্তা বানানোর কাজ পায়।

ঘর বানানোর। সরকারি কাজ সেসব। বেশকিছুদিন চলে তারপর বন্ধ থাকে। আবার হয়। এমনি করে চলে যায় কোনোমতে।

বাবা মারা যাবার পর বিক্রমকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে। ওদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর আর এগোয়নি। পড়া ছেড়ে কাজ। তবে যুগনকে সে ছাড়তে দেয়নি। যুগন এখন চারমাইল দূরে বিনসি গ্রামের হাই স্কুলে পড়ে। সেখান থেকে পাশ দিলে নীচে কাপকোট কি আরও এগিয়ে বাগেশ্বর। সেখানে বড়ো কলেজ।

বরখার জ্বরটা ভাবাচ্ছে বিক্রমকে। যুগন স্কুল থেকে ফিরতে ফিরেতে বিকেল। কাউকে নিয়ে কাপকোট যেতে পারলে ভালো হত। টমেটো গাছগুলোর গোড়া খুঁচিয়ে দিতে দিতে ভাবছিল বিক্রম। ঠিক সেসময়েই দেখতে পেল রুপলকে। ছেলেটকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। যদিও আগ্রহ ছিল খুব। তবে কি না ও-ও বাড়ির বড়ো ছেলে আর ওর বাবাও অকালে মারা গেছেন। তাই একরকম বাধ্য হয়েই!

বিক্রম রুপলকে ডাকল। কী করা যায় ওর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করবে। বরখাকে কি এখনই নিয়ে যাবে নীচের গ্রামে নাকি বলে কয়ে ওষুধ নিয়ে আসবে?

‘কী করি বলতো রুপল?’

‘তাই তো রে ! একটুও কমেনি না?’

‘না। মাঝে একটুখানি কমেছিল, পরশু রাত থেকে আবার বেড়েছে। কিছু খাচ্ছেও না।’

‘তাহলে এক কাজ করি। আজ তো বেলা হয়ে গেছে। কাল ভোর ভোর বেড়িয়ে পড়ি। বরখাকে তুই আর আমি পিঠের ঝুড়িতে পালা করে বইব। সন্ধ্যের আগে পৌঁছে যাবো কাপকোট। সেখানে ডাক্তার দেখিয়ে, দরকারে সদরে হাসপাতালে নিয়ে যাবো।’

‘বেশ তাই হবে।’

রুপল ওর হাতের কাজগুলো সারতে চলে গেল। ও একটা দোকান চালায় এই ওয়াছম গ্রামে। সেজন্য ওকে প্রায়ই কাপকোট যেতে হয় । ওর চেনাজানাও আছে সেখানে। রুপল সাথে থাকলে ভরসা বিস্তর। বিক্রম ওর সঙ্গে কথা বলে একটু স্বস্তি বোধ করে। টমেটো গাছগুলোর গোড়া আলগা দিয়েই একবার উমেদ সিং -এর বাড়ি যেতে হয়। ওর জমিতে চাষের কাজ করে বিক্রম। উমেদ পয়সাওয়ালা মাতব্বর এ গ্রামের। ধনী ব্যক্তি। পাকা দালান। দোতলা। কত জমি ওর। সেসব জমির ফসল ও নীচের বাজারে চালান দেয়। তাছাড়া ব্যবসাও আছে বাগেশ্বর শহরে। পাথর কাটাইয়ের আর কাঠ চেরাইয়ের। সেসব দেখভাল করে ওর মেজ ছেলে আর এক ভাগ্নে। যদি তেমন দরকারে বাগেশ্বরে যেতেই হয়, একবার সিং -সাবকে জানিয়ে রাখলে থাকার সুবিধে হবে।

উমেদ এমনিতে একটু রাগী রাগী আর কৃপন স্বভাবের হলে কী হয়, মনে মনে মানুষটা খারাপ নয় মোটেই। আর বিক্রমকে সে পছন্দই করে। ওর বাবা তুলা পাঁওয়ার তার বন্ধু লোক ছিলো।

ব্যাপার শুনে তিনি একটু গুম মেরে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুললেন।

'এ তো ভালো খবর নয় রে বিক্রম। তুই ঠিকই ভেবেছিস। নিয়ে যা ওকে। আর হ্যাঁ। তোর বকেয়া পাওনা আছে চারশ টাকা ওটা আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি এখনি।আর কিছু টাকা নয় ধার হিসেবে নে। জমিতে খেটে শোধ দিস খন।'

বিক্রম আর কীই বা বলে। ও কৃতজ্ঞতায় শুধু ঘাড় নোয়ায়।

উমেদ সাকুল্যে আটশো টাকা দিলেন। বিক্রম অবশ্য মনে করে, দরকারে বাগেশ্বরে থাকবার ব্যবস্থাটা বলে নিয়েছে সিং সাহেবকে। উনিও আপত্তি করেননি। আজকাল শুধু ভাগ্নেই আছে সেখানে। সে আবার বিক্রমকে চেনে না বলে একখানা হাতচিঠিও করে দিয়েছেন। উমেদের বাড়ি হয়ে ফিরতে ফিরতে বেলা পড়ে এল। যুগন এসে বোনের মাথার কাছে বসেছে। জলপট্টি দিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। জ্বর একটু কমের দিকেই।

পরদিন ভোরেই রওনা হল দুজন। ওয়াছম থেকে দেড়দিনের পথ কাপকোট। ওদের তা একদিনেই পেরোতে হবে। তবে বেশিরভাগটাই উৎরাই বলে পাকদন্ডি বেয়ে ওরা ছোটো পাহাড়ি পথে সহজেই পৌঁছে যাবে এমন বিশ্বাস আছে ওদের। আর গেলোও। দুপুর যখন একটু হেলে এসেছে ওরা দুজন শেষ পাহাড়ের ধারে উঠে দেখতে পেল নীচে সরযূ নদীর তীরে কাপকোট। সেখান থেকে বড়োজোর একঘন্টা।

বরখা নেতিয়ে পড়েছিল। গুড়ি সুড়ি মেরে বসে আছে ঝুড়ির মধ্যে। এতটা পথ ওকে বয়ে আনতে দুই ছেলের জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। ওরা একটু জিরিয়ে নিতে বসল। জল খেতে দিল বরখাকে। গামছা দিয়ে ঘাম মুছে, সঙ্গে আনা এক এক টুকরো গুড় মুখে ফেলে নিজেরা জল খেলো।

কাপকোট বাজারে ডাক্তারবাবুর কাছে যখন পৌঁছলো বরখা আর তার দুই সঙ্গী, তখন উনি চলে যাচ্ছিলেন। ওদের দেখেই দাঁড়ালেন। ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন বরখাকে। প্রায় আধঘন্টা ধরে দেখবার পর ওষুধ দিলেন। বললেন, সকালের মধ্যে জ্বর না কমলে সোজা বাগেশ্বর হাসপাতাল। কী সব পরীক্ষা টরীক্ষা দরকার সেসব কাপকোটে হবে না।

তাইই হল। বাগেশ্বরই যেতে হল বরখাদের। হাসপাতালে যমে মানুষে টানাটানি চলল পনেরোদিন। উমেদ সিং এর ভাগ্নে খুব সাহায্য করেছে। হাসপাতালে যেসব সুযোগসুবিধে বিনে পয়সায় পাওয়া যায় সেসব ভাগ্নেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দেখে শুনে নিজেরাও বুঝে

নিয়েছে রুপলরা। কাঠচেরাই কলের একপাশে অফিসঘরের পেছনের একচিলতে জায়গায় শুয়ে রাত কাটানো আর সারাদিন তো হাসপাতালেই। হোটেলে খাওয়া। আর ডাক্তারবাবুর কথামতো ওষুধ কিনে দেওয়া। সুঁই এনে দেওয়া। খুন পরীক্ষা করানো। আরও কত কী পরীক্ষা। অত মনেও রাখতে পারেনি বিক্রম। রুপল বেশ চৌখস। ভাগ্যিস ও সঙ্গে ছিল।

আজ প্রায় সতেরো দিন পর বাড়ি ফিরছে। রুপলরা। বরখাও। কাপকোট থেকে এবারে হেঁটে। যদিও দুর্বল। সময় বেশি লাগবে। তা লাগুক। কতদিন বাদে বাড়ির পথে ওরা তিনজন।

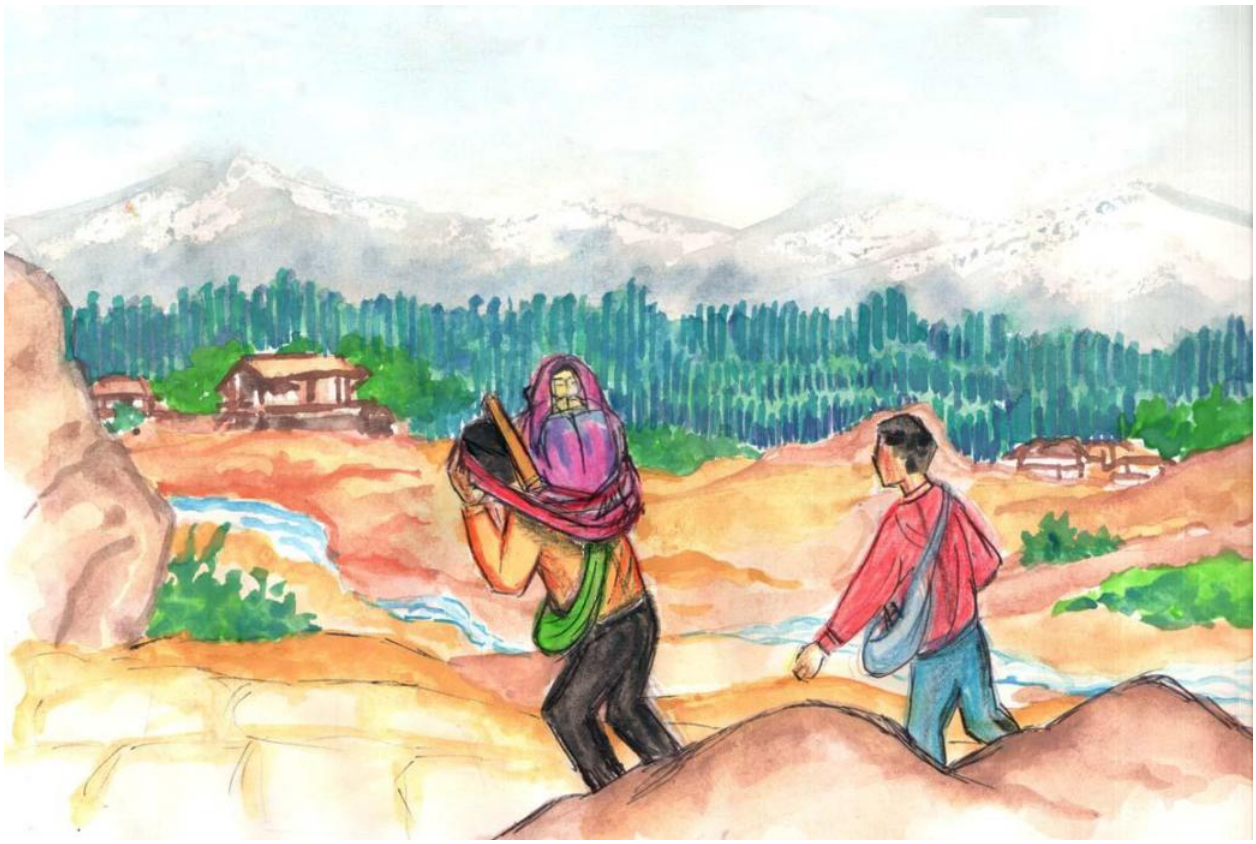

৪

ভোরবেলা চা-ওলার ডাকে ঘুম ভাঙল কমলের। নিজের সিটে বসে বসেই ঘুমিয়েছে ও। তাও তো ওর বসবার জায়গা জুটেছিল। অনেকের তো তাও জোটেনি। উঁকি মেরে দেখল কমল। রামপুর স্টেশন। মানে একটু বাদেই লালকুয়াঁ আর তারপরেই হলদোয়ানি। সেখানেই নেমে বাস ধরবে কমল। রানিক্ষেত এক্সপ্রেস হলদোয়ানি ঢোকে ঠিক ছটা পাঁচ

মিনিটে। চটপট বাস পেলে বিকেলের মধ্যে বাগেশ্বর হয়ে ভারারি। রাত কাটিয়ে পরদিন ওয়াছমের দিকে হাঁটা। আট মাস বাদে বাড়ি ফিরছে কমল।

দিল্লি চলে যাবার ব্যাপারটা চেপেই রেখেছিল ও। শেষে যাবার ব্যাপারে মনস্থির করে দাদাকে জানিয়েছিল। দাদা রূপল ভাইকে বারণ করেনি। আর করলেই কি শুনত। স্কুল ছাড়তে পই পই করে নিষেধ করেছিল ভাইকে, যত কষ্টই হোক সে পড়াবে। কিন্তু না, দাদার ওপর বোঝা বাড়াতে সে নাকি রাজি নয় তাই রোজগারের রাস্তা দেখেছে। বলে বলে হদ্দ হয়ে দাদাও চুপ করে গেছে। তবে কমল ছেলে ভালো। তার একগুঁয়ে স্বভাব বটে তবে মন খুব দৃঢ়। চট করে সে কুসঙ্গে বয়ে যাবে না এ বিশ্বাস ছিল তার দাদার। দোনোমনা করলেও মুখে শেষ অবধি হ্যাঁ-ই বলেছিল সে।

দিল্লিতে খুঁজে পেতে রতনদাদার ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছিল ঠিক। তবে একটু সময় লেগেছিল এই যা। নতুন দিল্লি স্টেশনে নেমে পাহাড়গঞ্জের ঘিঞ্জি এলাকায় বার কয়েক চক্কর কাটতে হয়েছিল। অবশেষে যখন খুঁজে পেল তখন প্রায় দুঘন্টা পেরিয়ে গেছে। রতনদাদা যেন জানতেনই, একটুও অবাক হননি। 'আয় ভেতরে আয়' বলে ভেতরের ঘরে যেতে যেতে কাকে বললেন, 'কমল এসেছে, ওকে কিছু খেতে দাও আগে।'

তো, রতনদাদার বাড়িতেই থাকা হল। কাজ বলতে রতনদাদার অফিসের ফাইফরমাশ। চিঠি দিয়ে আসা নিয়ে আসা, জল দেয়া, জিনিস পৌছে দেওয়া এসবা টুকটাক কাজকর্মের মধ্যেই ছিল, হঠাৎ একদিন রতনদাদা বলল কমল তোকে ইংরেজিটা শিখে নিতে হবে, এদিক সেদিক যাস এর তার সঙ্গে কথা টথা বলিস, কোম্পানির কাজে আরও সুবিধে। আর হ্যাঁ, বিরাটবাবুর সাথে গিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও দেখে টেখে নিস। ওটার দায়িত্বও তোকে নিতে হবে। কমল দেখেছে এই অফিসে রতনদাদা আর ওর বন্ধু রেহানদাদাই মলিক। ওদের কথাই শেষ কথা, যদিও সকলেই খুব ভালোবাসে ওদের। একেবারেই মালিক মালিক ব্যাপার নেই ওদের ওয়াছম গ্রামের উমেদ সিং-এর মতো।

ক্রমে ক্রমে অনেককিছুই জেনেছে কমল। রেহানদাদা গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিয়েছে। এখন অফিসের প্রয়োজনে গাড়িও চালায় কমল। অফিসে কমল ছাড়া যেন কোনো কাজ হবে না। কমলের স্বভাব যেমন মিষ্টি, তেমনি কোনো কাজেই না বলে না। হাসিমুখে করে দেয়। ফলে অল্পদিনেই কমল এখন সবার নয়নের মনি। রতনদাদা আদর করে বলে কী রে হতচ্ছাড়াটা তো আমার জনপ্রিয়তায় ভাগ বসিয়েছে ভালোই।

এই অফিসটা মূলত কম্পিউটরের নানা কাজ করে। সেসব থাকলেও, মাসের দুটো শনি রবিবার রতনদাদারা কোনো না কোনো ডাক্তারববুদের ধরে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করে। ওদের অফিসই সব দেখভাল করে। অফিসের লোকেরাও। সেসবদিনে কমলের কাজকর্ম বেড়ে যায় খুউব। রতনদাদাদের অনেক ডাক্তার বন্ধু। ডাক্তারববুদের সাথেও কমলের এখন

ভালো চেনাশোনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছে কি কমল, একবার তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে তো? কমল হেসেছে ঘাড় হেলিয়ে বলেছে, জরুর !

আট মাস কম সময় নয়, তবু যেন হুশ করে কেটে গেল। আর খুব মন কেমন করে উঠল কমলের! রতনদাদাকে বলে রেহানদাদাকে বলে বাড়ি ঘুরে আসবার সময় চেয়ে নিয়েছিল সে।

ফেরার পথে রাতে ভারারি বাজারে ও ছিল সেই বিনায়ক সিং এরই দোকানে। সিংজি যদিও ছিল না, কাপকোট গেছিল। ভোরবেলা উঠে আর অপেক্ষা করেনি কমল, পাহাড়ের পথে পা রাখতেই মনটা ফুরফুরে হয়ে গেছিল, আহ কতদিন পর। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো কমল সিং-এর। সং গ্রামের ওপরের দিকে বাঁশ গাছের জঙ্গল। তার মধ্যে দিয়ে বাতাসের সরসর আওয়াজ শুনতে শুনতে দারুণ লাগছিল। মনে মনে বারবার বলছিল আহ কতদিন পর। আরও ওপরের দিকে আখরোটের জঙ্গল। যাবার সময় দুদশটা আখরোট পেড়ে খেতে খেতে গেলেই হবে। খুব শক্ত হয় আখরোটের খোলা। কিন্তু ভেতরের শাঁস নরম। বাদামের চেয়েও নরম, একটু দাঁতে চাপ দিলেই মখমলের মতো মিশে আসে জিভে। আরেকো ধরণের লম্বা লম্বা পাতা হয় এখানেই। ছোটো ছোটো ঝোপ। দেখলেই চিনোতে পারবে ও। পাতা কটা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবুলে, চিনির মাফিক মিষ্টি, কোথায় লাগে মিন্ট। শহরের চুইংগামেও অমন স্বাদ চেখে দেখেনি কমল। ঢাকুরির কাছাকাছি পৌঁছতে বারোটা বেজে গেল। আরও আগেই পৌঁছনো যেত, কিন্তু আখরোটের জঙ্গলটাই গোলমাল করে দিল। অবশ্য অনেকটা আখরোট ঝোলায় পুরেও নিয়েছে বাড়ির জন্য। ঢাকুরি এই অঞ্চলে সবচেয়ে উঁচু জায়গা। এখান থেকে সোজা উৎরাই পথে ওয়াছম। পা চলিয়ে গেলে বড়োজোর চার ঘন্টা। চড়াই ঠেঙিয়ে এসে কমলের একটু ক্লান্ত লাগছিল। অনেকদিনের অনভ্যেস। ও একটা ঝাকড়া ব্রাঁস গাছের নীচে বসল। গাছগুলো খুব বড়ো হয় না, পাতাগুলো একটু লম্বাটে।সামনের দিকটা চওড়া। নীল-বেগনি রঙের ছোটো ছোটো ফুল হয়, আর তাই দিয়ে যা সুন্দর একটা পানীয় বানানো হয় , কমল ভাবল তাতে শহরের কোল্ড ড্রিঙ্কস কোথায় লাগে। চমৎকার ছায়ার নীচে বসে কমলের চোখ বুজে এল।

বিক্রমেরই নজরে পড়ে প্রথমে, গাছের আড়ালে লোমশ একটা জন্তুর গা। আড়াআড়ি ঝুপসি হয়ে আসা গাছটার পেছনদিকে। পাকদন্ডী দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে বলে জঙ্গলপথে ওরা উঠে এসেছে এখান অবধি, এখান থেকে ঢাকুরি টপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওয়াছম আর বিশেষ দূর নয়। বেলা গড়িয়ে দুটো। বিক্রম ওর সঙ্গীদের ইশারায় চুপ করতে বলে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। ও এমনিতে সাহসী, কিন্তু ভালুকে ভীষণ ভয়, ফলে খুব সাবধানে বিক্রম গাছটার দিকে নজর রাখতে রাখতে এগোল। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল বিক্রম, হঠাৎ তার মনে হল রোমশ জিনিসটার নীচ থেকে লাল রঙের কী যেন উঁকি মারছে। কৌতূহল হল বিক্রমের। ভালুকের শরীরে লাল রঙের তো কিছু থাকে না, এক যদি না তার জিভ বার করে সে। ভালো করে

তাকাতেই স্পষ্ট হল জিনিসটা। বেশ পেছনে রূপল আর বরখা দাঁড়িয়ে । ওদের দিকে একবার তাকাল বিক্রম। তারপর দুদিকে মাথা নেড়েই এগিয়ে গেল কালো পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে। রূপলের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। চেঁচিয়ে যে বারণ করবে সে উপায়ও নেই, ভালুকটার ঘুম যদি ভেঙে যায়? অবশ্য যদি ওটা ভালুক হয়; অন্য কোন জন্তুর কথা এখনই ভাবতে পারছে না সে, কেননা এই জঙ্গলে ভালুক ছাড়া অমন বিশাল রোমশ জানোয়ার আর নেই।

অনেকটা পাইনবনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামছিল কমল। পাইন গাছগুলো বেশ মোটা আর উঁচু, মানে প্রাচীন, গায়ে চাকা চাকা দাগ। এখানে সেখানে পাইনের শুকনো কোন পড়ে আছে। এই কোনগুলো আসলে এই গাছের ফল। শহরে দেখেছে সেগুলো দোকানে বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। রতনদাদা বলেছে গোটা কতক ছোটো বড়ো পাইন-কোন নিয়ে যেতে। ঘর সাজানো হবে। কমল নীচু হয়ে কয়েকট নিয়ে ঝোলায় পুরল। এখানে সেখানে গোটা কতক ফুলগাছ, ঝুপসি। বেগনি, হলুদ রঙের ফুল। আগে এগুলোর ইংরেজি নাম জানত না ও, এখন জানে, পেটুনিয়া, প্রিমুলা এইসব নাম। তারই একটা ফুলে ভরা ডাল এসে ওর মুখে লাগল। ও হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, ডালটা আবার মুখে এসে লাগল, ও আবার সরাল, ততক্ষণাৎ সেটা আবার ঘুরে এল, আর গাছটা অবিকল ওর নাম ধরে ডেকে উঠল।

‘এই কমল উঠ, উঠ যা রে, এ কমল!’

কমল তাকিয়ে দেখল, রূপল ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে আর একটা চীর পাতা দিয়ে মুখের ওপর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ওকে দেখে তো সকলে মহা খুশি, কতদিন পর। কমলের চেহারায় বেশ শহুরে জেল্লা। কিন্তু রূপলকে দেখে যেমন লাফ দিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল কমল, রূপল বুঝতে পারল তার ভাইয়া ঠিক ছোটোবেলার মতোই আছে, বদলায়নি এতটুকু।

এবারে চারজনে বাকি পথটা হৈ হৈ করে চলল। যেতে যেতেই বিক্রমদের সব কথা শুনল কমল। বরখার অসুখ, ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতখানি উঁচুতে পাহাড়ে দিনের আলো থাকে অনেকক্ষণ। সন্ধের মুখ মুখ ওরা ঠিকই পৌঁছে যেতে পারবে ওয়াছম। ওদের গ্রামে খুব বেশিদিন হয়নি বিদ্যুৎ এসেছে। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা তোরণ। কংক্রিটের তৈরি। ওপরের দিকটা ওল্টানো ভি অক্ষরের মতো। তাতে হিন্দিতে গ্রামের নাম খোদাই করা, ওয়াছম গ্রাম, বাগেশ্বর জিলা, উত্তরাখন্ড। তোরণের মুখে একখানা ডুম ঝুলছে, সেটা সন্ধে হলেই কেউ না কেউ জ্বালিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে দূর থেকে লোকে ওই আলো দেখে বোঝে এখানে একটা লোকবসতি আছে। দুটো পাঁচটা বাড়িতেও আলো জ্বলে, ফলে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে ওদের গ্রাম দেখলে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে তারা ফুটে আছে। তোরণের মুখ থেকে কংক্রিটের রাস্তা শুরু। গ্রামের মধ্য দিয়ে এটাই একমাত্র পাকা রাস্তা, পায়ে চলার, বাকি সব মাটির। তিন ফুট চওড়া, ডাকনাম,

তিন ফুটিয়া। সে রাস্তায় পা দিয়ে কমল ঠিক করল ওয়াছম আর আশেপাশের যত গ্রাম আছে এই গোটা অঞ্চলটাতে সে তিনমাস অন্তর মেডিক্যাল ক্যাম্প করবে। শহরে সে যেখানে কাজ করে তাদের তো এটাই মূল কাজ। রতনদাদাকে বললেই হবে। আর একটা দাওয়াখানা। যাতে বছরভর ওষুধ থাকবে। সে নিজে পাঠাবে। বিক্রমের ভাইটার কী যেন নাম? যুগন কি! হ্যাঁ হ্যাঁ যুগন, ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। ওকে যদি ডাক্তারি পড়ানো যায়! দিল্লিতে থাকতেই ও শুনেছে আজকাল কত সুবিধা পাওয়া যায় সরকার থেকে বিশেষ করে ওদের এইসব গ্রামের লোকেদের জন্য, পড়াশোনা করবার জন্য। একবার কথা বলতে হবে বিক্রমের সাথে, কাল সকালেই। বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছে ওরা। এখনো আবছা আলো লেগে আছে আকাশের গায়ে। নীল রঙটা পুরোপুরি মুছে যায়নি এখনো। দূরে কারো বাড়িতে একট বড়ো নাল বাজিয়ে গান ধরেছে কেউ। কমল মনে মনে ঠিক করে নিল তার সামনে এখন কী কী কাজ, গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে কাল সকাল থেকেই সে কাজ আরম্ভ করে দেবে।

ছবিঃ মৌসুমী

পদভূতের কারসাজি

অচিন্ত্য সুরাল

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে আবার সেই ভূতের গল্প ফাঁদার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। তবুও ভূতের প্রসঙ্গ না টেনে উপায়-ই বা কি। এই ম্যাড়ম্যাড়ে গল্পটার ভবিষ্যৎ একেবারেই ঝরঝরে হয়ে যাবে যদি না ভূত দিয়ে শুরু করি।

মামুলি যেসব ভূত, যেমন মামদো, ঝুনো, পেত্নি, কাঁঠালে, প্যাঁকাটি ইত্যাদি ভূতদের সঙ্গে সকলেরই কমবেশি পরিচয় আছে। এমনকি, কেউ কেউ তেনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী না হলেও খামোখাই একেবারে বেমক্কা দেখা হয়ে গেছে। গুপি গাইন বাঘা বাইনে তো খোদ ভূতের রাজার সঙ্গেই আমাদের মোলাকাৎ হয়েছে। সেসব রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা থাক। আমি বলতে চাইছি অন্য ধরণের ভূতদের কথা, যারা ততটা প্রচলিত প্রজাতির ভূত নয়। যেমন ধরো ছাপাখানার ভূত বা সর্ষের মধ্যে ভূত। এছাড়াও প্রথমটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর একটা ভূত এই বাংলার ভুঁয়ে এদিক সেদিক উপদ্রব করে বেড়ায়। তাদের বিশেষ পছন্দের শিকার হল কমবয়সী ছেলেমেয়েরা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, আমি পদ্যের ভূতের কথা বলছি।

কথা চালানোর সুবিধের জন্য এই ভূতকে পদভূত নামেও ডাকা যেতে পারে। পদ্য লেখাকে তো আগে পদরচনাই বলা হত। তাহলে পদভূত বললে কারোর, এমনকি পদভূতেরও আপত্তি থাকার কথা নয়; বদভূত তো আর বলছি না। তা সেই পদভূত যে কখন কার ঘাড়ে চাপবে বলা মুশকিল।

ধর তুমি বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়েছ পুরী। দূরে দেখা যাচ্ছে একসার পালতোলা নৌকা আস্তে আস্তে চলেছে। ভোরের ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগিয়ে তখন সূর্য উঠি উঠি করছে। তোমরা তিনজনে, এমনকি আরও অনেক তিনজনে বা চারজনে বালিতে বসে আপনভোলা হয়ে নৌকার পালের দিকে মনস্থির করে চেয়ে আছো। হঠাৎ ওদিক থেকে কে একজন বলে উঠল,

আকাশপথে সূয্যি যখন উঠছে ধীরে পুবে
তারাগুলো দিনের আলোয় যাচ্ছে ডুবে ডুবে

তখন বুঝতে হবে ওর ঘাড়ে পদ্যের ভূত বা পদভূত ভর করেছে।

আবার ধরো বর্ষার শুরুতে পুবের হাওয়া বইছে। সন্ধ্যেবেলায় একা তুমি বসে আছ দোতলার বারান্দায়। সামনের বাড়ির বাগান থেকে ভেসে আসছে স্বর্ণচাঁপার দারুণ মিষ্টি গন্ধ।

হঠাৎ পাশের বাড়ির দিদির চেনা গলা ভেসে এল-

বাদল হাওয়ায় আসছে ভেসে
গন্ধটা খুব চেনা
মনমাতানো এমন খুশি
যায় নারে ভাই কেনা

এরকম হলে বুঝতে হবে তা দিদির ঘাড়ে পদভূত চাপার অব্যর্থ লক্ষ্মণ।

আমাদের পাড়ার ছক্কুটা বেশ ছিল। ওকে অনেকদিন থেকেই চিনি। তা প্রায় বছর আট-নয় তো হবেই। তখন ক্লাস থ্রি না ফোরে পড়ে। দিব্যি হাসি হাসি মুখে স্কুলে যায়। সবার সঙ্গে বেশ মিষ্টি করে কথা বলে। কখনও একটা চকোলেট দিলে থ্যাঙ্কিউ না বলে হাত বা জামা খামচে ধরে আদর করে দেয়। ভূতের গল্প শুনতে একদম ভালবাসে না। কেউ ভূতের কথা বললে বলে ওঠে ওসব বাজে কথা। এহেন ছক্কুর ঘাড়ে একদিন ভূত ভর করল। ভূত মানে সেই পদভূত।

প্রথম যেদিন ব্যাপারটা, মানে এই পদভূত ঘাড়ে চাপার ব্যাপারটা ঘটল সেদিনটা ছিল একটু অন্যরকম। ছক্কু তখন স্কুল থেকে ফিরছে। আকাশ সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। ঝির ঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। ছক্কু ওর নীল ছাতাটা মাথায় দিয়ে আসছে। পাশেই ওর মায়ের হাতে স্কুলের ব্যাগটা। বিনিদের বাড়িটা সবে পার হচ্ছে

এমন সময় বাতাস এলোমেলো হয়ে বইতে শুরু করল। মাকে লুকিয়ে মুখে একটু বৃষ্টির জল নেওয়ার জন্য ছক্কু পিছন ফিরে যেই আকাশের দিকে মুখটা তুলেছে, ব্যস! সাঁ করে একটা পদভূত ছক্কুর ঘাড়ে। দোষের মধ্যে এটাই হয়েছিল যে একটু আগেই ছক্কু মায়ের কাছে একটা নতুন বড় ক্যারামবোর্ডের জন্য ঘ্যানঘ্যান করছিল আর তাতে ওর মা বলেছিলেন, সবইতো না চাইতেই পাও, তবু কেন অত বায়না। কথাটা শুনে ছক্কুর মনটা একটু খারাপের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই এলোমেলো হাওয়া আর তার সঙ্গে মুখেচোখে বৃষ্টির গুঁড়ো লেগে তার মনের এমন একটা অবস্থা হল যা সে আগে কখনও বোধ করেনি। আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে ফিসফিস করে বেরিয়ে এল,

মন ভাল করা হাওয়া,
তোমাকেই শুধু চাওয়া

যা হবার তাই হল। মামদোই হোক আর পদ্যেরই হোক, ভূত ভূতই। ঘাড়ে চড়লে ছেলেবুড়ো সকলেরই কান্ডজ্ঞান লোপ পায়। ভালমন্দ বোধ থাকে না। একটা আচ্ছন্নভাব মনটাকে দখল করে নেয়। ছক্কুর বেলাতেও তাই হল। একেইতো এলোমেলো হাওয়ায় তার মনটা ভাল হয়ে গেছিল। তার উপর বাড়তি মায়ের বলা ওই চাওয়া কথাটার সঙ্গে হাওয়াটাকে নিজের অজান্তেই মিলিয়ে দিয়ে তার মনে হল তাইতো, সেতো ইচ্ছে করলেই পদ্য লিখতে পারবে। তার মনে একবারও সন্দেহ হল না যে গোটা ব্যাপারটাই আসলে পদভূতের কারসাজি আর এর ফল মোটেই ভাল নয়। উল্টে তার মনে বেজায় ফুর্তি। পদভূত ক্রমশঃ ছক্কুর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকল।

শুরুতে ব্যাপারটা কেউ বুঝতেই পারেনি। কিন্তু ধরা ঠিকই পড়ে গেল। মায়ের চোখ বলে কথা, এড়িয়ে যাবে কোথায়। ছক্কুর মা একদিন লক্ষ্য করলেন যে ছেলে যেন আনমনা হয়ে কীসব ভাবে। বই বন্ধ করে জানলার বাইরে দিয়ে কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা কথা বলতে বলতে নিজের মনে বিড়বিড় করে।

ছক্কুর ডিমের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা। সেকথা মনে রেখে একদিন বিকেলে মা ছক্কুর হাতে একটা ডিমের পোচ ধরিয়ে অনেক আদর করে বললেন, "হ্যাঁরে, তোর কী হয়েছে বলতো?"

ছক্কু বলল, "কেন মা, কিছু হয়নি তো!"

মা বললেন, "কী এত ভাবিস জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে?"

ছক্কু কান্ডজ্ঞান হারিয়ে হুট করে বলে বসল,

জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে,
যা পেতে চাই যাচ্ছি পেয়ে

মোক্ষম ধরা পড়ে গেল। মা যেন চমকে উঠলেন। তবুও যেন মায়ের মনে একটু সন্দেহের দোলা। যা শুনলেন তা ঠিক শুনলেন তো! মনের মধ্যে একটা খচখচানি নিয়ে মা চলে গেলেন রান্নাঘরে। দুধটা গ্যাসে বসানো আছে। এমন সময় কে যেন দরজার ঘন্টা বাজালো। মা এসে দরজা খুলতেই পৃথার মা পৃথাকে নিয়ে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়লেন। সোফায় বসে একটু হাঁফিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ছক্কু কোথায়?"

"ও পড়ছে, ডাকছি। কেন, কি হয়েছে! "

"না, না, ডাকতে হবে না। এই পৃথা যাতো তুই ছক্কুর ঘরে!"

পৃথা চলে যাওয়ার পরে তার মা বললেন, "এই নীপা, ছক্কুর কি হয়েছে রে?"

নীপা, মানে ছক্কুর মায়ের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে কি তাঁর ধারণাটাই ঠিক! সামলে নিয়ে বললেন কেন রে তীর্ণা, কি আবার হবে?"

"কেন, তুই জানিস না, ছক্কু আজকেও তো বকা খেয়েছে স্কুলে! পৃথা বলছিল কদিন ধরেই নাকি ক্লাশে সারাক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের বটগাছটার দিকে চেয়ে থাকে। অথচ ওর মত ভালো মনোযোগী ছেলে আর হয় না। কেউ কিছু বুঝতেই পারছে না।"

এই বলে একটু থেমে, "এর মধ্যে দ্যাখ, " বলে তীর্ণা মানে পৃথার মা ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করলেন। খাতাটা পৃথার। একটা পাতা খুলে বললেন, "এই দ্যাখ।"

ঢোঁক গিলে ছক্কুর মা খাতাটা নিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু যাকে বলে চড়কগাছ। স্পষ্ট দেখলেন, হ্যাঁ, হাতের লেখাটা ছক্কুরই, স্পষ্ট লেখা আছে-

লেখা আর পড়া ফের পড়া আর লেখা
সারাদিন সারামাস শেখা শুধু শেখা
এত লেখা এত পড়া জেনে রাখ পৃথা
সব ভুল বিলকুল একেবারে বৃথা

এতটা যে হয়ে যাবে তা পৃথার মা আশা করেননি। "ছক্কু রে--- " বলে নীপা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কান্নার শব্দে পৃথা আর ছক্কু দৌড়ে এল। ছক্কু জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে মা?"

নীপা কিছু বলতে পারছেন না। গলা আটকে আসছে। পৃথার মা ছক্কুর দিকে খাতাটা বাড়িয়ে বললেন, "ছক্কুবাবা, এটা তুই লিখেছিস?"

ছক্কু বলল, "হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে কেন, লিখেছিস তো কী হয়েছে? শুধু বল তুই-ই লিখেছিস কি না।"

ছক্কু যেন কিছু মনে করবার চেষ্টা করে বলল, "তাই হবে।"

ততক্ষণে ছক্কুর মা একটু সামলে নিয়ে, তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "কেন তোর ওইরকম লেখার কথা মনে হল?"

ছক্কু বলল, "কী জানি। মাঝে মাঝে কী যে হয়। নিজেই বুঝতে পারি না।" তারপরেই আচমকা বলে উঠল,

যদি আমি লিখেই থাকি
সে কি খারাপ দোষ
না লিখলেই মানুষ হব
লিখলে গরু মোষ?

শুনে নীপা আবার ফুঁপিয়ে উঠে কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু কথাগুলো সব জড়িয়ে গেল। শুধু শানুদা. . . শানুদা শব্দটা দু-তিনবার উচ্চারণ করলেন এটা বোঝা গেল। পৃথা খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "ছক্কু বলেছে, ও কবি হবে।"

দরজা খোলাই ছিল। এরমধ্যে কখন যে ছক্কুর বাবা ঘরে ঢুকেছেন কেউ বুঝতে পারেনি। ঘরের সমস্ত অবস্থাটার দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে তীর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? পৃথার ছোট্ট জবাব, ছক্কু পদ্য লিখেছে। লিখেছে নয়, লিখেছে নয়, ওর ঘাড়ে ভর করেছে- এ- এ- এ- - নীপার গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এল। ছক্কু একবার মায়ের দিকে আর একবার বাবার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে পৃথার হাত ধরে নিজের ঘরে চলে গেল। নীপার সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। এমনই অস্থির হয়ে পড়েছে যে চোখের জল আর মুখের লালা মিশে গিয়ে ঘড়ঘড়ানি আওয়াজের মাঝে শুধু দু-একবার শানুদা. . . শানুদা শব্দটা উচ্চারিত হচ্ছে।

তীর্ণার কাছে ছক্কুর বাবা যতটা পারলেন শুনলেন। যা শুনলেন তাতে মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। একটু পরে গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়লেন, ছক্কু এদিকে এসো। ছক্কু এসে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। 'আয় না বলে তার বাবা 'এসো' বলেছেন তাই ছক্কুর চোখের দৃষ্টিতে একটা ফ্যালফ্যালে ভাব, হয়তো বা একটু অপরাধের চিহ্নও। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, এসব কি ছক্কু। ছক্কুর দৃষ্টি ততক্ষণে সব ছাড়িয়ে যেন দিগন্ত পার করেছে। সে থেমে থেমে বলল,

যেসব কথা খুব জরুরি
যেসব কথা দামি,
আমায় দিয়ে কেউ তা বলায়
কিন্তু সে নয় আমি

ছক্কুর কথা শুনে বাবা রীতিমত চমকে উঠলেন। তীর্ণার কথা পুরোটা বিশ্বাস না করলেও এখন তো হাতেনাতে প্রমাণ। এক কাপ চা, বলে ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে।

ছক্কুর মা সে অবস্থায় নেই, যে অবস্থায় থাকলে চা করা যায়। সুতরাং তীর্ণার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে ছক্কুর বাবা কয়েকটা দীর্ঘ চুমুকে চা শেষ করেই ফোনে হাত দিলেন। প্রথমেই ছোটবেলার বন্ধু, এখন নামকরা ডাক্তার অসিত। কেউ ফোন ধরছে না। তারপরে চন্দননগরে ছক্কুর মামা অতীন। জানা গেল সে অনেক রাত্রে ফিরবে। তৃতীয় ফোনটা গেল. . . . নাঃ গেল না, মোবাইলের সুইচ বন্ধ। কিছুটা হতাশ হয়ে আরেকটা ফোন, কিন্তু ওপাশের কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অন্য আর একটা নম্বরে ডায়াল করতেই ভেসে এল সেই বিরক্তিকর কথাটা- আপনি যে নম্বরে ডায়াল করেছেন, সেই ফোনটির অস্তিত্ব নেই। অথচ আজ সকালেও এই নম্বরে কথা হয়েছে। ধুৎ, বলে ছক্কুর বাবা সমরবাবু ফোনটাকে যেন ছুঁড়েই রাখলেন। ছক্কু এতক্ষণ পৃথার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এখন হঠাৎ বলে উঠল,

ফোন মানে এক যন্ত্রণাই
খামখেয়ালির অন্ত নাই

সমরবাবু ঝটিতি তাকালেন ছেলের দিকে। আর স্তিমিত হয়ে আসা নীপার কান্নাভেজা স্বর বা ঘড়ঘড়ানি দ্বিগুণ হয়ে গেল। সঙ্গে সেই অস্ফুট শানুদা উচ্চারণ।

পরেরদিন বিকাল পাঁচটায় ছক্কু তার মা, বাবা, অতীনমামা আর পৃথার মা তীর্ণাকে নিয়ে হাজির হল এক প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। আসলে যা বললাম তার উল্টোটাই হল। মানে অন্যেরা ছক্কুকে নিয়ে হাজির হলেন। একথা সেকথার পরে ডাক্তারবাবু ছক্কুকে একটা আধা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করলেন, ছবি দেখালেন। তারপরে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রথমে বললেন, তুমি কী খেতে ভালবাসো? ছক্কু অম্লানবদনে বলল,

বাঙালির রসনার সব সেরা সৃস্টি
মিষ্টি, মিষ্টি মিষ্টি

ডাক্তারবাবু হেসে ফেললেন। বললেন বাঃ আমিও মিষ্টি দারুণ ভালবাসি। তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পদ্য লিখতে ভালবাসো? ছক্কু দেওয়ালে একটা টিকটিকির দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল,

পদ্য আমি লিখি না তো
কেউ লিখিয়ে নেয়
পদ্য লেখার মধ্যে কিছু
দেখছি না অন্যায়

এবারে ডাক্তারবাবু একতা ছুঁচলো মতন টর্চ বার করে তা সোজাসুজি ছক্কুর চোখে ফেললেন। তারপর যেন বহুদূর থেকে বলছেন, এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, পদ্য

লেখা বা বলার আগে তোমার মনের ভিতর কি একটা ছটফটানি হয়, বমি করার ইচ্ছের মত? ছক্কু চোখটা বন্ধ করে খুব শান্তভাবে বলল,

লেখার আগে একটুখানি
বুঝতে পারি ছটফটানি
লেখার সময় শান্ত থাকি
নয়তো লেখা মারবে ফাঁকি

ডাক্তারবাবু কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বেরিয়ে এসে তিনি ছক্কুর বাবাকে বললেন, নাঃ ওর কিছুই হয়নি। আপনারা খামোখা দুশ্চিন্তা করছেন। তবু একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দুদিন অন্তর ঘুমোতে যাওয়ার আধঘন্টা আগে একটা করে খাওয়াবেন। বলে ছক্কুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, খুব ভালো ছেলে তুমি। আরও ভাল হতে হবে।

সমরবাবু মানিব্যাগটা বার করতেই ছক্কু বলে উঠল,

কিছুই যখন হয়নি তবে দিচ্ছ কেন ফি
হয়নি যে তা সবার আগে আমিই বলেছি

যাঃ বাবা! ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। ছক্কু সেদিকে খেয়াল না করে বলেই চলল,

এখন যদি ফি দাও তবে সেতো আমার পাওনা
নতুন ক্যারাম কিনব আমি ফি' টা বাবা দাও না

ছক্কুর মা কি ফিট হয়ে গেলেন! সেরকমইতো মনে হচ্ছে। তীর্ণা তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে জল বের করে চোখেমুখে খানিকটা ছিটিয়ে দিলেন। ডাক্তারবাবু কী যেন একটা ওষুধ সমরবাবুর হাতে দিয়ে বললেন নীপাকে খাইয়ে দিতে। সেটা খেয়ে কিছুক্ষণ বসার পর নীপার যেন সম্বিত ফিরে এল। ছক্কু নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপার দেখছিল। এখন কেতে কেতে উচ্চারণ করল,

মায়ের বদ্যি আমার ওঝা
কার যে কী রোগ যায় না বোঝা

সমরবাবু যেন নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আচমকা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ছক্কুর গালে। আবারও হাত তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখানে অতীনমামা লাফিয়ে পড়লেন। তীর্ণা ছক্কুর গালে হাত বুলিয়ে বললেন, ওর দোষটা কি! আরে ওতো অসুস্থ। ডাক্তারবাবু এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে পড়লেন যে মনে হল এক্ষুণি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার। তিনি কোনওক্রমে আস্তে আস্তে বললেন, এ

আমার কম্ম নয়। আপনারা ওকে ওঝার কাছেই নিয়ে যান। ফি দিতে হবে না বরং ওকে একটা ক্যারাম কিনে দেবেন।

এসব কথা আমি শুনেছিলাম পরেরদিন তীর্ণা, মানে পৃথার মায়ের কাছে। জিজ্ঞাসা করেও শানুদার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। তীর্ণাও জানে না। এরপরের ঘটনা আমার জানা ছিল না। কারণ পরেরদিনই আমাকে চলে যেতে হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মানুষের সমাজ ও পরবেশ সম্পর্কে নানান তথ্যসংগ্রহের কাজে। প্রায় ছমাস পর যখন ফিরে এলাম তখন ছক্কুরা আমাদের পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে। শুনলাম ওর বাবা মানে সমরবাবুর চাকরিতে বদলি হয়ে ওরা কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ চলে গিয়েছে। তবে ছক্কু নাকি আগের মতনই স্বভাবে আর পড়াশোনায় ভাল আছে আর পদ্যের ভূত তার ঘাড়ে আরও জাঁকিয়ে বসেছে।

এরপর কলকাতায় মাঝেমাঝেই এলেও বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল ছক্কুদের কোনও খবর পাইনি। তারপর কিছুদিন আগে পাকাপাকি ফিরে এলাম। একদিন পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে গিয়ে চমৎকার প্রচ্ছদ দেওয়া একটা ছোটদের কবিতার বই নজর কাড়ল। মলাট উল্টে দেখি, কবির নাম শান্তনু গুহঠাকুরতা।

বইটির ভূমিকায় লেখা-

'যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, তখন-ই আমার ঘাড়ে চড়েছিল পদ্যের ভূত। যখন তখন পদ্য লেখা বা ছড়া কাটা আমার অভ্যেস দাঁড়িয়েছিল। আমি বখে যাচ্ছি, এইরকম একটা ধারণা নিয়ে আমার বাবা-মা বহু চেষ্টা করেছিলেন পদ্য থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু এ ভূত যার ঘাড়ে চড়ে তার আর নিস্তার নেই। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে আমার আর কিছুই হয়ে ওঠা হয়নি, সফল কবিও না। তবুও আমার ভূতবন্ধুটিকে পেয়ে আমি খুশি। আমি চাই আমার ছোট্টবন্ধুরা প্রত্যেকে পদ্যের ভূতের সঙ্গলাভ করুক। তাতে ওদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।'

এরপরে উৎসর্গপত্রে লেখা-

শৈশবেই বড়মাপের কবি হয়ে ওঠা আমার প্রিয়তম ভাগ্নে শ্রীমান ছক্কুকে (অয়ন বসুরায়) - শানুমামা

ঝটিতি আমার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, তাইতো। ছক্কুর নাম তো অয়ন বসুরায় ছিল। তাহলে যে অয়ন বসুরায়কে নিয়ে সাহিত্যমহলে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে সেতো আমাদের ছক্কুই। বয়সের হিসাবেও তো মিলে যাচ্ছে। কদিন আগেই মাত্র আঠারো বছর বয়সী এই কবির সাম্প্রতিক কবিতার বই 'হারানো তারার ঠিকানা' এবছর তীর্থঙ্কর পুরস্কার পেয়েছে। সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ পারছি যে শান্তনু

গুহঠাকুরতাই নীপার উচ্চারিত সেই শানুদা আর তিনিই তাহলে আজকের সুখ্যাত তরুণকবি অয়ন বসুরায় মানে ছক্কুর ঠিকানা পদভূতকে দিয়েছিলেন। পুরনো সেই কথাটা তাহলে আজকের দিনেও প্রযোজ্য। নরাণাং মাতুলক্রম।

ছবিঃ সোমা

পিকনিক

তাপসকিরণ রায়

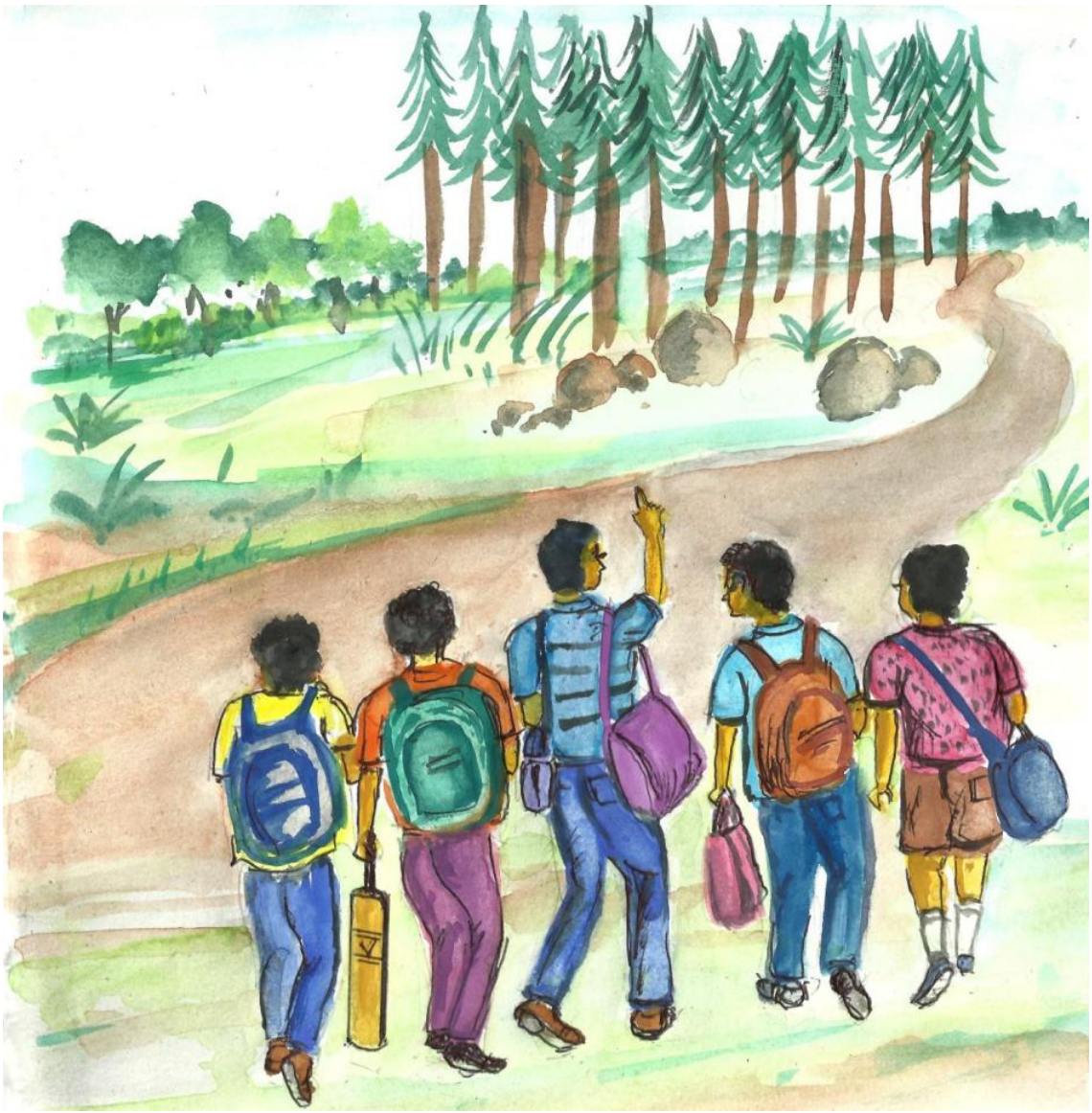

বাবুর কথা শুনে দেবাশীষ হই হই করে হাত পা ছুঁড়ে নেচে উঠলো, ‘পিকনিক হবে, পিকনিক হবে।’ বয়স তাদের এই আট থেকে বারোর মধ্যে। জীবনের প্রথম পিকনিক, তাও কেবল ছোটদের দলেরই পিকনিক- - কোনো বড়রা থাকবে না, কোনো আবিভাবক থাকবে না। নিজেরাই সবেসার্বা।

ভাবতেই একটা আনন্দ জেগে ওঠে ওদের মনে। বন্ধু ছিল পাঁচ ছ জনের মত। নন্টাই, রঘু, বাবু, কল্যাণ আর দেবাশীষ। পিকনিক হবে কথাটা শোনামাত্রই দেবাশীসের সঙ্গে সবাই নেচে উঠলো।

'কোথায় হবে? কোথায় হবে?' বলে চিৎকার করলো নন্টাই। বাবু বলল, 'ফরেস্ট, ফরেস্টে।' পিকনিক শুনে সবাই আনন্দে আত্মহারা। কারো মুখে আপত্তির টুঁ শব্দটা শোনা গেল না।

কল্যানের একটু খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর বেশি। সে বলল, ' কী খাব আমরা পিকনিকে?'

এটাই ছিল সব চেয়ে সমস্যার ব্যাপার। অনেক ভেবেচিন্তে মেনুটা তৈরি করতে হবে। কারণ এমন সব আইটেমই রান্নার জন্য রাখতে হবে যা সহজে রান্না করা যায়। কঠিন রান্না রাখা যাবে না, কারণ ওদের মধ্যে রান্না কেউই জানে না। জানার কথাও নয়। ঘরে সবার মা রান্না করেন। এমনকি এখনো নাকি নন্টাইকে তার মা ভাত মেখে খাইয়ে দেন। এ ব্যাপারটা নিয়ে বন্ধুরা অনেক ঠাট্টাও করেছে।

'নন্টাই, আয়, খেয়ে যা বাবা, এই শেষ গরাস খেয়ে যা' , নন্টাইয়ের মার গলা শুনে সেদিন খুব হেসেছিল বাবু। গলাটা একটু নিচু করে বলেছিল, 'যাও খোকা, খেয়ে এস, গরাস করাই আছে' ।

তাই অনভ্যস্ত, রান্না না জানা ছেলেদের কাছে সবচেয়ে যেটা সমস্যার বিষয় ছিল সেটা হল, রান্না করবে কে?

দলের পান্ডা ছিল বাবু- বাবু কুমার চৌধরী। বন্ধুদের মধ্যে বয়সে বড়। অন্যান্যদের থেকে একটু বেশি বুদ্ধিও রাখে। পালের গোদা এবং অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ বলে তার কথা সবাই মেনে নিতে আপত্তি করে না, বরং এটাই সব বন্ধুরা দেখেছে যে তার কথামত চলে সবাই সব সময় আনন্দ পেয়েছে। আর বাবুর এবারের দেওয়া পিকনিকের প্রস্তাবে ওরা বলতে গেলে যার পর নাই আনন্দই পেয়েছে।

পিকনিকের দিন ধার্য হলো পয়লা বৈশাখ , নববর্ষের দিন। আনন্দে আত্মহারা সব বন্ধু। ঠিক হয়েছে সবার ঘর থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন, এক দু আইটেমের সবজিও নিয়ে নেওয়া হবে। যে যেমন খেতে পরে সেই আন্দাজ মতই নেবে। সবার ঘর থেকে যাবে থালা, গ্লাস, হাঁড়ি , কড়াই খুন্তি ইত্যাদি প্রয়োজন মতো সব কিছুই। কথা থাকলো রান্নাবাড়ার সমস্ত

ভার থাকবে দলনেতা হিসাবে বাবুর উপরে। এটা আলাদা করে বলার কিছু নেই, সবাই জানে, সে কাজের দায়িত্বটা বাবুদা নেবে। এর জন্য কাউকে বলবার দরকার হয় নি। তবে তার কাছে যেটা প্রধান সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা হলো রান্না। জীবনে রান্নার র-এর অভিজ্ঞতাটা পর্যন্ত তার নেই। দলের অন্যদের এ ব্যাপারে আরো খারাপ অবস্থা। বাবুর মনে আছে একদিন তার মা-বাবা কী কারণে যেন বাড়ি ছিলেন না। তাকে বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। রান্না করে খেতে হয়েছিল আধ সিদ্ধ ভাত আর সেদ্ধ আলু-বেগুন। তবু খেয়েছিল. নুন আর লংকা দিয়ে তৃপ্তি সহকারেই খেয়েছিল। পেটে যখন ছুঁচোয় ডন মারে আধসেদ্ধ আলু বেগুন ভাতই লাগে অমৃত সমান। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বাবুর মনে হয়েছে ওদের পিকনিকের রান্নাটা ও কোনোমত চালিয়ে নিতে পারবে। বন্ধুদের ঘরের মা বাবারাও ছেলেদের ব্যাপারে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে-কে কী নিচ্ছে, কী রান্না হবে , কোথায় পিকনিক হবে, কী মেনু হচ্ছে এবং সব শেষের প্রশ্নটা হলো রান্না করবেটা কে!

অনেক মা বাবাদের মনে সন্দেহ জেগে উঠলো এই ভেবে যে বাবু রান্না করতে পারবে তো!

সবচাইতে চিন্তিত হলেন বাবুর মা। যে ছেলে তাঁর কস্মিণকালেও রান্না ঘরে ঢোকেনি সে কী রাঁধবে কে জানে! তবু ওরা আনন্দ করতে যাচ্ছে যাক। অন্তত সেদ্ধ ভাত তো খেয়ে আসতে পারবে -না খেয়ে তো আর ফিরবে না!

চলো চলো চলো পিকনিক। সকাল থেকেই সাজোসাজো রব উঠে গেল। কোনো মত সকালের খাবারটা গলঃধকরণ করে গত দিনের তৈরি রাখা সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে পথে নেমে পড়ল সবাই। এ যে বিরাট অভিযান - মনে হচ্ছে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়া পার হতে বেরিয়েছে তারা।

রিজার্ভ ফরেস্ট ওদের ঘটকপাড়া থেকে দেড় কিলোমিটারের মত পথ হবে। সদলবলে ওরা আট থেকে দশ বছর বয়সি এক সেনাবাহিনী যেন মার্চ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। সবার হাতে ছোট বড় একটা করে ব্যাগ, দেবাশীসের হাতে তিন চার লিটারের ওয়াটার পটও ঝুলছে। টুকিটাকি সব জিনিসে ব্যাগ ভরা--বাবুদা মাথা খেলিয়ে লিস্ট বানানোর পর খুঁটিনাটি

সব জিনিসই নেবার তারা চেষ্টা করেছে। দুচার টুকরো শুকনো লকড়ি থেকে শুরু করে মায় দেশলাইটা পর্যন্ত। বাবু তার মার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে বিশেষ ট্রেনিং , যেমন ডালে কী মসলা ফোড়ন দিতে হয় এবং তা ডাল কড়াইতে চাপাবার কতক্ষণ পর। গোনাগুন্তি একটা করে মাছের টুকরো সঙ্গে যাচ্ছে। সেটা হলুদ লবনের সংমিশ্রণে কীভাবে গরম তেলের কড়াইতে ছাড়তে হবে সেসবও জেনে নিয়েছিল বাবুদা।

সবচেয়ে বড় কথা এবার আর সে আধ ফোটানো চাল ডাল খেতে চায় না আর কাউকে খাওয়াতেও চায় না। সে জন্য সে নিয়েছে পাক্কা ব্যবস্থা। এরজন্য ও কাগজের দুচার পাতায় বিশদ রন্ধন প্রণালী ব্যাপারটা নোট করে নিজের সঙ্গে রেখেছে। তাতে লেখা আছে, কোন পদ কীভাবে রান্না করতে হবে। নোট বুকের এক আধটা পাতা দেখলে বোঝা যাবে যে পরীক্ষার পড়া করার মত সে এবার রান্না করার অনেক পাঠ নিয়েছে মার কাছ থেকে - দু চার পাতার কাগজে উনান ধরানোর টেকনিক থেকে শুরু করে টুকিটাকি কী নোট করা নেই তা বলা ভার ! যেমন ধরা যাক ভাত রান্নার কথা। ওতে এক জায়গায় ভাত রান্নার বিস্তৃত বিবরণ দেবার পর আলাদা করে নোট লিখে রাখা আছে- - ভাত কখনো নুন দিয়ে রান্না করতে নেই। এ হেন ট্রেনড কুক ওরফে বাবু সঙ্গে থাকায় বাকি বন্ধুদের পিকনিকের ব্যাপারে কোনো চিন্তার কারণ থাকতে পারে কি!

দেখতে দেখতে দেড় কিলোমিটার পথ শেষ হয়ে এল। চোখের সামনে বিরাট বনভূমি। ছোট বড় অনেক গাছ মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে- - ওদের মনে হলো ওই বন ওদেরই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আনন্দে ওদের মন ভরপুর। রঘু, কল্যাণ ওরা দলের মধ্যে একটু ছোট। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের ছাপ ওদের মুখে ধরা পড়ছিলো, ‘বাঘভাল্লুক নেই তো বাবুদা’ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে রঘু।

‘আমারও ভয় করছে, ' রঘুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কল্যাণও বলে ওঠে। ওরা শর্টকার্ট রেল লাইনের পার ধরে চলে যাওয়া সরু পথেই এসেছে ফরেস্টে। এর আগেও বন্ধুরা মিলে ঘুরে গেছে এ জঙ্গলে। তাদের কাছে একেবারে নতুন নয় এ জঙ্গল তবে এবার একটু ভেতরে যেতে হবে। পছন্দমত একটা জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানটা রান্নাবান্না করা, এক

জায়গায় বসে গল্প গুজব খাওয়া দাওয়া করা, এসবের জন্য স্থান অকুলান না হয়।

সবাই উল্লাসে নাচতে নাচতে বনের ভিতরে ঢুকতে লাগলো।কল্যাণ, রঘু থালা বাজাতে বাজাতে চলল। আনন্দে নাচতে নাচতে তারা পছন্দ মতো একটা জায়গায় এসে পৌছালো। মোটামুটি সবার পছন্দ জায়গাটা।এবড়ো খেবড়ো অসমতলতার মধ্যেও বেশ কিছুটা জায়গা সমতল আছে।পাশেই একটা টিলা আছে, ওটাকে ছোটো পাহাড় বলে ধরে নিলে মন্দ হয় না।

বাবার পুরনো হাতঘড়িটা দেখে দেবাশিষ বলল, ' আরে বাবা, বারোটা বেজে গেছে, তাড়াতাড়ি রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে।'

" হ্যাঁ, হ্যাঁ , সতরঞ্চিটা পাত তো! সবাই জিনিসপত্র রাখ, দু' মিনিট বিশ্রাম করে কাজে লেগে যেতে হবে' , সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল বাবু। ছোটরা পাশের টিলাতে গিয়ে উঠলো। ভয়ে এদিকওদিক উঁকি ঝুকি মারতে লাগলো। সুন্দর জায়গাটা! চারদিকে শাল সেগুনের মেলা। প্রকৃতির মাঝে

সবুজের খেলা চলেছে। নানা পাখির বিচিত্র অথচ সুন্দর সুর কানে ভেসে আসছে।

রান্নায় নেমে গেল বাবু আর দেবাশীষ। দুচারটে পাথর খুঁজেপেতে আনা হলো উনান তৈরির জন্য। ছেলেদের কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় করার কথা বলা হলো। এবার উনান জ্বালাবার পালা। দেখা গেল একটু কেরোসিনের বড় দরকার ছিল, কারণ উনান জ্বলতে চাইছে না। কাঠের টুকরোগুলি আধ-শুকনো, দপ করে জ্বলেই আবার নিভে যাচ্ছে। এবার শুরু হল ফুঁ দেবার পালা। দেবাশীষ ফুঁ দিতে দিতে চোখ লাল করে ফেলল। তারপর পালা করে এক এক করে সবাইকে ডাকা হলো উনান ফুঁ দিয়ে জ্বালাবার জন্য। ঘর থেকে আনা পোঁটলা-পুঁটলিতে কাগজের যত মোড়ক ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে চলল উনান ধরাবার তোড়জোড়। শেষে সবাইকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল বাবু , সবার বাবুদা , দু একটা কাগজ এদিক ওদিক যেখানে যার কাছে যা ছিল ফেলল উনানে আর বুক ভরে দম নিয়ে বিশাল এক ফুঁ মারলো তাতে। এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। বাবুও নিজের কৃতিত্ব ফলাবার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা গম্ভীর হাসি দিল।

কড়াই বসলো। কড়াইতে তেলও পড়ল। এবার কী করতে হবে? চারিদিকে হই চই পড়ে গেল--সাজ সাজ রবের বদলে খোঁজ খোঁজ রব পরে গেল।

"আরে কোথায় গেল, সেই, সেই খাতার পাতাগুলো!--যাতে নোট করা ছিলো রান্নার নিয়ম কানুন!--কখন ডালে ঢালতে হবে জল , মাছ কোন মশলায় মেখে ভাজার জন্য তেলে ছাড়তে হবে? অথবা যে কাগজে বিশেষ নোট করে লেখা ছিল , ভাত বানাতে গেলে তাতে নুন দিতে নেই! হই হট্টগোলের মধ্যে ননটাই বলে উঠলো, বাবুদা, তুমিই তো সব কাগজ উনুন ধরাতে গিয়ে উনুনে দিয়ে দিয়েছ !

কপালে হাত পড়ল বাবুর। ‘এবার কী হবে’ বলে ধপ করে বসে পড়ল। অগত্যা সাধারণ জ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচা পাকা এক ধরণের রান্না তৈরি হলো। বাবুদা ফেলিওর হওয়াতে রান্নার ক্ষেত্রে সবার অভিজ্ঞতাই কাজে

লাগাতে হলো। তাতে আনন্দও কম ছিল না কারো। খেতে বসে জানা গেল কোনো কিছুতেই নুন নেই।

ঘড়িতে প্রায় বেলা দুটো বাজছে। ছুঁচোয় অতিরিক্ত ডন মারতে শুরু করে পেটে। আধকাঁচা আধপোড়া নুন ছাড়া যাই রান্না হোক না কেন কিছু তো একটা মুখে দেওয়া যাবে! সবাই মিলে খেতে বসলো। খিদের পেটে সবাই আনন্দে পেট ভরে খেল।

সে দিনের পিকনিক সবার কাছেই স্মৃতি হয়ে থাকলো।

ছবিঃ অনুপম

স্বপ্নের দেশে পঞ্চমী

সোনালী ঘোষাল

‘‘মা,মাগো,ওমা,বড্ড খিদে পেয়েছে।’’ মেয়ের ডাক শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করে মা একমনে গোবর দিয়ে উঠোন নিকোচ্ছিল।

‘‘মা,বড্ড খিদে।কিছু খেতে দেবে?’’

‘‘ঘুম থেকে উঠেই খালি খাই খাই।দেখছিস না কাজ করছি।’’

‘‘কী করব? কাল রাতে তো কটা শুকনো মুড়ি ছাড়া কিছুই দাওনি।তাই তো খিদের চোটে পেট জ্বালা করছে মা।’’

‘‘দাঁড়া, দেখি, ঘরে কিছু আছে কি না।’’ মা গোবর মাখা হাত ধুতে ধুতে বলল। তারপর ঘরে ঢুকে এ কৌটো, ও কৌটো হাতড়ে কিছুই না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর ভাবতে লাগল ছোট্ট মেয়েটার মুখে কী তুলে দেবে।নিজের উপর আর তার সোয়ামীর উপর খুব রাগ হতে লাগল ভারতীর। রোজগারের কোন চেষ্টাই করতে চায় না। যেদিন হাতে করে কিছু আনে তো বাড়ি ফিরেই নবাবের মত মেজাজ। এসব তবু সহ্য হত, কেননা সেই দু’একদিন তবু মেয়েটার মুখে ভালোমন্দ না হোক শাকভাত তুলে দিতে পারত।কিন্তু

আজকাল আবার হাতে টাকা এলে নিজেই সবটা খরচ করে ফেলে। তাইতো ওদের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। আহারে! মেয়েটার খিদে পেয়েছে। ওকে যে কী দেবে এখন!

''মা, ওমা, কই খেতে দাও,'' বলতে বলতে পঞ্চমী ঘরে ঢুকল। রাগে, দু:খে, ক্ষোভে, অভিমানে ভারতী মেয়েকে বলে ফেলল,''এতলোকের মেয়ে মরে,তুই মরতে পারিস না? তাহলে আমার সব জ্বালা জুড়োয়।'' ফ্যালফ্যাল করে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পঞ্চমী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে এসে পৌঁছল।আঁজলা ভরে নদীর জলই খানিকটা খেয়ে নিয়ে নদীর কিনারে চুপ করে বসল।ওর বয়স ৮/৯ হবে।গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মিডডে মিল প্রকল্পে ছেলেমেয়েদের খেতে দেবার ব্যবস্থা আছে।পঞ্চমী বসে বসে ভাবতে লাগল, আগের হেডস্যারের উদ্যোগে ছেলেমেয়েরা পেটভরে কোনদিন ডিমের ঝোল ভাত, কোনদিন খিচুড়ি আর মাছভাজা খেতে পেত।গ্রামের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই খাবার লোভে স্কুলে যেত। হেডস্যার ওদের দাঁড়িয়ে থেকে যত্ন করে খাওয়াতেন। পঞ্চমী কিন্তু শুধু খাবার আশায় স্কুলে যেত না। ওর পড়াশোনা করতে, লিখতে শিখতে, নতুন নতুন জিনিস জানতে খুব ভালো লাগত।তাই সে কোনদিনই স্কুল কামাই করত না। বাড়ি ফিরেই সে স্যারেদের পড়াগুলো ঝালিয়ে নিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ষাঁড়াষাঁড়ির বানে নদী ফেঁপে ফুলে উঠে ওদের গ্রামের নদী বাঁধ ভেঙে অনেক বাড়ি ধ্বসে পড়ল।বরাত জোরে ওদের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর রক্ষা পেল। সর্বস্ব হারানো ঘরছাড়া মানুষগুলোর মাথা গোঁজার ঠাঁই হল ওদের স্কুলে। তাই খাওয়া দাওয়া, পড়াশুনা সব শিকেয় উঠেছে।আর মায়ের মেজাজ মরজিও যেন বদলে গেছে।

হঠাৎ ওর খুব কান্না পেল।ভাবল, মা তো মরতেই বলেছে। তাহলে আজ সে জলে ডুবেই মরবে। কিন্তু মরে যাবার কথা ভাবতেই ওর বুকের ভেতর কেমন একটা কষ্ট হতে লাগল।আবার খুব ভয়ও হল। এখন ও যে কী করে? আকাশ-পাতাল ভেবেও কুলকিনারা করতে পারল না। হঠাৎ ও অবাক হয়ে দেখল একটা সবুজ রঙের বোতল ভাসতে ভাসতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এরকম বোতল আগে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল পঞ্চমী। আর তখনই মনে পড়ে গেল ওদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছোট মেয়ে ইভার হাতে এরকম বোতল ও দেখেছিল। সাহস করে কিসের বোতল জানতে চাওয়ায় সে বলেছিল ওটা মিরান্ডা না স্প্রাইট কিসের যেন বোতল।ও ঠিক নামটা মনে করতে পারল না।ভাবল ওর কান্নায় দয়াপরবশ হয়ে কোন দেবদেবী বোধহয় ওকে এই বোতলটা পাঠিয়েছে। বোতলটা কাছে আসতেই পঞ্চমী সেটা ধরে ফেলল।হাতে করে ওপরে তুলে দেখল বোতলের ভেতর নরম নরম ছোট্ট কোন একটা কিছু নড়ছে।সাহসে ভর করে বোতলটা খুলে ফেলতেই ভুস করে ধোঁয়ার মত কুন্ডলী পাকিয়ে কী যেন বেরিয়ে এল।তারপর ও অবাক হয়ে দেখল ওর সামনে একটা বেঁটে বামন দাঁড়িয়ে আছে।বামনটা ওকে বলল,''কীরে, বোতলটা খুললি যে, কী দরকার বল।''

ও বললে,''আমার খুব খিদে তেষ্টা পেয়েছে। তাই সবুজ বোতল দেখে ভাবলাম ওতে বুঝি কোন ঠান্ডা পানীয় আছে। তাই খুলে ফেলেছি।''

''তুই বুঝি কোল্ড ড্রিংক খুব ভালোবাসিস ?''

''না-না, আমি জীবনেও ওসব খাইনি। কী করে খাব বলতো ? আমরা তো খুব গরীব। বাবা মা আবার পেপসি না স্প্রাইট ওসব কোথা থেকে কিনে দেবে।''

''ঠিক আছে, তুই আমার সাথে চল। আমি তোকে মিরিন্ডা খাওয়াব।''

''তুমি কোথায় পাবে ?''

''চল না, দেখি'' বলেই বামনটা ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তারপর নদীনালা, গ্রামপ্রান্তর পার হয়ে ওরা এসে পৌঁছল একটা বড় রাস্তায়। একটা ম্যাটাডোরে তখন পিচবোর্ডের বাক্স করে কী যেন ওঠানো হচ্ছিল। বামনটার কাঁধের ওপর থেকে পঞ্চমী দেখলে ওগুলো তো কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল। বামনটা চোখের নিমেষে অনেক লম্বা হয়ে গেল। তারপর বাক্স থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে ওকে দিয়ে বলল,''চল, ওদিকটায় যাই। সেখানে গিয়ে মজা করে খাবি।'' ওর তো খুব আনন্দ হল। কোনদিন ও এসব খায়নি। আজ খেয়ে দেখবে কেমন খেতে। বামনটা বোতলের ছিপিটা খোলামাত্রই বুদবুদের মত কী যেন বেরিয়ে এল। ও গলায় খানিকটা ঢেলেই বললে,''ম্যা গো। এসব লোকে কী করে খায়। কেমন ঝাঁজ, ঝাঁজ। খেতে একটুও ভাল নয়, বিস্বাদ।'' এই বলে সে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

''চল, তোকে অন্য কিছু খাইয়ে নিয়ে আসি'' বলেই লোকটা একট বড়সড় ঈগল পাখী হয়ে গেল। পঞ্চমীকে পিঠে বসিয়ে উড়তে উড়তে এবার ওরা এল একটা জঙ্গলে। সেখানে অনেক নারকেল গাছ, আমগাছ, আরও অনেক ধরণের গাছ। নারকেল গাছ থেকে

নারকেল পেড়ে শক্ত ঠোঁট দিয়ে গর্ত করে ওকে দিয়ে বললে,''খেয়ে দেখ, কী মিষ্টি খেতে।'' পঞ্চমী খেয়ে দেখলে সত্যিই কী অপূর্ব স্বাদ। ওর সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর আতা গাছ থেকে কয়েকটা পাকা আতা ছিঁড়ে এনে ওর হাতে দিয়ে বললে,'' পেট ভরে এগুলো খেয়ে নে।'' বলে ঈগলটা ওকে মাটিতে নামালো। নরম নরম পাকা আতা খেতে খেতে পঞ্চমী জিজ্ঞাসা করল,''তুমি কী বহুরূপী? আমি ছিনাথ বহুরূপীর কথা পড়েছি। ঠিক তারই মতো তুমিও তো দেখছি অনেক রূপ বদল করতে পার।''

''আমার কথা জিজ্ঞাসা না করে তুই তোর দু:খের কারণগুলো বল দেখি।''

''শুনে কী করবে? আমার অনেক দু:খ। তুমি দূর করতে পারবেনা।''

''বলেই দেখ। দেখি দূর করতে পারি কিনা।''

পঞ্চমী একনিশ্বাসে ওর দু:খ দুর্দশার কথা, ওর দু:খী মায়ের কথা, ওর পড়াশুনা করার আগ্রহের কথা সব বলে ফেলল। এবার বামন বললে,''আমি জিন। আয় দেখি তোর দু:খ কষ্ট দূর করতে পারি কিনা।'' বলে ঈগলবেশী জিন ওকে নিয়ে উড়ে চলল কোন এক অচিন দেশে। দুপুর গড়িয়ে সূর্য প্রায় পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ঠান্ডা হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেছে। ওর বেশ শীতশীত করতে লাগল। ও ভাবতে শুরু করল,''কী জানি বাবা, জিনটা আবার ওকে নিয়ে কোথায় চলেছে। এসব দিকে তো ও আগে কখনো আসেনি। অজানা আশঙ্কায় ওর বুক দুরু দুরু করে উঠল। যাকগে, যা হবার হবে। ও তো আর এত দূর থেকে একা ফিরতে পারবে না। ধৈর্য ধরে দেখাই যাক না কী হয়। এই ভেবে ও চুপটি করে ঈগলের গলাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইল। হঠাৎ ঈগলটা একটা পাহাড়ের উপর এসে বসল। তারপর ওকে বললে, ''তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি যাব আর আসব। ভয় পাস না যেন।'' বলেই ঈগলটা ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করল। তারপর নিমেষের মধ্যে পিঠে একটা থলে নিয়ে ওপরে উঠে এল। পঞ্চমী সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, ''তুমি

কোথায় গেছিলে ? থলেটাতেই বা কী আছে ?'' ঈগল বলল,''আগে তুই আমার পিঠে ওঠ। তারপর থলেটা চেপে ধরে বসে থাক।''

যেতে যেতে ঈগল বলতে শুরু করল--''আমি ছিলাম একজন বণিক। ব্যবসার কাজে আমাকে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর দূর দেশে যেতে হত। একবার হয়েছে কী, এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে আমি চলেছি ঘোড়ায় চেপে। যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গুহা থেকে কতকগুলো ইয়া ষন্ডা মার্কা লোক ধনরত্ন নিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেখেই বুঝলাম ওরা দস্যু, আর ওটা গুপ্তধনের গুহা। আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন আমার ঘোড়াটাকে দেখে ঘোড়ার মালিককে খুঁজতে লাগল। ওদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। গুপ্তধন দেখে ফেলার অপরাধে ওর আমাকে মেরে আমার আত্মাটাকে একটা বোতলে ভরে পাহাড়ী খরস্রোতা নদীতে ফেলে দিল। সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম ওদের ওই গুপ্তধন আমি দু:খী মানুষের দু:খকষ্ট দূর করতে কাজে লাগাব।এই থলেতে যা মোহর আছে তাতে তোদের সারাজীবনের দু:খ ঘুচে যাবে।'' ঈগল এবার চুপ করল। তারপর তাড়াতাড়ি ডানা মেলে উড়তে উড়তে ওদের গ্রামে এসে পৌঁছে গেল। নদীর ধারে পৌঁছে বলল,'' আমি তোদের বাড়ির উঠোনে থলেটা রেখে আসছি। তুই এখানেই অপেক্ষা কর।'' চোখের পলকে ঈগল ফিরে এসে বলল,''এবার আমার কাজ শেষ। তুই আবার বোতলের মুখটা খোল। আমার আত্মাটা বোতলে ঢুকে গেলে নদীতে ফেলে দিস। আবার যদি সত্যিকারের কোন দু:খী লোকের সন্ধান পাই তবে তাকে সাহায্য করার জন্য ফিরে আসব। না হলে এভাবেই ভেসে ভেসে এদেশ থেকে ওদেশে ঘুরে বেড়াব। সমস্ত গুপ্তধন ভালো কাজে শেষ না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই। যা--যা বললাম তাই কর। তারপর চটপট বাড়ি ফিরে যা। ভালো থাকিস। সুখে থাকিস।''

বোতলের মুখটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঈগল পাখিটা বামনের রূপ ধরল। তারপর ছোট হতে হতে ধোঁয়ার মত ভেতরে ঢুকে গেল। বুকভরা একরাশ কান্নাকে গোপন করে পঞ্চমী বোতলটাকে তার ছোট্ট ছোট্ট দুহাত দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিল।

এদিকে সারাদিন মেয়েকে এখানে ওখানে পাগলের মত খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল ভারতী। শেষে হাটফেরতা এক গ্রামবাসীর মুখে খবর পেল যে সে নাকি যাবার সময় পঞ্চমীকে নদীর ধারে দেখেছিল। অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল ভারতীর। মা হয়ে রাগের মুখে তার একমাত্র সন্তানকে সে মরতে বলেছিল। কী জানি নদীর ধারে গিয়ে কী দেখবে। কোন অঘটন এতক্ষণে ঘটে যায়নি তো। কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে লাগল সে। গিয়ে দেখে মেয়ে নিশ্চন্তে ঘুমোচ্ছে। মৃদুমন্দ শীতল বাতাসে তার রূক্ষ চুলগুলো উড়ছে। দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়া কান্নার শুকনো দাগ তার মুখে চোখে। ভয়ে ভয়ে মেয়েকে ঠেলতে লাগল ভারতী। আচ্ছন্নের মতো দুচোখ মেলল পঞ্চমী। তারপর মকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

মেয়েকে খুঁজে পাবার আনন্দে মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল,''তোর জন্য মাছভাত রান্না করে রেখেছি। শিগগির চল, খাবি।'' পঞ্চমীর কানে যেন কোন কথাই ঢুকছে

না। সে ইতিউতি তাকিয়ে সবুজ বোতলটা খুঁজতে লাগল। তারপর কোথাও দেখতে না পেয়ে ভাবল তাহলে এতক্ষণ যা যা ঘটে গেল সেগুলো কি নিছকই কল্পনা না অলীক স্বপ্ন? সারাটা পথ একটা কথাও না বলে পঞ্চমী ধীরে ধীরে মায়ের সাথে বাড়ি ফিরে এল।

ছবি: অনুপম

এ রকম যে একদিন হবে, এ ব্যাপারে আমাদের একটু আধটু সন্দেহ থাকলেও যুধিষ্ঠিরদাদুর কোনদিন ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিশ্চয়তা আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছে নির্ঘাৎ। তাই টিভিতে যখন খবরটা দেখালো বেশ ফলাও করে, আমাদের রিয়্যাকশন আমরা তেমন টের পেতে দিইনি জনগণকে। আজকাল দিন যা পড়েছে, কোনটা আনন্দের খবর, কোনটা দুঃখের বোঝা যায়না। ভারত ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার পর নাকি শহরের লোকজন তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে দু চারটে বাস- অটো কি রাস্তায় ফেলে রাখা ভ্যানরিকশা পুড়িয়ে দিয়ে এসেছিল। খারাপ খবর হলে তো কথাই নেই, বাঁশ- খবরের কাগজ- পুরনো জামাপ্যান্ট- সাইকেলের টায়ার- দড়ি- কেরোসিন সহযোগে কুশপুত্তলিকা দাহ। না, আমাদের কলোনিতে এসব হয়না। আমরাও করিনি।

আমাদের এই কলোনিটার নাম চিত্রকূট। খুব বিচিত্র এখানে কিছু আছে বলে মনে হয়না, কূট বুদ্ধির মানুষও বিশেষ নেই। যুধিষ্ঠিরদাদু পেশায় উকিল ছিলেন। শুনেছি উনি খুব ভালো ডাঙগুলি খেলতেন, বাটা মাছের বিরিয়ানি বানিয়ে লোকজন ডেকে খাওয়াতেন, আর ধুতির ওপর চামড়ার বেল্ট বেঁধে মীরার ভজন গাইতেন। চিত্রকূট নামটা ওঁরই দেওয়া। আসলে শুধু কলোনির নাম না, এই কলোনির অধিকাংশ বাচ্চার নামও উনি দিতেন। সব নাম রামায়ণ- মহাভারত থেকে। যাদের পছন্দ হত না তারা পরে পালটে নিত। কিন্তু ওঁর নিজের বাড়ির ক্ষেত্রে তো তা হওয়ার জো ছিল না।

তাই আমাদের ক্লাশের ক্লাশটিচার জরাসন্ধ স্যার যখন রোল কল করতেন, রোল নাম্বার থার্টি এইট, শূর্পনখা সরখেল, প্রথম প্রথম আমাদের মনটা থমথমে হয়ে গেলেও পরে আমরা সবাই ওই নামে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। শূর্পনখার জন্ম যদিও আমাদের কলোনিতে না। ওর বাবা চিত্রাঙ্গদ, যাঁকে আমরা সবাই চিতুকাকু বলে ডাকি, হলেন যুধিষ্ঠিরদাদুর আপন ভাইপো। জ্যাঠামশাইয়ের বেশ কিছু গুণ ওনার মধ্যেও ছিল। গোয়ালিয়রের এক গোয়ালঘরে তাই জন্ম হয় শূর্পনখার। ওর মামার বাড়ি ওখানেই কিনা। মেয়ের জন্মের তিন সপ্তাহ আগে থেকে চিতুকাকু শ্বশুরবাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলেন। চিতুকাকুর ইয়া লম্বা তালগাছের মত চেহারা। ওই ঢ্যাঙা চেহারায় দুটো আরো লম্বা বাঁশের রণপা লাগিয়ে উনি মাঝরাতে কলোনি পাহারা দিতেন। ওদের বাড়ির পেঁপেগাছ থেকে রাতে একটা পাকা পেঁপে চুরি হয়ে যাওয়ার জন্যে উনি এই পাহারা চালু করেন। দারুণ ভলিবল আর হাডুডু খেলতেন ছোটবেলায়, আর কার্টুন আঁকতেন। ওঁর আঁকা পপ- আই স্পিনাচের বদলে পেঁপে খেতে ভালবাসত, যেহেতু উনি ছিলেন পেঁপেভক্ত। রোজ সকালে সাড়ে সাতশো গ্রাম পাকা পেঁপে উনি নিজে কিছু খেতেন, কিছু পাখিদের খাওয়াতেন। আর বাচ্চাদের শেখাতেন ছবি আঁকা। আমি ঘন ঘন যেতাম ওঁদের বাড়ি, আর চিতুকাকু আমার ছবি এঁকে সেটাকে পপ- আই - এর মত কার্টুন বানিয়ে দিতেন। ওঁর আরো সব উদ্ভট খেয়াল ছিল। ভজনের বদলে উনি হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল বা খেয়ালেরই বেশি ভক্ত ছিলেন। ভোর রাতে ওঁর ভৈরব শুনে কতবার ঘুম ভেঙে গেছে। যিশুখৃষ্ট আস্তাবলে, কৃষ্ণ জেলে, বুদ্ধ বাগানে জন্মেছিল বলে চিতুকাকুর ধারণা হয়েছিল ধর্মপ্রচারকের মত বিশেষ কিছু হতে গেলে হসপিট্যালে জন্মালে চলবে না। তাই গোয়ালঘর।

শূর্পনখার মামাবাড়ি থেকে ওর নাম দিয়েছিল লিপি। ও ওই নামটাই বেশি পছন্দ করত। দাদুর মত মীরার ভজন কি বাবার মত খেয়াল গাইতে না পারলেও ওর গলায় সুর ছিল, আর নখগুলোও খারাপ ছিল না। তাই শূর্পনখা নামটা ওর খারাপ লাগার কথা নয়, কিন্তু এই নামের সঙ্গে সুর বা নখের ততটা সম্পর্ক তো নেই,

যতটা আছে নাকের। আর ওর নাকটা, সত্যিই মোটেও সিঙাড়ার মত চোখা না। চোখাচোখি হলে তাই গ্রাউন্ড জিরোর মত নাকটা চোখে পড়তই।

নাক শার্প না হলেও শূর্পনখার বুদ্ধিশুদ্ধি কম ছিল না। কোন বাড়ির মেয়ে দেখতে হবে তো! ভূগোলে আর অ্যাডিশনাল ম্যাথসে বরাবর আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেত। জিব্রাল্টার কি আদ্দিস আবাবা কোথায় জিজ্ঞেস করলে একটা চরম অবহেলার মত মুখ করে ম্যাপে দেখিয়ে দিত। ওদের বাড়ির ছাদে একটা হাওয়া মোরগ ছিল। তার নীচে লাগানো ছিল একটা মস্ত কম্পাস। যেদিকে হাওয়া বইত, সেদিকে তাকিয়ে ও আমাদের ফ্যারেলের সূত্র, হ্যারিকেন ক্যাটরিনা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই সব ইন্টারন্যাশনালি ইম্পর্ট্যান্ট টপিকের ওপর জ্ঞান দিত। ক্লাসে বসে বলত, জানিস, বড় হয়ে আমি কলম্বাসের মত নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে বেরোব। আমাদের এত উচ্চাশা ছিল না, তাই কলম কামড়ে বাইরে রাস্তায় চলমান বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমরা তখন।

ক্লাশ টেন পাশ করে আমরা, মানে আমাদের চিত্রকূটের দশ- বারোজন যারা একই স্কুলে পড়তাম, তারা সবাই সায়েন্স নিয়েছিলাম। ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার হবো বলেই বাসনা। শূর্পনখা যদিও কলম্বাস হতে চাইছিল, সেও দেখলাম অজয় চক্রবর্তীর ফিজিক্স বই কিনে নিয়ে এল। আমাদের পাড়ার কীচক কাকু রায়চক

কলেজে নতুন লেকচারারশিপ পেয়েছেন, তাঁর কাছে আমরা শনি- রবিবার টিউশানি পড়তে যেতাম। কীচক কাকু খুব নিরীহ চেহারার। ভীষণ বুদ্ধিমান ছেলে বলে পাড়ায় সুনাম আছে। তামিলনাড়ুতে যেবার সুনামি হল, সেবার উনি জগদীশচন্দ্র বসুর ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সামান্য মডিফিকেশন করে কিভাবে সস্তায় সুনামি প্রেডিকশন করা যেতে পারে, তাই নিয়ে বাড়িতেই গবেষণা শুরু করেন। রাইটার্সে বুদ্ধদেববাবুর কাছে এই ব্যাপারে কিছু আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন। লাভ হয়নি বলে পরে আমির খানকে টেলিগ্রাম করেন। থ্রি ইডিয়টসের সিক্যুয়েল যদি কখনো করা হয়, তার এই আইডিয়াটা যেন তার নাম সহ ছবিতে প্রচার করা হয়। আমির খান সেই টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন কিনা, বা পেলেও উত্তর দিয়েছিলেন কিনা কে জানে। এই রকম নিপাট ভালোমানুষ ছেলের নাম যে কেন কীচক রেখেছিলেন, তা যুধিষ্ঠিরদাদুই জানেন। ভাগ্য ভালো, এ পাড়ায় কেউ ভীম নেই, অথবা দ্রৌপদী।

বারো ক্লাশের পরীক্ষার সময়েই আমরা সব জয়েন্ট এন্ট্রান্স টাইপের পরীক্ষাগুলোও দিলাম। তার রেজাল্ট বেরোতেই বোঝা গেল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আমাদের অধিকাংশের কপালে নেই। আমাদের মধ্যে অশু মানে অশ্বত্থামা মোটামুটি স্কোর করেছিল, বিহার না ঝাড়খন্ডের কোন কলেজে সে অ্যাডমিশন পেল। মোটা টাকা খরচা করে ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ওখানেই চলে গেল। ক্লাশ শুরুর কিছুদিন পরেই অবশ্য ফিরে এল ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলে ভয়ঙ্কর র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে।

কিন্তু আমাদের অবাক করল শূর্পনখা। অশুর চেয়ে অনেক ভাল র‍্যাঙ্ক করেও ও বলল, না, ওর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে নেই। ও নাকি ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চায়। যুধিষ্ঠিরদাদু তখনো বেঁচে। সাধের নাতনীর এই উটকো আবদার ওঁকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছিল না। আমাকে ডেকে বললেন, হ্যাঁরে সুগ্রীব, তোরা বড় হবি, পড়াশুনা করে রাজা উজির মারবি, তো আমাদের শুপুর ব্যাপারটা কী বল দেখি! ওই সব ছাইপাঁশ পড়ে ও কী হবে? দরজি? আমাদের জটার যে বাজারে

টেলারিঙের দোকান সে কি এসব পড়েছে নাকি? দরজি হতে গেলে কি গ্র্যাজুয়েট হতে হয় নাকি? এসব কী বে- আক্কেলে খেয়াল বল দেখি? ভালো পাশ দিয়েছিস, ডাক্তার- মোক্তার না হোস, নিদেন পক্ষে মাষ্টার হ, তা না দরজি? আমাদের সরখেল বংশের নাম কোথায় ভেসে যাবে ভেবে দ্যাখ বাবা। বাড়ির মেয়ে লেখাপড়া করে হবে লুংগি- পায়জামা সেলাই করার দরজি?

আমি বললাম, না দাদু, দরজি বলছ কেন? এ হল ডিজাইনার। যে সে লুংগি নয়গো এসব। সিল্কের লুংগি, সিনেমার নায়িকারা পরে। এক একটার দাম জানো, কয়েক লাখ! দাদুর চোখ আরো ওপরে উঠে গেল। বলিস কি সুগ্রীব! মেয়েছেলেরা আজকাল লুংগি পরছে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। দিনকাল কোথায় গেল বলতো! লাখ হোক, আর কোটিই হোক, লুংগি তো লুংগিই।

লুংগি সংক্রান্ত এই আলোচনার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর লাংসে জল জমে ভীষণ খারাপ আবস্থা হল। ভয়ানক জ্বর আর তার সঙ্গে হাঁপানি কাশি। আমি এক দিন দেখতে গিয়েছিলাম। সে দিনও উনি ওই আলোচনাটা টেনে আনতে চাইছিলেন। লুংগির বদলে সেদিনকার বিষয়বস্তু ছিল সায়া। সেই রাতেই তিনি পৃথিবীর মায়া কাটালেন।

ডাকসাইটে এই দাদুর এরকম মৃত্যুতে একটু মুহ্যমান হলেও শূর্পনখা ভেঙে পড়ল না, বা তার আকাঙ্খা থেকে সরে এল না। আমাদের বাই বাই করে দিল্লী না পুনা কোথায় যেন ফ্যাশন ডিজাইন পড়তে চলে গেল সে। আমাদের সঙ্গে প্রথম প্রথম একটু আধটু চিঠি চালাচালি হত, তারপর তাও কমে যেতে যেতে একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

আমি গোবরডাঙা কলেজে বি কম পড়তে ভর্তি হলাম। আমার সঙ্গে শত্রুঘ্ন, বিদুর আর মাদ্রীও। চেষ্টাচরিত্র করে সিটি কলেজে কেমিষ্ট্রিতে অর্নাস পেয়ে গেল অশু। আর কীচক কাকুর কাছে টিউশানি চালিয়ে যেতে লাগল। কীচক কাকু সুনামির ওপর গবেষণা বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেন নি। এখন তিনি পাকা জামের রসের সঙ্গে চা, মোচা আর করমচার নির্যাস মিশিয়ে একটা তরল আবিষ্কার করেছেন, গামছা

দিয়ে ছেঁকে নিলেই দারুণ হেয়ার ডাই। অশুর মেজোকাকা ধৃষ্টদ্যুম্নর মাথার কাঁচাপাকা চুলে এটা তিনবার লাগাতেই বেশ সুন্দর একটা বেগুনী রঙ ধরে গেল। ব্যাস, কীচক কাকুকে আর পায় কে। অশুকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়ে উনি জোর কদমে এই নিয়ে রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যা হল পাকা জাম বছরে দু' মাসের বেশি পাওয়া যায় না। তাই রথের মেলা পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি দশ লিটারের এক জেরিকেন ভর্তি জামের রস বাজারের ভগদত্তর বরফকলে দিয়ে এসেছেন ঠান্ডায় জমিয়ে রাখার জন্যে। এর আগে একবার তালমিছরির সমস্ত গুণসমৃদ্ধ একটা খেজুরি লজেন্স বানিয়েছিলেন, যাতে নলেন গুড়ের স্বাদ আর গন্ধ। কিন্তু দুলালের তালমিছরি, আসল দুলালের তালমিছরি, আদি দুলালের তালমিছরি- বাজার ছেয়ে যাওয়া এই সব যাবতীয় তালমিছরি দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কোন দুলাল আদি দুলাল কে জানে। ওর তালমিছরি ফ্রিতে লোকে গপগপ করে খেলেও পয়সা দিয়ে কেউ কিনতে চাইছিল

না। এখন হেয়ার ডাইয়ের জন্যে গোদরেজ কোম্পানিকে ফাইট দিতে গিয়ে দেখলেন এটার মালিকও বলছেন উনিই আদি গোদরেজ। গোলমেলে ব্যাপার।

দেড় বছর বাদে শূর্পনখার সঙ্গে আবার দেখা হল। এর মধ্যে ও এখানে আসেনি। ওর মায়ের মাঝে কিছুদিন শরীর খারাপ ছিল। চিতুকাকু কাকিমাকে নিয়ে গোয়ালিয়রে গেছিলেন। শূর্পনখা তাই কলেজ থেকে ছুটি পেলে মামার বাড়িতেই যেত এখানে আসার বদলে। এবার ফিরতেই আমরা সবাই ওকে ঘিরে ধরলাম।

শহরে থেকে শূর্পনখার জেল্লা বেড়েছে। নাসিকের কাছাকাছি থাকে বলেই বোধ হয় নাসিকার গড়নটা এখন আর অত খারাপ কিছু লাগল না। চামড়ায় একটা চাকচিক্য এসেছে, চোখদুটো কেমন মায়াবী দেখাল। আর পোশাক আমাদের কলোনির মেয়েদের মত না একেবারেই। স্কার্ট বা সালোয়ার কামিজই, কিন্তু কেমন অন্যরকম। বেশ সুন্দর মানিয়েছে।

আমি বললাম, কি রে, কেমন চলছে তোর ফ্যাশন ডিজাইন? শূর্পনখা বলল, ভালোই। তোদের খবর বল। বভ্রুবাহন কি করছে রে? পড়াশুনা করছে এখনও না কি বাবার সঙ্গে দোকানে বসে গেল? অশু নাকি কি একটা কসমেটিক বানিয়েছে শুনলাম।

বললাম, হ্যাঁ, হেয়ার ডাই। জানিস, সেই হেয়ার ডাই লাগিয়ে অশুর কাকার পাকা চুল এখন দিব্যি ভেলভেটের কার্পেটের মত বেগুনী দ্যাখাচ্ছে। চেনাই যায় না প্রায়। চিতুকাকু তো ওকে মাঝরাতে রাস্তায় ধরে পেটাতে গিয়েছিল চিনতে না পেরে। ও যত বলে, চিতুদা আমি ধেষ্টা, চিতুকাকু তত রেগে বলে, ব্যাটা চোর, আমি তোর ধ্যাষ্টামো বের করছি দাঁড়া। ভাগ্য ভাল সেই সময় দোকান বন্ধ করে জটায়ু দরজি ফিরছিল। সেই ওকে মারের হাত থেকে বাঁচায়।

শুনে শূর্পনখার সে কি হাসি। ওর হাসিটাও আগের থেকে অনেক সুন্দর হয়েছে। বলল, বাবার সেই পাহারা দেওয়ার বাতিক আর গেল না। আমাদের সেই

পেঁপেগাছ কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, কিন্তু বাবার কাঁধ থেকে পাহারা ভূত আর নামল না। সবাই বলে, বাবার মাথায় ছিট।

আমি বললাম, হ্যাঁ। এবার তুই সে ছিট দিয়ে ফ্যাশনওলা ড্রেস বানা। কী শিখলি দেখি।

বানাবো, বানাবো। দেখবি। দাঁড়া, আগে ডিগ্রিটা করে নিই, বলল শূর্পনখা।

ডিগ্রি হয়ে গেল আমাদের সবারই, যারা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। শত্রুঘ্ন বি এড পড়বে বলে ঠিক করেই রেখেছে। বিদুর বলল ব্যবসা করবে। মাদ্রীর বাবা মা মেয়ের জন্যে পাত্র দেখা শুরু করেছেন । অশু কল্যানী ইউনিভার্সিটিতে এম এস সি করবে বলে ভর্তি হয়ে গেল। আমিই কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। একবার ভাবলাম এম কম ট্রাই করি, একবার ভাবলাম ও হবে না, বি এডটাই দেখি।

কিন্তু কোনটাই করা হল না। দুটোরই লাস্ট ডেট চলে গেল। আমি বাড়িতে বসে থাকলাম আর দু চারটে বাচ্চাকাচ্চা টিউশানি করতে লাগলাম। এই করতে করতে তিন চার বছর চলে গেল। শত্রুঘ্ন কুচবিহার দিনহাটার কাছে একটা জুনিয়ার হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে চলে গেল। বিদুর পাটের ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান খেয়ে এখন একটা মিষ্টির দোকান খুলেছে, জিলিপি আর সিঙাড়া খুব ভাল বানায়। ওর মামার কাছে শেখা। অশ্বত্থামা কীচক কাকুর কাছে শেখা গবেষণা কাজে লাগিয়ে কল্যানী ইউনিভার্সিটিতে বেশ দাপটের সঙ্গে রিসার্চ করছে। ওর বানানো একটা ফার্টিলাইজার কাম প্ল্যান্ট হরমোন স্প্রে করে লাউয়ের মত মোটা মোটা মুলো হচ্ছে নাকি মুলোগাছে। অশুর এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ।

এই সময় একটা বাজে খবর পেয়ে আমাকে একরকম দৌড়েই বোম্বে যেতে হল। এর আগে কলকাতার বাইরে কোন শহরে যাইনি। অশু ওর প্রফেসরের সঙ্গে রিসার্চের লেকচার দিতে বোম্বে দিল্লী ব্যাঙ্গালোর যায় নাকি মাঝে মাঝে। ওকে সঙ্গে পেলে ভাল হত। কিন্তু এখন দরকারের সময় ওর কোন খবর পেলাম না। তাই আমাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হল। শূর্পনখা বোম্বের এক হাসপাতালে ভর্তি।

চিতুকাকু খবর পেয়ে আগেই গেছেন, সেখানে। কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ, আর একজন কেউ থাকলে ভাল হয়। চিতুকাকু ওর বাড়িতে খবর যখন পাঠালেন, তখন আমি ওদের বাড়িতেই। কাকিমা কদিন ধরে খুব কাঁদছেন। কিন্তু ওঁরও শরীর খুব খারাপ, এতটা রাস্তা যাতায়াতের ধকল সইবে না।

আমি সব শুনে বললাম, কাকিমা, আমি যাই?

কাকিমা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। ফলে পরের দিনই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে আমি বোম্বে চলে এলাম। চিতুকাকু ষ্টেশনে ছিলেন, আমাকে নিয়ে গেলেন হসপিট্যালে।

শূর্পনখাকে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! শুকিয়ে গেছে একদম। চোখগুলো ঢুকে গেছে কোটরে। গায়ের চামড়া খসখসে জীর্ণ। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল ওর। আমার মা আমার সঙ্গে নারকেলের নাড়ু আর পাটালিগুড় দিয়ে দিয়েছিল ট্রেনে খাওয়ার জন্যে। আমি সেগুলো আস্তে আস্তে ওকে খাইয়ে

দিলাম। মনে হল এগুলো খেয়ে ওর বেশ একটু ভাল লাগল। চিতুকাকু ওষুধ আনতে যাওয়ার সময় ওর সঙ্গে অনেক দরকারি কথা হয়ে গেল আমার।

ফ্যাশন ডিজাইন জিনিসটা বেশ ঘোরালো। অনেকটাই কপালের ব্যাপার। কলেজে যা সব শেখানো হয়, কাজের জিনিস সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু ওই দিয়ে কেউ সাকসেসফুল হতে পারবে না। কিছু একটা ইউনিকনেস চাই। একটা সিগনেচার, একটা স্টেটমেন্ট চাই ডিজাইনের মধ্যে, সেটা যাই হোক। আর কানেকশন চাই, ইনফ্লুয়েনশিয়াল কেউ রেকমেন্ড না করলে কাজ পাওয়া যাবে না, নাম তো দূরের কথা। আর চট করে শুরুতেই নাম না হলে জন্মেও হবে না। তখন একজন ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে একটা বাজারের দরজির কোন পার্থক্য নেই, বরং দরজিদের একটা চালু ব্যবসা আছে, খেয়েপরে বেঁচে থাকা সম্ভব।

শূর্পনখা ভাল রেজাল্ট করেছে ওর ডিগ্রিতে। তারপর মডেল বা সিনেমার হিরোইনদের মত লাক ট্রাই করতে চলে এসেছে স্বপ্ননগরী বোম্বেতে। গত দু বছর এদিক ওদিক ধরে কিচ্ছু করতে পারে নি। ওর ডিজাইন দেখে সবাই আশা জাগায়, কিন্তু আসল কাজ দেয় না কেউ। এ গল্প নতুন কিছু নয়। মফস্বল থেকে আসা সব মেয়েরা, যারা মডেল কি নায়িকা হতে চায়, তাদের সবার একই কাহিনী।

শুনে আমার চোখে জল এসে গেল। বললাম, চল, ফিরে যাই চিত্রকূটে। কিছু একটা হয়ে যাবে দেখিস। ও বলল, কখনই না। মরি তো মরব, এখানে।

চিত্রকূটের গল্পের ঝুড়ি নিয়ে বসলাম আমরা আবার। অশু এখন মুলো স্পেশ্যালিষ্ট। ইংল্যান্ডের প্রিন্সের বিয়ের রিসেপশনে স্যালাড মেনু করার জন্যে ওর প্রফেসর মুলো পাঠাতে চেয়েছিলেন। চার কেজি ওজনের এক একটা সেই মুলো দেখতে দূর দূর থেকে লোক এসে তুমুল হট্টগোল পাকায়। এই হট্টমুলো ব্যাকিংহ্যাম প্যালেসে যেতে পারল না বটে, কিন্তু বাঁকুড়ার একটা কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেল। অশু অবশ্য জানে না ওর ঐ ম্যাজিক ফার্টিলাইজার দিয়ে কেন শুধু মুলোই বড় হয়, গাজর বা শালগম নয় কেন, কেন নয় এমনি গম বা ধান। বিদুরের প্রসঙ্গ উঠল। ওকে আমরা স্কুলে খুব ইঁদুর বলে খ্যাপাতাম। যা রেগে যেত!

বললাম, বিদুর এখন মন দিয়ে জিলিপি আর সিঙাড়া বানাচ্ছে। ওর ফুলকপির সিঙাড়া খেলে মুখে লেগে থাকে তার স্বাদ পুরো চব্বিশ ঘন্টা। যতক্ষণ না নেক্সট দাঁত মাজা হচ্ছে, মুখের মধ্যে ঐ সিঙাড়ার মজলিশ চলতে থাকে।

চিতুকাকু এলেন ওষুধ নিয়ে। ওর হাতে দেখলাম স্লিপে লেখা নাম লিপি সরখল। শূর্পনখাকে বললাম, কী ব্যাপার, তুই লিপি হয়ে গেছিস নাকি আবার?

শূর্পনখা বলল, হ্যাঁ। এখানে অনেক কিছু ট্রাই করতে হয়, বুঝলি? কোন সেলেব্রিটির নাম দেখবি বেশিদিন এক বানান থাকে না। সবাই কিছু না কিছু পাল্টাচ্ছে, কিছু না পারলে নামটাই। আমিও তাই-

বুঝলাম কী ভীষণ ডেসপারেট হয়ে গেছে মেয়েটা। অবশ্য যস্মিন দেশে যদাচার।

পুরনো বন্ধুকে পেয়ে গল্পগুজব করে, আর আমাদের আদরযত্নে শূর্পনখার শরীরের বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি হতে লাগল। খাওয়া দাওয়া করত না এতদিন ভাল করে। এখন দুবেলা আমরা জোর করে ওকে খাওয়াই। চিতুকাকুর তালগাছের মত চেহারা দেখে সবাই ওকে চিনে গেছে এই হাসপাতালে। যে নার্সরা এই ফ্লোরে রোগীদের দেখাশোনা করেন, শূর্পনখা তাঁদের জন্যে একটা নতুন ডিজাইনের গাউন বানিয়ে দিয়েছে, সেটা দেখে সবাই খুব খুশি। ওঁরা ওকে বেশ খাতির করছেন এখন। দু একদিন পরেই ওকে ছেড়ে দেবে। আমরা অনেক বলে কয়ে ওকে রাজি করালাম যে, ওকে অন্তত এক মাসের জন্যে চিত্রকূটে গিয়ে থাকতেই হবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার ঠিক আগে এমন একটা কান্ড ঘটল, যে আমাদের গোটা জীবনটাই পালটে গেল তার জন্যে। পয়সাকড়ি মিটিয়ে আমরা রেডি, ব্যাগ প্যাক করা হয়ে গেছে, আমরা এখান থেকে সোজা ষ্টেশনে যাব। ট্রেন ধরে সোজা হাওড়া। চিতুকাকু একটা ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। আমি শূর্পনখার ব্যাগ নিয়ে ওর সঙ্গে বেরোচ্ছি, হঠাৎ একজন নার্স পেছন থেকে ডাকলেন, লিপিজি, লিপিজি-

আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, ওনার হাতে একটা ঠোঙায় একটু তালগুড় টাইপের মিষ্টি। বললেন, কোন ঠাকুরের প্রসাদ। আমি ওর হাত থেকে ঠোঙাটা নিলাম, মাথায় ঠেকালাম। ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসব, দেখি শূর্পনখার চোখ অনেক দূরে আকাশের দিকে। আমি দু একবার ডাকলাম, যেন শুনতেই পেল না। এই রে, কী হল আবার! ওকে ধরে একটু নাড়া দিতেই আমাকে বলল, একটা দারুণ আইডিয়া পেয়ে গেলাম রে সুগ্রীব। তুই বলছিলি না, বিদুর এখন জিলিপি বানায়?

হ্যাঁ, বানায় তো। খুব ভাল বানায়। তবে জিলিপির চেয়েও সিঙাড়াটা বেশি টেস্টি। কেন হঠাৎ জিলিপির কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? খাবি? চল খাওয়াচ্ছি।

না রে, খাবো না। দেখব। এই মাদ্রীটা এখন কী করছে রে? কেমন দেখতে হয়েছে ওকে?

বিদুর, জিলিপি, মাদ্রী, কেমন দেখতে, কী ব্যাপার একটু খোলসা করে বলতো? কী হল তোর?

বলছি, শোন। ওই যে মেয়েটা ডাকল না, লিপিজি, লিপিজি - । এ রকম রিপিট করল বলেই আমি শুনলাম, জিলিপি। তুই বারবার লিপিজি বল, দেখবি জিলিপি শুনবি। সেই মরা মরা থেকে রাম রাম- এর মত।

হ্যাঁ, কিন্তু তার সঙ্গে মাদ্রীর কী সম্পর্ক?

আছে রে বাবা। আমি আইডিয়া পেয়ে গেছি। তোকে বলছিলাম না, আমাদের এই লাইনে একটা ইউনিকনেস থাকতে হয়। একটা সিগনেচার স্টাইল স্টেটমেন্ট। এতদিন সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এই মাত্র পেলাম। জিলিপি, ইয়েস, জিলিপি। জিলিপি ইজ গোয়িং টু বি মাই স্টাইল স্টেটমেন্ট।

প্রথমে ট্যাক্সি, পরে ট্রেনে উঠে আমি হাঁ করে ওর আইডিয়া শুনতে লাগলাম। কাঁথার ডিজাইন যদি শিল্প হতে পারে একটা সর্বভারতীয় আবেদন নিয়ে জিলিপি

কেন নয়? ও এখন নতুন ডিজাইন বানাবে, যার মেইন থিম হচ্ছে জিলিপি। শিখদের মাথায় পাগড়িতে যেমন থাকে জিলিপির প্যাঁচ, এখন থেকে ওর বানানো ড্রেসে থাকবে, সেই রকমের প্যাঁচ। বোতাম, কানের দুল, গলার হারের লকেট সব হবে জিলিপির মত। ইন ফ্যাক্ট শাড়ি পরানো হবে শরীরে যেন জিলিপির মত করে প্যাঁচানো। ব্যাস, আর পায় কে!

আমি বললাম, কিন্তু মাদ্রী-

শূর্পনখা বলল, দ্যাখ, জিলিপি আমাদের মফস্বলের গন্ধ বয়ে আনে। তাই মফস্বলের নতুন মডেল চাই। আমি মাদ্রীকে মডেল বানাবো। ও বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হয়ে যায় নি তো?

আমি বললাম, না কিন্তু খুব শিগগির হয়ে যাবে। ওর বাবা মা খেপে উঠেছে ওর বিয়ে দেওয়ার জন্যে। এত তাড়াতাড়ি যে বিয়ে দেওয়ার কী দরকার, কে জানে? তুই মাদ্রীকে মডেল বানাবি ভাবছিস, কিন্তু শূর্পনখা-

উঁহু, লিপি। শূর্পনখা নই আর, লিপি।

তারপর সময় খুব দ্রুত চলতে লাগল। চিত্রকূট এসেই লিপি চলে গেল বিদুরের দোকানে। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মন দিয়ে দেখল জিলিপি বানানো। নিজে নিজে বানালো জিলিপি, যতক্ষণ না বিদুরের মত পারফেক্ট হয়। তারপর বিদুর দেখল আরো নতুন নতুন প্যাঁচ উঠে আসছে লিপির বানানো জিলিপিতে। যেন চাইনিজ অ্যালফাবেট। কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে এল কত রকমের ফ্যাব্রিক। জটায়ুর দোকানে বসে ছাঁটাকাট করে তৈরি হল নতুন পোশাক। হ্যাঁ, মাদ্রীর শরীরের মাপেই। ওর বাবা মা-কে অলরেডি পটিয়ে ফেলেছে টিভিতে কিসব প্রোগ্রাম দেখিয়ে। আর মাদ্রীও নতুন একটা সম্ভাবনা দেখে লেগে পড়েছে সৌন্দর্য বর্ধনে। বিয়ের সম্বন্ধ এখন শিকেয়।

কলকাতায় ওর প্রথম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের চারদিন আগে চিতুকাকু আমাকে ওদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি মাদ্রী একটা নতুন ড্রেস পরে পোজ দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে, যেন চেনাই যায় না। লিপি বলল, দুটো ভাল খবর আছে, এখুনি শুনলাম। আমাদের অশু জাপান যাচ্ছে পোস্ট-ডক করতে, ওখানে নাকি ও একটা খুব ভালো স্কলারশিপ পেয়েছে। কী নিয়ে কাজ করবে জানিস?

আমি তো এটাও জানতাম না। বললাম, সেই মুলো?

লিপি শুনে হেসে বলল, মুলো না রে ব্যাটা হুলো। জাপানে জানিস তো ভূমিকম্পে ওদের নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টার ফেটে গিয়ে রেডিও অ্যাক্টিভ সব আইসোটোপ জলে আর বাতাসে মিশে ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। চিটেগুড়ের এক ফাঙ্গাস, যা নাকি রেডিয়েশন কন্টেন করতে পারে, সেই নিয়ে এই রিসার্চ। ভাবা যায়, আমাদের সেই অশ্বত্থামা হত ইতি গজ-

আমি বললাম, কিন্তু মুলো থেকে একেবারে চিটেগুড়ের ফাঙ্গাস, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।

লিপি বলল, আইডিয়াটা তো অশুর এখনকার প্রফেসরের না। এমনকি অশুরও না।

তাহলে কার? আমি প্রশ্ন করি।

বুঝলি না? আরে, আমাদের কীচক কাকু রে। ওরই আইডিয়া এটা। আগে ভাবা হয়েছিল আরশোলা যেহেতু নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনে ঝাড়ে বংশে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না, ও থেকেই কিছু করা সম্ভব। কিন্তু আমেরিকা ইউরোপে এ নিয়ে রিসার্চ করে ওরা দেখেছে এটা পুরো গুজব। এটা জেনেই কীচক কাকু অ্যালগি আর ফাঙ্গাস নিয়ে লেগে পড়েন। চিটেগুড়ের ফাঙ্গাস বানানো তো সোজা। ফেলে রাখলেই হল।

আমি এতশত বুঝি না। বললাম, আর সেকেন্ড গুড নিউজটা কী?

বলছি। জিজ্ঞেস করলি না তো, কীচক কাকু আইডিয়াটা নিজে পারসু না করে অশুকে কেন দিয়ে দিলেন? আরে অশু ওকে একটা দারুণ হেল্প করেছে রে। কীচক কাকুর সেই হেয়ার ডাই, মনে আছে? ওটা মাথায় দিয়ে চুল বেগুনী হত ঠিকই কিন্তু ঝপাঝপ চুল পড়ে যেত। ভেবে দ্যাখ, ঐ ডাই লাগিয়ে অশুর কাকার পাকা চুল কালার হল, আর মাস যেতে না যেতেই শুনলাম মাথায় পুরো চাঁদ। একেবারে ফুল মুন, বুদ্ধুপূর্ণিমা!

তাহলে? অশু কী হেল্প করল? আমি প্রশ্ন করলাম।

অশু সুযোগ পেলেই এই প্রব্লেমটা ডিসকাস করত বিদেশী সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে। যে ওর একটা কমার্শিয়াল ইনভেনশন আছে।, কিন্তু সেটা একটা প্রাকটিক্যাল প্রব্লেমের জন্যে প্রোডাক্ট হিসাবে চালু করা যাচ্ছে না। অনেকে বলেছিল হেয়ার রিমুভার হিসাবে এটা ট্রাই করার কথা, কিন্তু মেয়েরা থোড়ি পায়ে কি বগলে বেগুনী কালারের হেয়ার রিমুভার লাগাবে! সুতরাং এটা দিয়ে কিছু হচ্ছিল না। এই তিনমাস আগে, অশু হঠাৎ নিউজিল্যান্ডের এক, বিজ্ঞানীর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পায়। ভদ্রলোক লেকচার দিতে কলকাতার বোস ইন্সটিটিউটে এসেছিলেন। ওঁর নিজের ক্যাটল ফার্ম আছে। গরু ভেড়া চরে সেখানে। দুধ, মাংস, উলের ব্যবসা। উনি বললেন, হোয়াট অ্যাবাউট ডায়িং উল? ক্যান ইয়োর ফর্মুলেশন ডাই উল?

অশুর কাছ থেকে স্যামপল নিয়ে টেষ্ট করে উনি দেখেছেন যে এটা উল ডাই করে তাই নয়, ভেড়ার গায়ে স্প্রে করে দিলে গায়েই ডাই করে যায়, আর এমনি এমনি ঝরেও যায় ভেড়ার গা থেকে। লোম কাটতে হয় না। টু- ইন- ওয়ান অ্যাকশন। সঙ্গে সঙ্গে পেটেন্ট, রয়্যালটি, অনেক কিছু। কীচক কাকু তাই এখন রীতিমত বড়লোক। বিনিময়ে উনি এই আইডিয়াটা অশুকে ধার দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরদাদুর বাৎসরিক, তাই বাড়িতে কিছু অনুষ্ঠানাদি ছিল। আমার মনে পড়ে গেল, একবার ছাব্বিশে জানুয়ারি না পনেরোই আগস্ট উনি পতাকা উত্তোলন করে বলেছিলেন, আমি যখন এখানে প্রথম বাড়ি বানাই, এই এলাকা ছিল পান্ডববর্জিত। কিন্তু আমি জানি, এই চিত্রকূটে অনেক পান্ডবের জন্ম হবে। তারা সব মানুষের মত মানুষ হবে, চিত্রকূটের নাম উজ্জ্বল করবে। উনি আজ নেই। কিন্তু ওঁর কথা ঠিক ফলতে চলেছে।

আমি লিপিকে বললাম, তোর একজিবিশন তো চলে এল। তুই বলেছিলি না, তোদের প্রফেশনে একটা ইউনিক সিগনেচার চাই। সামথিং ডিফারেন্ট। আমার মনে হল, সিমপ্লি শূর্পনখা থেকে লিপিতে বদলে তোর সেই ইউনিক সিগনেচারটা আসছে না। আমি তোর নামের একটা ডিজাইন বানালাম তাই।

তুই? তাই নাকি? কী বল, বল। লিপি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়।

দ্যাখ লিপি কথাটার মানে তো অ্যালফাবেট। বাংলায় অষ্টম স্বরবর্ণটা কী, মনে আছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ, থাকবে না কেন? লিপি বলল, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ লি-

আমি বললাম, ঐ লি টা কিন্তু ল- এ হ্রস্ব- ই লি নয়। ওটা হল বাংলা নয়- য়ের মত দেখতে কাঠবেড়ালির ল্যাজের মত ৯। বাংলা বর্ণমালা থেকে ৯ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে, তার কোন ব্যবহার নেই আর। তুই সেই হারানো ৯ কে ফেরত নিয়ে আয়। তোর নাম সাইন করবি ৯P, বাংলা ৯, আর ইংররিজি পি, বুঝলি?

একেবারে ইউনিক। হুঁ হুঁ বাবা, চিতুকাকুর ছাত্র, আমার একটা ক্রিয়েটিভ আইডিয়া আসবে না?

বাঃ, তুখোড় নামালি তো! ঠিক আছে, আমি এখনি এটার একটা ফর্ম বানিয়ে নিচ্ছি। আজ থেকে আমি ৯P বলেই সাইন করব, আর ডিজাইনেও কাজে লাগাবো, লিপি বলল।

টিভিতে ঘটা করে আমরা আমাদের চিত্রকূটের বিজয়গাথা শুনি এখন। আমাদের শূর্পনখা সরখেল তার জিলিপি ডিজাইনের জন্যে জাতীয় পুরস্কার পেল। বিজ্ঞানী কীচক চক্রবর্তীর পরবর্তী প্রোজেক্ট পালং শাক থেকে ক্লোরোফিল এক্সট্রাক্ট করে সেটা দিয়ে পেন্ট বানানো, যা দিয়ে বাড়িঘর রঙ করলে তারা ফটোসিন্থেসিস করতে পারবে। বাতাস থেকে কার্বন- ডাই- অক্সাইড গ্যাস টেনে নেবে বলে এতে গ্রিনহাউস গ্যাস কার্ব হবে, ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমে যাবে বলে তার ধারণা। কীচক কাকুকেও আমি একটা সিগনেচার বানিয়ে দিয়েছি ' কি' মানে চাবি আর চক- এর ছবি দিয়ে। চক দিয়ে অঙ্ক কষো, চাবি দিয়ে তালা খোল, এই তো বিজ্ঞান। অশ্বত্থামাকেও একটা দৌড়ে যাওয়া ঘোড়ার ছবি এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই অশ্বকে কে থামাবে?

আমি সুগ্রীব সরকার বি কম পাশ করলেও কমার্সটা মোটামুটি ভুলে মেরে দিয়েছি। এখন এই সব টুকটাক কাজ করে বেড়াই এর ওর হয়ে। আর লিখে বেড়াই তাদের কীর্তি। মোটামুটি খারাপ চলে না। বিদুরের মিষ্টির দোকান এখন অনেক বড় হয়েছে। কলকাতার অনেক ক্যাটারার এখন ওর নিয়মিত ক্লায়েন্ট। শত্রুঘ্ন কুচবিহার থেকে নেমে এসেছে বর্ধমানে, একটা ভালো স্কুলে। মাঝে মাঝে আসে চিত্রকূটে। জটায়ু এখন আর লুংগি সেলাই করে না, রেডিমেড ড্রেস বানিয়ে বিক্রি করে। চিতুকাকুকে রাতে পাহারা দেওয়া থেকে নিরস্ত করা গেছে। বিখ্যাত ডিজাইনারের বাবা হিসাবে এখন অনেকেই চেনে তাঁকে।

মাদ্রীর হাতে এখন অনেক কাজ। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে ও কোন কাজ নেয় না। মডেলদের বিয়ে হয়ে গেলে কাজ পেতে অসুবিধে হয়, তাই ওর পক্ষে এখন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে অসুবিধে আছে।

আমরা চিত্রকূটের ছেলেমেয়ে। আমি জানি, এ নিয়ে আমার কোন চিন্তার কারণ নেই।

ছবিঃ সৌভিক

গত সংখ্যার পর

মুন্নারের এক অন্যতম আকর্ষণ এখানকার টি মিউজিয়াম। আগে এখানকার চা বাগানের পঁচানব্বই শতাংশের মালিক ছিল টাটারা। কোম্পানির নাম হল কানন দেবন হিলস প্ল্যানিং কোং। ২০০৫-এ টাটারা প্ল্যান্টেশানের ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসে। সংস্থার পূর্ণ মালিকানা দিয়ে দেয়া হয় শ্রমিকদের হাতে। আজও এই কে এইচ ডি পি কোম্পানি আটান্ন হাজার একর চা বাগানের মালিক। এখানে অন্যান্য ছোটবড় কিছু কোম্পানি মিলে দু হাজার একরের মতন চা বাগান চালায়।

টি মিউজিয়ামে চায়ের বাগান , চায়ের পাতা তোলা এবং চা তৈরি সম্বন্ধে খুব সুন্দর সব তথ্য পাওয়া গেল। চা গাছ প্রায় একশো বছর বাঁচে। কিন্তু লাগাতার ছেঁটে এ গাছকে কখনও পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের ওপর বাড়তে দেয়া হয়না। চা শ্রমিকেরা দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি করে উঠিয়ে ঝুড়ি ভরে ফেলে। তারপর সেই পাতা কারখানায় প্রক্রিয়াকরণ করে, হোয়াইট টি, গ্রিন টি, গ্র্যান্যুলস্, ডাস্ট, এইসব বিভিন্ন গুণমানের চায়ে পরিণত করা হয়। আজকাল তো গ্রিন টি কে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক অ্যান্টিক্সিডেন্টের এক বড় উৎস হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়।

বিকেলে বাজার ঘুরে মশলাপাতি, চায়ের প্যাকেট, চন্দনকাঠ এইসব কেনাকাটা হল। রাত কাটালাম কেরালা পর্যটন বিভাগের হোটেল টি কাউন্টি-তে ।

২২/১১/২০১০

আজ সকাল দশটায় রওনা দিয়ে টপ স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় মেদিপুত্তি বাঁধ দেখা গেল। সেখানে নৌকাবিহারের আকর্ষণে অনেক পর্যটক থেমেছিলেন। স্থানীয় লোকেরা আনারস, ভুট্টা, স্থানীয় কমলালেবু, প্যাশন ফ্রুট ডাব এইসবের পসরা সাজিয়ে বেশ ভালোই বিক্রিবাট্টা করছিলেন।

টপ স্টেশন, কেরালা আর তামিলনাড়ুর সীমানায়। এই রাস্তাতেই আরও চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কোদাইকানাল শহর। কিন্তু, আন্নামালাই জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই পথকে তামিলনাড়ু সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য। টপ স্টেশনে একটি রোপওয়ে টার্মিনাল ছিল, যার মাধ্যমে নিচের চা বাগান থেকে চা পাতা ওপরে নিয়ে আসা হত। রাস্তাঘাট তৈরি হয়ে যাবার পর এই রোপওয়ে বন্ধ হয়ে যায়। টপ স্টেশন থেকে নিচের তামিলনাড়ুর বন ও উপত্যকার প্রায় তিন শো ডিগ্রির ভিউ পাওয়া যায়।

রাতে টি কাউন্টি হোটেলে ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমোনো হল। এ হোটেলে ঘরভাড়ার সঙ্গে রাত ও সকালের খাওয়ার খরচ ধরে নেয়া থাকে। ফলে একটু ব্যয়বহুল(৪৫০০) হলেও সমস্যা হয় না।

মুন্নার পৌঁছোতে হলে কোচিন , তিরুবনন্তপুরম বা মাদুরাই থেকে সড়কপথে যেতে পারবে। তবে কোচিন থেকে চার ঘন্টার পথ পেরিয়ে পৌঁছনোই সবচেয়ে সহজ। থাকার

জন্য সব রকমের হোটেল আছে। রিজার্ভেশন আগে থেকে করে রাখলে ভালো। ইন্টারনেট থেকে এখানকার নানান হোটেলের খবর পেয়ে যাবে।

২৩/১১/২০১০

মুন্নারের তিন দিবসীয় সফর শেষ করে পেরিয়ারের পথে রওয়ানা হলাম। চার ঘন্টার রাস্তা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে এক মনোহারী পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়া। মুন্নার

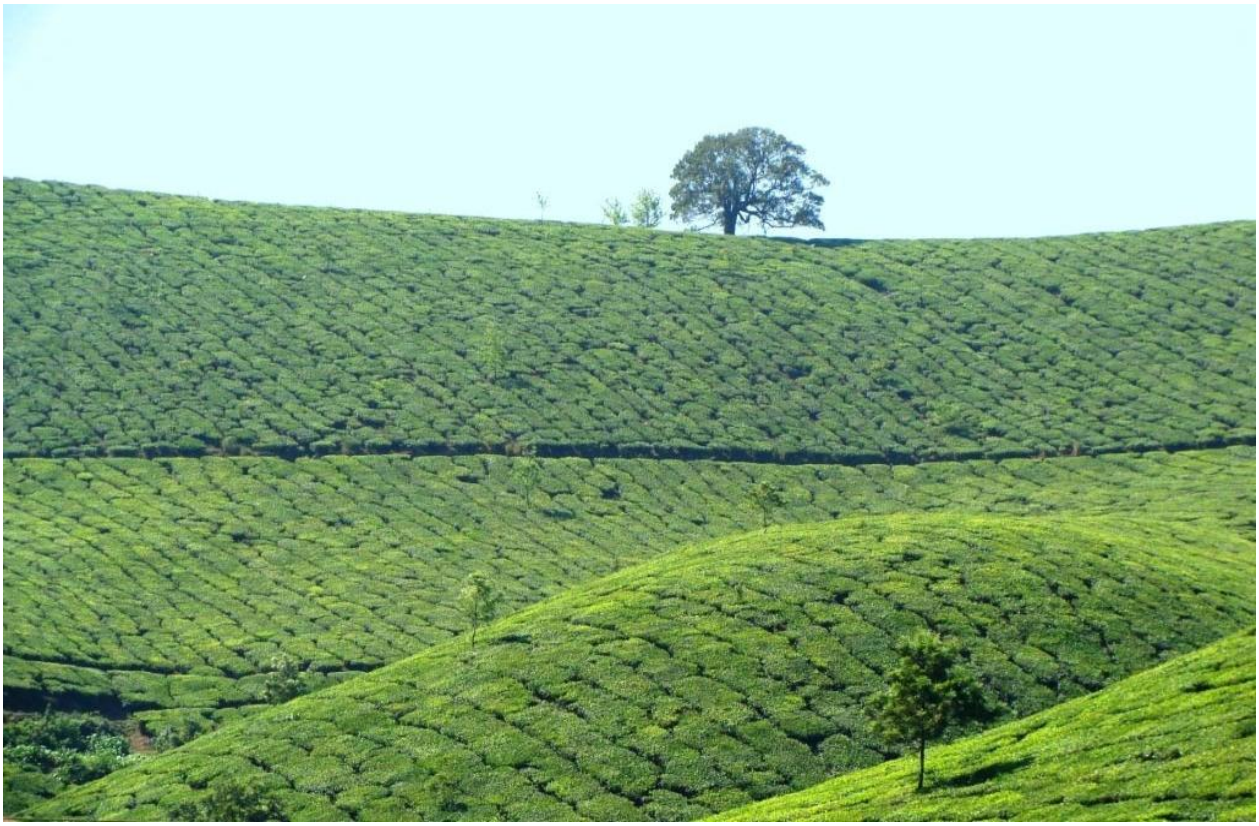

থেকে পেরিয়ারের পথ মাত্র একশো দশ কিলোমিটার, কিন্তু পুরো পথটাই পাহাড়ি হওয়ায় সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগলো। তবে পথের দুপাশে বন, চা বাগান, মশলার বাগান দেখতে দেখতে সময় খুব ভালো কাটে।

দুপুরে পেরিয়ার পৌঁছে টাইগার বাংলো নামে বনবিভাগের রেস্ট হাউসে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিলো। দুপুরের খাওয়া সেরে প্রথমে গারী নামের একটা ইকো পর্যাটনকেন্দ্র দেখতে বেরোলাম। থেকাডি থেকে সড়কপথে দুঘন্টা লাগে। গারীতে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। তার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে একটা জলাধার। পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের লাগোয়া এই এলাকা বন্যপ্রাণীর দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে, পর্যটকদের জন্য কেরালা বনবিকাশ নিগম অনেক রকমের প্যাকেজ বানিয়েছে। তার মধ্যে তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল স্টে প্যাকেজ আর ডে প্যাকেজ। ডে প্যাকেজে পর্যটক সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে গারী পৌঁছে যাবেন। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে যাবেন জঙ্গল ট্রেকিং-এ। সেখানে অভিজ্ঞ গাইডরা মজুত থাকবেন তাঁদের বন, বন্যপ্রাণী, মশলার চাষ এইসবের সম্বন্ধে

সবকিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য। বন্যপ্রাণীর দেখাও মিলে যেতে পারে। দুপুরে ফিরে এসে লাঞ্চ। তারপর নৌকাবিহার। অবশেষে বিকেলে চা ও স্ন্যাকস্ খেয়ে বিদায়। সব মিলিয়ে জনপ্রতি খরচ ন'শো টাকা। রাত্রে যাঁরা থাকতে চান তাঁদের জন্য স্টে প্যাকেজে গ্রিন কটেজে থাকবার ব্যবস্থা আছে। আছে সকালে ও সন্ধেয় জিপ সাফারিতে বন্যজীব দেখবার সুযোগ। আরও আছে শবরীমালা মন্দিরের ভিউপয়েন্ট। পরদিন সকাল আটটায় তাঁদের

থেকাডি

প্রোগ্রাম শেষ হবে।এই প্যাকেজে জনপ্রতি খরচ আঠেরোশো টাকা। জানা গেল, পেরিয়ার বেড়াতে আসা পর্যটকরা এখন একদিনের জন্য এখানে আসা শুরু করেছেন এবং এখন এই ইকো পর্যটন কেন্দ্রটির জনপ্রিয়তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সন্ধাবেলা গারী থেকে থেকাডি ফেরৎ এলাম। দশ কিলোমিটার রাস্তা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে। কয়েকটি জংলি জানোয়ারের দেখাও মিললো। থেকাডি হল পেরিয়ার ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রধান দফতর। এর সঙ্গে লাগোয়া কুমিলা শহর এবং থেকাডি মিলিয়ে অনেকগুলো হোটেল, গেস্ট হাউস আছে। পর্যটন বিভাগের অরণ্যনিবাস আর বনবিভাগের বনবাংলোও আছে। থেকাডির বন বর্ষাতেও খোলা থাকে পর্যটকদের জন্য, তবে বেশি বর্ষার জন্য জুন আর জুলাই মাস দুটো না আসাই ভালো। পেরিয়ারের একটা সুদীর্ঘকালের ইতিহাস আছে। তবে সে ইতিহাসের গল্প তোমাদের শোনাবো পরের সংখ্যায়।

ক্রমশ

(শিরোনাম ছবি: টপ স্টেশনে ভোর--মেঘের মুখোমুখি)

নেমে এসো

অরিন্দম দেবনাথ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিশোর/যুবক বাহিনী আছে। কোথাও এদের বলা হয় স্কাউট, কোথাও গাইড কোথাও বা ক্যাডেট। ডাকা হয় আরও অনেক নামে। মূল উদ্দেশ্য কিশোর- কিশোরী ও যুবক- যুবতীদের বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে তৈরি রাখা। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগের আমেরিকান বয় স্কাউটদের একটি রোমহর্ষক অভিযানের কথা শুনিয়েছেন অরিন্দম দেবনাথ।

" ব্রিস্টল টাওয়ার শুনতে পাচ্ছ? সেন্ট জেমস বলছি"- ওভার।

সেন্ট জেমস এয়ারস্ট্রিপের ছোট্ট কন্ট্রোল রুমের লাউডস্পিকারে গমগম করে উঠল, " ব্রিস্টল বলছি সেন্ট জেমস। বল তোমাদের জন্য কি করতে পারি?

"এনসি ৮৩০৬ কে বলো আজকে ব্রিস্টলে থেকে যেতে। আমাদের এখানে দ্রুত আলো কমে আসছে। ফ্লাইট এনসি ৮৩০৬ সেন্ট জেমসে এলে আমরা ওকে নামাতে পারব না। তোমরা জান সেন্ট জেমসে রাতে প্লেন নামানোর জন্য কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই। বুঝতে পেরেছ? ওভার।"

"বুঝতে পেরেছি সেন্ট জেমস। ইতিমধ্যে এনসি ৮৩০৬ ওড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমরা এখনি ওকে আবহাওয়ার কথা বলে সতর্ক করে দিচ্ছি এবং ওকে সেন্ট জেমসে উড়ে যেতে বারণ করে দিচ্ছি। ওভার।"

সেন্ট জেমসের কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা রকি হ্যারিস হাতের মাইক্রোফোনটা নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারের ওপর পুরো শরীরটা এলিয়ে দিল। সে যদি আর দশ মিনিট পরে ব্রিস্টলকে যোগাযোগ করত, তবেই হয়েছিল আর কি! এনসি ৮৩০৬ কে নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ত তার মালিক হেনরি মেরিস। স্থানীয় কৃষক হেনরি প্রতি সপ্তাহেই সূর্য উঠতে না উঠতে এনসি ৮৩০৬ কে নিয়ে অ্যাপালাচিয়ান পাহাড় শ্রেণী টপকে সপ্তাহে একদিন করে ব্রিস্টল যায় খুচখাচ কেনাকাটা আর ব্যবসার কিছু কাজকর্ম সারতে। আর সেদিনই সূর্যাস্তের অনেক আগেই ফিরে আসে সেন্ট জেমসে। হিসেব সবই ঠিকই ছিল। কিন্তু আজ ২৩ ডিসেম্বর আকাশ হালকা মেঘে ঢেকে যাওয়ায় অন্ধকার নেমে এসেছে দ্রুত। দীর্ঘদিন সেন্ট জেমস এয়ারস্ট্রিপের দায়িত্বে থাকা হেনরি জানে এই মেঘটা দ্রুত সূর্যকে এমন ভাবে ঢেকে দেবে যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। হাওয়া বইছে খুব জোরে। হেনরির ভাগ্য খুব ভাল যে, একদম শেষ মূহুর্তে থামিয়ে দেওয়া গেছে। না হলে যে কী হত একমাত্র ভগবানই জানেন!

রকি হ্যারিস কন্ট্রোল টাওয়ার বন্ধ করার তোড়জোড় শুরু করছে। এমন সময় কন্ট্রোল টাওয়ারের ঘুরন্ত সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। রকি জানে ওটা কে আসছে। তাই সে নিশ্চিন্তে হাঁক মারল, "টমি, চলে এস ওপরে।" প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই কন্ট্রোল টাওয়ারের দরজায় পুরোদস্তুর স্কাউটের পোশাক পরা টমি প্যাটরিন্স হাজির।

"এসো এসো স্কাউট। দু- মিনিট বোসো। আমি একটু হাতের কাজটা গুটিয়ে নি," হ্যারিস বলল। টমি দেওয়ালে ঝোলান আবহাওয়া দপ্তরের বার্তাটি দেখতে দেখতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, "হ্যারিস, মনে ত হচ্ছে এবার বড়দিনটা বরফের বড়দিন হবে! আবহাওয়া দপ্তর বলছে প্রবল তুষার পাতের সম্ভাবনা।"

স্মোকি মাউন্টের সেন্ট জেমস এয়ারস্ট্রিপ থেকে এ্যারোডায়নামিক মেরিট ব্যাজ পাওয়ার জন্য খুব খেটে রকি হেরিসের কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে টমি। কিন্তু রকির মন পাওয়া খুব কষ্টকর। যতক্ষণ না রকি নিশ্চিন্ত হচ্ছে ট্রেনিং পাওয়ার পর সমস্তরকম আপৎকালীন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য তৈরি হয়েছে একজন স্কাউট, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই মেরিট ব্যাজ পেতে দেবে না কাউকে। পাশাপাশি এটাও ঠিক, রকি হ্যারিস

একজন খুব ভাল শিক্ষক। তার শিক্ষা দেওয়াতে কোন ফাঁকি নেই। ট্রেনিং দিয়ে এক একজন স্কাউটকে একদম পাক্কা পেশাদার বানিয়ে দেয় সে। অনেকেই এই মেরিট ব্যাজ পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তবে টমি সবার আগে এগিয়ে আছে। হ্যারিস স্বীকার করে, এতদিন পর্যন্ত পাওয়া স্কাউটদের মধ্যে টমি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ছাত্র। সে একজন খুব ভাল আবহাওয়াবিদ। সে সবকিছু শিখতে চায়, জানতে চায়। টমির সব ভাল, একটা জিনিস ছাড়া। যখন খুব চাপ আসে, বিশেষত যখন পাইলটদের রেডিওতে আবহাওয়ার গতি, তাপমাত্রা নামা ওঠার নির্দেশ দিতে হয়, তখন ঘাবড়ে গিয়ে টমি তোতলাতে শুরু করে। আর টমি এটা ভাল করে জানে। নির্দেশে সামান্য ভুল মানে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। যেহেতু পাহাড় ঘেরা উপত্যকার মাঝে বিমান অবতরণক্ষেত্র, তাই কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে পাইলট তার কাজ শুরু করে দেয়। তখন রকি হ্যারিস টমির পাশে থাকলেও দুর্ঘটনা এড়াতে কিছু করতে পারবে না।

রকি হ্যারিস যখনই সময় পায় তখনই টমির এই ভুল করার " আতঙ্ক" থেকে মুক্ত করতে তার সঙ্গে নকল কন্ট্রোলরুম খেলা খেলে। হাতের কাজ শেষ করে হ্যারিস টমিকে বলল "চল বলা প্র্যাকটিস শুরু কর।" বলে মাইক্রোফোনটা টমির হাতে তুলে দিল।

"মনে কর তুমি শুনতে পাচ্ছ পাইলট ল্যান্ড করার অনুমতি চাইছে", বলে হ্যারিস মুখের সামনে দুটো হাত নিয়ে বলতে শুরু করল। "হ্যালো সেন্ট জেমস। এন জি জিরো জিরো অবতরণের অনুমতি চাইছে। ওভার।"

"ইয়ে..." টমি যথারীতি তোতলাতে শুরু করেছে।

"টমি, কী হচ্ছে? ঠিক করে বলতে শুরু কর। আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। ডিনার টাইম পার হয়ে গেছে। আমি অফিস বন্ধ করে চলে যাব।"

"আঃ... এন জি জিরো জিরো পারমিশান টু ল্যান্ড ইজ গ্র্যান্টেড ... ইররর ."

"আঃ, আবার? বলছি না আমার খিদে পেয়ে গেছে। ঠিক করে বল," হ্যারিস ধমকে উঠল।

"এন জি জিরো জিরো। কন্ট্রোল সেন্ট জেমস বলছি। নামার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বাতাস উত্তর- পূর্বে বইছে ঘন্টায় তিরিশ মাইল গতিতে।"

"দারুণ হচ্ছে টমি! বলে যাও।"

"দক্ষিণের দিক থেকে প্রধান রানওয়েতে নাম। রানওয়ে সাড়ে তিন হাজার ফুট লম্বা। ৪৫ ডিগ্রি ক্রস উইন্ড বইছে। বুঝতে পেরেছ কিনা। জানাও।"

“ভেরি গুড টমি, কিন্তু প্রত্যেক কথার শেষে ওভার বলবে। আর তোমার মাইক্রোফোনের সুইচটা নামিয়ে দেবে যাতে পাইলট উত্তর দিতে পারে,” হ্যারিস বলল।

টমি “ওভার” বলে মাইক্রোফোনের সুইচটা নিচে করতেই কন্ট্রোল টাওয়ারের লাউড স্পিকার গমগম করে উঠল, “সেন্ট জেমস টাওয়ার এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি এমারজেন্সি ল্যান্ডিং এর অনুমতি চাইছে।”

টমি হ্যারিসের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমাকে একটা একটা করে শেষ করতে দাও!”

হ্যারিস কন্ট্রোল টাওয়ারের কাঁচের জানলায় নাক লাগিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল এয়ার ফোর্স এর বিশাল বড় একটা সি ৫৪ প্লেন আকাশে চক্কর মারছে। এর তার ল্যান্ডিং লাইটগুলো জ্বলছে। টমিও সম্বিৎ ফিরে পেল, একটা আসল প্লেন!

“ কী করব হ্যারিস? এটা ত সত্যিকারের প্লেন!” টমি বলল।

“হ্যালো সেন্ট জেমস শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো সেন্ট জেমস কন্ট্রোল! কেউ আছ? শুনতে পাচ্ছ? এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি ফর “ চার্লি” , এমারজেন্সি ল্যান্ডিং করতে চাই। উত্তর দাও সেন্ট জেমস। কেউ আছ শুনতে পাচ্ছ?”

হ্যারিস ঝাঁপিয়ে পড়ল কন্ট্রোলে। মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে বলতে শুরু করল, “সেন্ট জেমস বলছি। এয়ার ফোর্স ২৪৫০সি ফর চার্লি সেন্ট জেমস বলছি। এখানে ল্যান্ডিং অসম্ভব। রাত্তিরে ল্যান্ডিং এর কোন সুবিধে এখানে নেই। এমনকি তুমি যদি ফ্লেয়ার (এক ধরণের জ্বলন্ত বাতি বা হাউই। খুব স্বল্প সময়ের জন্য উজ্জ্বল আলোয় চারদিক আলো করে জ্বলে। রাতের যুদ্ধে ব্যবহার হয়) ছোঁড় তাহলে তা প্রবল হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুমি নামার কোন সুযোগ পাবে না। ল্যান্ডিং ইজ আউট অফ কোশ্চেন। কাছাকাছি বড় বিমান বন্দর ব্রিস্টল। তুমি সেখানে উড়ে যাও। বুঝতে পেরেছ কি না জানাও, ওভার।”

“সেন্ট জেমস, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের ল্যান্ড করতেই হবে। একটা ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। আর তেল লিক করছে। একটা ইঞ্জিন নিয়ে সামনের স্মোকি মাউন্টেন টপকানো সম্ভব নয়। এছাড়া প্লেনে কোরিয়া থেকে আগত অতিথিরা আছেন। আমি খুব বেশি হলে মিনিট চল্লিশেক আকাশে উড়তে পারব। তোমাদের কিছু করতেই হবে। ক্যাপ্টেন ওয়ার্ন ২৪৫০ সি এর পক্ষ থেকে সেন্ট জেমসের পরবর্তী আদেশ চাইছি। ওভার।”

“রকি হ্যারিস মাইক্রোফোনটা একবার এহাতে একবার ওহাতে করতে লাগল। একজন প্রাক্তন এয়ারফোর্স কর্মী হিসেবে সে ভালই বুঝতে পারছে অবস্থাটা। সে আলোর ব্যাবস্থা না করতে পারলে রাতের অন্ধকারে প্লেন ল্যান্ড করতে গিয়ে প্লেনটা আরোহীসহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ঠোঁট কামড়ে রকি আবার শুনল বিকট আওয়াজ তুলে প্লেনটা মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। মাইক্রোফোনের “ স্পিক” বোতামটা টিপে হ্যারিস বলতে শুরু করল।

“হ্যালো এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি। ক্যাপ্টেন, উড়তে থাক। কিছু একটা ব্যবস্থা করছি। তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হল, এয়ারস্ট্রিপের চারপাশে গোল হয়ে আকাশে চক্কর লাগাও যতক্ষণ না কিছু ব্যবস্থা করতে পারছি। আপ্রাণ চেষ্টা করব আধঘন্টার মধ্যে তোমাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে আশা করি। ওভার।”

“ওকে সেন্ট জেমস। আমি চেষ্টা করব যত বেশি সময় সম্ভব আকাশে চক্কর কাটার। ওভার এন্ড আউট।”

রকি টমির দিকে ফিরে বলল, “আমাদের কাছে কি কোন ফ্লেয়ার আছে?”

“না স্যার গত সপ্তাহে আমরা ট্রেনিং- এর সময় আমরা সব জ্বালিয়ে ফেলেছি।”

“ও ভগবান। মনেই ছিল না। আজই ত হেনরির ফ্লেয়ার নিয়ে আসার কথা ছিল। বেচারা তো আটকে গেল ব্রিস্টলে।”

রকি ঝট করে কোটটা টেনে গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, “আমি ট্রাক ডিপোতে যাচ্ছি। ওদের কাছে ফ্লেয়ার থাকতে পারে। তুমি কন্ট্রোল রুমে থাক টমি।”

“এই রকি দাঁড়াও, আমি কী করব? বলে যাও।” কিন্তু ততক্ষণে রকি হ্যারিস সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামতে শুরু করে দিয়েছে। টমির কথার উত্তর দেওয়ার সময় আর নেই।

“হ্যালো সেন্ট জেমস। কি অবস্থা? ওভার।”

টমি বুঝতেই পারছিল না কী করবে। না শোনার ভান করবে? কেননা এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি সমানে রেডিওতে ডেকেই চলেছে। উত্তর চাইছে। অনেক ভেবে টমি কন্ট্রোলে গিয়ে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে “ হ্যালো” বলল। কিন্তু খেয়াল নেই যে “ স্পিক” সুইচটা দাবায় নি। তাই এয়ার ফোর্স প্লেনের ক্যাপ্টেনও সাড়া পাচ্ছে না। স্পিকারে গলা ক্রমশই ভয়ার্ত হয়ে আসছে কন্ট্রোল রুম থেকে সাড়া না পাওয়ায়। টমির হাত কাঁপছে। হাতের চেটো ঘামে ভিজে গেছে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে টমি “ স্পিক” বোতামটা অন করে বলল, “এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি আমরা কাজ করছি। ওভার।”

“সেন্ট জেমস। দয়া করে খুব তাড়াতাড়ি কিছু কর। যা ভেবেছিলাম তার থেকে দ্রুতগতিতে তেল লিক করছে। খুব বেশিক্ষণ উড়তে পারব না। ওভার এন্ড আউট।”

টমি ভাবতে পারছে না কী করবে। ওঃ এই সময় যদি স্কাউট মাস্টার মিঃ ফিলিপ কাছে থাকতেন! ভদ্রলোকের মাথায় সব সময় কিছু না কিছু নতুন চিন্তা ঘোরে। আবার স্পিকারে ভেসে এল পাইলটের ভীত আওয়াজ, “হ্যালো সেন্ট জেমস। তাড়াতাড়ি কিছু কর না হলে ..... আমাদের ভাগ্য। ওভার।”

টমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। কী করবে, কী উত্তর দেবে!

“ওকে ক্যাপ্টেন। বুঝতে পারছি আর একটু সময় দাও।”

টমি, রকি হ্যারিসের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায় ট্রাক ডিপোতে যথেষ্ট ফ্লেয়ার মজুত আছে।

হঠাৎ আইডিয়াটা যেন বিদ্যুতের মত খেলে গেল তার মাথায়। “ট্রাক- ট্রাক”- চিৎকার করতে করতে টমি ঝাঁপিয়ে পড়ল টেলিফোনের ওপর, “ওঃ এতক্ষণ কেন এটা মাথায় আসেনি? হে ভগবান সাথ দাও। অনেকগুলো প্রাণ বেঁচে যাবে,”

টেলিফোনটা তুলে সে চিৎকার করে বললো, "অপারেটর, ২৬৩ নম্বর ফোনে লাইন দাও। মোস্ট আর্জেন্ট।"

"হ্যালো জিমি- কথা বোলোনা। শোনো। টমি বলছি। তোমাকে এক্ষুনি এমারজেন্সি সার্ভিসে স্কাউটদের নিয়ে নামতে হবে। গত মাসে আমরা দু- নম্বর প্ল্যান-এর যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম সেটা কাজে লাগাতে হবে। সব স্কাউটদের হাইওয়েতে নামাও। শোনো কী করতে হবে...." টমি দ্রুত তার পরিকল্পনা বলে দিল জিমিকে।

"ওকে," বলে জিমি ফোন ছেড়ে দিল। ওদিকে ক্যাপ্টেনের গলার স্বর বারবার স্পিকারে ভেসে আসছে, "হ্যালো সেন্ট জেমস-- "

টমি ঝাঁপাল কন্ট্রোলের স্পিক বোতামের ওপরে। উত্তেজনায় কাঁপছে টমি।

"ক্যাপ্টেন, সেন্ট জেমস বলছি। আরো মিনিট পনেরো তোমাকে আকাশে চক্কর কাটতে হবে। আশা করছি কিছু ব্যবস্থা করতে পারব।"

"ওকে সেন্ট জেমস। পনেরো মিনিট আকাশে ভেসে থাকতে পারব। ভগবানের কাছে আমরা সবাই প্রার্থনা করছি। ওভার এন্ড আউট।" ক্যাপ্টেনের গলায় হতাশার সুর। ক্যাপ্টেন যেন প্রস্তুত হয়েই আছেন অঘটনের জন্য। অন্ধকারে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করতে না হয়। টমি বাইরে তাকাল। জমাটি কালো মিশমিশে অন্ধকার। তার মধ্যে হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে। বুকে ক্রুশ আঁকল টমি। চাই না তুষারপাত! দরকার নেই ক্রিসমাসে বরফ!

শুধু মাথার ওপর চক্কর কেটে চলা প্লেনের দপদপানির আলো আর দূরে হাইওয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ির হেডলাইট নিকষ কালো অন্ধকার খানিক দাগ কাটছে।

আবার বুকে ক্রুশ আঁকলো টমি। আশা করি সাথী স্কাউটরা হাইওয়েতে কাজে নেমে পড়েছে।

****

পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে বিরাট ডিজেলবাহী ট্যাঙ্কারের চালক মাইক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওই জগদ্দল পাহাড়ি রাস্তায় বিশাল লম্বা ভারী তেলবাহী ট্যাঙ্কার চালানো, তাও আবার ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে! ওঃ! সবসময় তটস্থ থাকতে হয়।

সেন্ট জেমস এয়ারস্ট্রিপের কাছে আসতেই মাইকের পা চলে গেল দ্রুত ব্রেকে। বিকট আওয়াজ করে বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার মাঝখানে স্কাউটের পোশাক পরা একজন দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি থামাতে বলছে।

"কী চাই খোকা? এই অন্ধকারে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছ কেন?"

"সরি স্যার। আমার নাম স্কাউট জেমস টেইলর। দিস ইজ এমারজেন্সি। আমাদের আপনার গাড়ির হেডলাইটের আলো দরকার।"

"কীসের জন্য?"

"স্যার এয়ারপোর্টে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমাদের এয়ারপোর্টে রাতে আলোর ব্যাবস্থা নেই। একটা এয়ারফোর্সের প্লেনকে এক্ষুনি এমারজেন্সি ল্যান্ডিং করাতে হবে। স্যার আপনি একটু প্লিজ আপনার গাড়িটাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসুন।"

"ওকে খোকা, বুঝে গেছি। কোন দিকে যেতে হবে বল। এই জগদ্দল গাড়িটা দশ টন ডিজেল বোঝাই। একে নাড়াতে সময় লাগে। আর আমি এইমাত্র ওই তোমরা যাকে পাহাড় বল সেই বিদঘুটে পাথুরে জায়াগাটা পেরিয়ে এলাম। তাড়াতাড়ি রাস্তাটা দেখাও। ম্যাজিক দেখাব হে খোকা!- হাঃ হাঃ"

জেমস ড্রাইভারের কেবিনে উঠতেই গর্জে উঠল বিশাল ট্যাঙ্কারের ইঞ্জিন।

"স্কাউট ওয়াকার স্যার," থামানো গাড়িটার ড্রাইভারের কাচের সামনে গিয়ে বলল আরেকজন স্কাউট। স্কাউটদের হাতের এমারজেন্সি ব্যাজ দেখে ড্রাইভার বলল, "কিছু সমস্যা হয়েছে নাকি স্কাউট?"

"ইয়েস স্যার। আপনার গাড়ির হেডলাইটের আলোটা প্রয়োজন যাতে অন্ধকার এয়ারপোর্টে আমরা একটা এয়ারফোর্সের প্লেনকে এমারজেন্সি ল্যান্ডিং করাতে পারি।"

মাথার মাত্র শ তিনেক ফুট উপর দিয়ে বিকট আওয়াজ তুলে উড়ে গেল প্লেনটা। ড্রাইভার একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে এস। রাস্তা দেখাও।"

পেছনে আরও কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। স্কাউট ওয়াকার সবাইকে সংক্ষেপে এমারজেন্সি সাহায্য চেয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে বলল।

ওয়াকার ড্রাইভারের কেবিনে উঠতে উঠতে দেখল আরও বেশ কয়েকজন স্কাউট রাস্তায় নেমে পড়ে আলো দেখিয়ে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে। ওদেরকে হুকুম দেওয়া

হয়েছে, "গেট এনিথিং উইথ লাইটস অন ইট।" হাইওয়েতে এখন প্রচুর গাড়ি। কারণ পাহাড়ের ওপারে যাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা। স্কাউটরা খুব দ্রুত কাজ করছে। গাড়ি থামাচ্ছে আর সোজা এয়ারপোর্টের রাস্তায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সৌজন্যবোধের কোন অভাব দেখাচ্ছে না। তাদের হাতে বাঁধা এমারজেন্সি ছাপ মারা কাপড়ের টুকরো, হাতের টর্চ লাইট আর মাথার ওপর খুব নীচু দিয়ে উড়ে চলা প্লেনের গর্জন- সব কিছুই গাড়ির ড্রাইভারদের অনেক না বলা কথা বলে দিচ্ছে যেন।

কন্ট্রোল টাওয়ারে উত্তেজিত টমি রেডিওর সামনে বসে আছে।

"সেন্ট জেমস, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। তেল শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। আমরা খুব উপরে ভেসে থাকতে পারছি না। তিনশো ফুট উচ্চতায় উড়ছি। যদি

আলোর ব্যবস্থা না হয় তাহলে অন্ধকারেই নামতে হবে। নির্দেশ দাও। বুঝতে পারছ? ওভার।"

টমি পাইলটকে দিকনির্দেশ দিল। রীতিমত ঘামছে টমি। হাত পা কাঁপছে। মাথার ওপর চক্কর কাটতে থাকা প্লেনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে ওটা তিনশো না আরও নীচে নেমে এসেছে। স্কাউটরা যদি পথে নেমে গাড়ি থামাতেও পারে তবু কোনভাবেই রানওয়ের পাশে কোন গাড়িই আনতে পারবে না। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে টমি একটা প্লেন রানওয়েতে তিন চারটে ডিগবাজি খেয়ে সব আরোহীসহ আগুনের গোলায় পরিণত হল। কিন্তু তবুও টমি ক্রমাগত পাইলটকে দশ মিনিট ধরে একই আশ্বাস বাণী দিয়ে চলেছে, "পাইলট, ভরসা রাখ। আমরা তোমাকে নিরাপদে নামিয়ে নিয়ে আসব।"

"হ্যালো সেন্ট জেমস," পাইলটের গলা ভেসে এল, "আমরা তেল চুঁইয়ে পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে হয়না সফল হব। চেষ্টা করছি ভেসে থাকার।"

"অপেক্ষা কর ক্যাপ্টেন। ভরসা রাখ। চেষ্টা করছি," বারংবার এ কথা শোনালেও কিন্তু টমির গলাতে তেমন কোন জোর নেই।

"হ্যালো ক্যাপ্টেন, ভরসা রাখ ....." বলতে বলতেই হঠাৎ বাইরের দিকে নজর যেতেই টমির হাত থেকে টক করে মাইক্রোফোনটা পড়ে গেল। চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে ধরল সে একবার, তারপর ছুটে গেল জানালার দিকে।

একটা বিশাল বড় তেলের ট্যাঙ্কার গর্জন করতে করতে মিশকালো অন্ধকার ছারখার করে জোরালো আলো জ্বালিয়ে রানওয়ে পার হচ্ছে। তার পেছনে একটা বড় বাস। তার পেছনে আরো গাড়ির সার। অসংখ্য। পুরো হাইওয়েটাই যেন রানওয়েতে এসে গেছে! দশ বারোজন স্কাউট বিভিন্ন দিকে দাঁড় করাচ্ছে গাড়িগুলো। ড্রাইভাররা সবাই বুঝে গেছে কী করতে হবে। পুরো রানওয়ে আলোয় আলোকিত। স্কাউটরা দ্রুত রানওয়ে খালি করছে।

টমির আনন্দে ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে করছে। একদম সেরা মিলিটারি প্যারেড দেখছে যেন সে। অসাধারণ ছন্দ। ড্রাইভাররা গাড়িগুলো রানওয়ের দুপাশে সার দিয়ে ত্যারচাভাবে দাঁড় করিয়ে হেড লাইটের জোরালো আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। সব কটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ সেরা অর্কেস্টার মত এক সুরে যেন বাজছে।

টমি কন্ট্রোল রুমের জানলায় দাঁড়িয়ে পাগলের মত চিৎকার করছে। যদিও তার শব্দ রানওয়েতে যাচ্ছিল না। শেষ গাড়িটা রানওয়ে পার হতেই টমি ঝাঁপিয়ে পড়ল রেডিওর ওপর।

এবার আর ভুল করল না সে। এমনকি সে আর তোতলাচ্ছেও না। নিখুঁত পেশাদারের মত "স্পিক" বোতাম অন করে বলল, "হ্যালো ক্যাপ্টেন, নিচে রানওয়েতে আলো দেখতে পাচ্ছ?"

"সেন্ট জেমস। তোমরা অলৌকিক কান্ড করেছ। এত ভাল আলো ব্রিস্টলেও নেই। তাড়াতাড়ি নামার দিক নির্দেশ কর," টমি স্পিকারে শুনতে পেল। প্লেনের ভেতরে সবাই আনন্দে চীৎকার করছে।

"ওকে এয়ার ফোর্স ২৪৫০ সি। তোমাদের নামার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। উত্তর পূর্ব দিক থেকে জোরালো বাতাস বইছে। আর তো তো তো" টমির সেই অজানা ভয়টা ফিরে এসেছে। তোতলাতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে সে মনে করতে পারল কী বলতে হবে—"তোমরা দক্ষিণের দিক থেকে নাম। রানওয়ের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাজার ফুট। বুঝতে পেরেছ? জবাব দাও। ওভার।"

"ওয়া, বুঝতে পেরেছি সেন্ট জেমস। আমরা দক্ষিণ দিক থেকে নামছি। রানওয়ের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাজার ফুট। ওভার।"

টমি জানলা দিয়ে দেখতে পেল প্লেনটা নেমে এসেছে দেড়শো ফুট উচ্চতায়। আকাশে একটা চক্কর মেরে চলে গেল দক্ষিণের দিকে যেখান থেকে তাকে নেমে আসতে হবে মাটিতে। বারবার করে বুকে ক্রুশ আঁকছে টমি। হে ভগবান এই মোক্ষম সময়ে সে যেন আর না তোতলায়।

"ওকে ক্যাপ্টেন, নেমে এস।"

"ইয়েস স্যার আমরা নামছি।"

বিশাল এয়ারফোর্সের প্লেনটা আলতো করে রানওয়ের মাটি ছুঁল। তারপর বেশ খানিকটা দৌড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত রানওয়েটা উল্লাসে ফেটে পড়ল। সব

ক'টা গাড়ি একসাথে হর্ন বাজাতে শুরু করেছে। টমি এতক্ষণ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্লেনটা মাটিতে দৌড় শেষ করে থেমে যেতে সে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

পেছনে পায়ের শব্দ পেতে ঘুরে দেখল রকি হ্যারিস ঢুকছে। হাত ভর্তি ফ্লেয়ার। সে আমতা আমতা করে বলল, " যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত এসেছি।" তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা জখম এয়ার ফোর্সের প্লেনটার দপদপ করে জ্বলতে থাকা আলোর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে হাতের ফ্লেয়ারগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল। নিজের টেবিলের সামনে হেঁটে গিয়ে ড্রয়ার খুলে জিমির "মেরিট ব্যাজ" এ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা টেনে বের করে । চেয়ারে বসে তাতে সই করল।

"হেই জিমি, তুমি তোমার পুরস্কারটা ক্রিসমাসের আগেই পাবে হে!"

ছবিঃ সংগৃহীত

।২।

সিন্ধু উপত্যকায় গণিত

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকার বিজ্ঞানিমহলে দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার চালু ছিলো। এ কথা জানা গেছে সেখানকার ওজন, দৈর্ঘ এসব মাপবার পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে। প্রত্নবিদ ও বিজ্ঞানিরা দেখেছেন সেখানে ওজন মাপবার যেসব বাটখারা ছিলো সেগুলো ছিলো ০.০৫, ০.১, ০.২,০.৫, এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশো, দুশো এবং পাঁচশোর অনুপাতে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চান্হু দারো এই সব জায়গা মিলিয়ে প্রায় পাঁচ শতাব্দিও জোড়া সময়ের সাড়ে পাঁচশোর ওপরে বাটখারা মিলেছে সিন্ধু উপত্যকায়। তদের ওজনের মাপে বিস্ময়কর মিল থেকে বোঝা যায়, সুদীর্ঘকাল ধরে কতটা অগ্রসর ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল সিন্ধুবাসীদের মাপজোকের পদ্ধতি!

আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সেখানকার বিভিন্ন মাপজোকের নিখুঁত পদ্ধতি। একটা দৈর্ঘমাপক দাগ কাটা ব্রোঞ্জের রড পাওয়া গেছে সিন্ধু উপত্যকায় যেটার গায়ে ০.৩৬৭ ইঞ্চি দূরত্বে এক একটা দাগ কাটা। ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে সিন্ধু উপত্যকায় হাতির

দাঁতের স্কেল ব্যবহার করা হত। লোথাল থেকে ২৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের একটা এরকম স্কেল মিলেছে যার গায়ে সমদূরত্বে এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ (২ মিমি) মাপের দাগ কাটা। মহেঞ্জো দারোয় পাওয়া অন্য একটা স্কেলের গায়ে আবার মাপের একক কাটা হয়েছে ১.৩২ ইঞ্চি (সাড়ে পঁয়তিরিশ মিলিমিটার) হিসেবে। সেই এককে আবার অনেক ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক ইঞ্চির দুশো ভাগের এক ভাগ মাপের হিসেবে। এ থেকেই বুঝতে পারবে তখনকার মানুষ কত নিখুঁত আর সুক্ষ্মভাবে মাপজোক করতে শিখেছিলো। আসলে এত সুক্ষ্ম আর নিখুঁত মাপজোকের প্রয়োজন ছিল বিশেষ করে তাদের নগর পরিকল্পনায়। সিন্ধু উপত্যকার শহরের রাস্তাগুলো তৈরি হত একের সঙ্গে অন্যের নিখুঁত সমকোণে, নর্দমা তৈরি করা হত নিখুঁত মাপজোকে (কেবল সোজা, লম্বা করলেই যথেষ্ট হবে না, তা দিয়ে ইচ্ছে মতন দিকে জল বওয়াতে হলে নিখুঁত হিসেব করতে হবে তার ঢালকেও। সেটা মোটেই মোটাদাগের কাজ নয়। তার জন্য চাই সুক্ষ্ম মাপজোক।), ঘরবাড়িগুলোও সুনির্দিষ্ট হিসেবমতন বানানো হত। এর জন্য গণিতশাস্ত্রের ব্যবহার করে গড়ে উঠেছিল জরিপের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি।

সঙ্গে দেয়া মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার এলাকার একটা আকাশ থেকে তোলা ফটো থেকে বুঝতে পারবে কতটা জ্যামিতি মানা ও নিখুঁত ছিল সিন্ধুবাসীর নগরপরিকল্পনা। এর জন্যই তাঁদের অত উচ্চমানের অংকশাস্ত্র গড়ে তুলতে হয়েছিলো।

তাছাড়া , নিখুঁতভাবে ঘরবাড়ি, শহর গড়া কিংবা নদীর পার বাঁধাবার জন্য দরকার ছিল নিখুঁত মাপের ইঁট। জ্যামিতির আইন মেনে নিখুঁত ইঁট বানাবার শিল্পেও দক্ষতার চূড়ায় উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। মাপজোকের যে একক মিলেছে সিন্ধু উপত্যকায় তার সঙ্গে নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায় তার ইঁটের মাপজোক।

ফিরে আসি ওজনের মাপজোকের কথায় । সিন্ধু সভ্যতায় নিখুঁত ও অতিসুক্ষ্ম ওজন মাপবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রয়োজন ছিল উচ্চমানের ব্যবসাপত্র চালাবার জন্য। এ সব মাপজোকেই দশমিক পদ্ধতিতে সুদক্ষ্ম ব্যবহারের প্রমান পাওয়া গেছে; আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে! খননের ফলে এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে অনেক দাঁড়িপাল্লাও। সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার বাটখারা ও দাঁড়িপাল্লার ছবি দেয়া গেল একটা।

গণিতশাস্ত্রটা এখানে গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র একটা তাত্ত্বিক শাস্ত্র হিসেবে নয়, বাস্তুবিদ্যা আর ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে, একটা ব্যাবহারিক বিজ্ঞান হিসেবেই এ শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন সিন্ধুপারের প্রাচীন বিজ্ঞানিরা। আবার, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চার উপকরণ হিসেবেও গণিতশাস্ত্রের ব্যবহার করতে জানতেন সিন্ধু উপত্যকার বিজ্ঞানিরা। এর প্রয়োগ তাঁরা করেছিলেন উন্নতমানের জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে। পরবর্তীযুগে এসেও আমরা দেখবো, জ্যোতির্বিদ্যচর্চা বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন সময়ে গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে, বিশেষ করে ত্রিকোণমিতিশাস্ত্রকে।

এ তো গেল, সিন্ধু উপত্যকার গল্প। আগামি সংখ্যায় আমরা আর্যদের গণিতচর্চার গল্প পড়ব।

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস

এই সংখ্যায় আমরা কিছু বিচিত্র যোগ আর গুণ অংক করে দেখাবো:

মজার যোগ, মজার গুণঃ

।ক। ৮-এর খেলা:

1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98

123 x 8 + 3 = 987

1234 x 8 + 4 = 9876

12345 x 8 + 5 = 98765

123456 x 8 + 6 = 987654

1234567 x 8 + 7 = 9876543

12345678 x 8 + 8 = 98765432

123456789 x 8 + 9 = 987654321

।খ। ১ আর ৯-এর ম্যজিক:

1 x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111

1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111

123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111

12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 + 10 = 1111111111

।গ। ৮ আর ৯-এর ম্যজিক:

9 x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888

987 x 9 + 5 = 8888

9876 x 9 + 4 = 88888

98765 x 9 + 3 = 888888

987654 x 9 + 2 = 8888888

9876543 x 9 + 1 = 88888888

98765432 x 9 + 0 = 888888888

।ঘ। ১-এর খেল:

1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 = 123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 11111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

।ঙ। ৮ ভ্যানিশ!!

12345679 x 9 = 111111111

12345679 x 18 = 222222222

12345679 x 27 = 333333333

12345679 x 36 = 444444444

12345679 x 45 = 555555555

12345679 x 54 = 666666666

12345679 x 63 = 777777777

12345679 x 72 = 888888888

12345679 x 81 = 999999999

।চ। ৯-এর ম্যজিক:

9 x 9 = 81

99 x 99 = 9801

999 x 999 = 998001

9999 x 9999 = 99980001

99999 x 99999 = 9999800001

999999 x 999999 = 999998000001

9999999 x 9999999 = 99999980000001

99999999 x 99999999 = 9999999800000001

999999999 x 999999999 = 999999998000000001

।ছ। ৬-এর ম্যজিক:

6 x 7 = 42

66 x 67 = 4422

666 x 667 = 444222

6666 x 6667 = 44442222

66666 x 66667 = 4444422222

666666 x 666667 = 444444222222

6666666 x 6666667 = 44444442222222

66666666 x 66666667 = 4444444422222222

666666666 x 666666667 = 444444444222222222

নানান দেশের এক দুই তিন

কেমন করে সংখ্যা লিখতেন বিভিন্ন প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষেরা? জয়ঢাক বেরিয়েছে তার সন্ধানে। এইবারে পাশে দেয়া হল আর্মানি (আর্মেনিয়ান) সংখ্যাদের চেহারা।

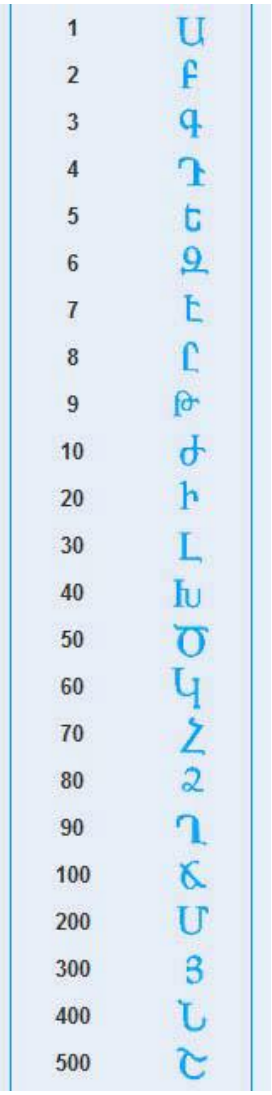

টেকনো টুকটাক

যন্ত্রপোকার উড়াণ

উড়ুক্কু পোকারোবট তৈরির কাজকর্ম বেশ অনেকদূরই এগিয়ে গেছে আজকাল।

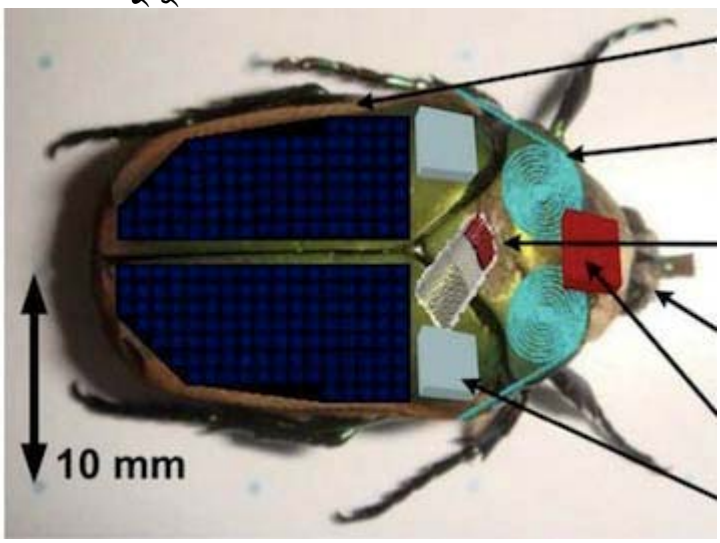

বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে মাইক্রো এয়ার ভেহিকল বা এম এ ভি। একবার বানিয়ে ফেলতে পারলে ভীষণ কাজে লাগবে এই যন্ত্র। তবে একে বানানোটা বেজায় কঠিন কাজ। গত দশকে বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র পোকার সাইজের ডানা কৃত্রিমভাবে গড়ে তাকে অতিক্ষুদ্র মোটর দিয়ে ঝাপটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু পোকা ওড়ানো তখনও দূর অস্ত ছিলো। কিছুকাল আগে এ ব্যাপারে আরও কিছুদূর এগোন গেছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই প্রথম ৩. ৮৯ গ্রাম ওজনের একটা ছোট্ট যন্ত্রপোকাকে(ডানা ঝাপটে ওড়ে বলে একে অর্নিথপটারও বলে।) বাতাসে ওড়াতে পেরেছেন। কার্বনের ফ্রেমে আটকানো পলিয়েস্টারের ফিল্মে তৈরি ডানায় ভর করে ওড়ার সময় সে পোকা প্রায় দেড় গ্রাম ওজনের ব্যাটারি সঙ্গে নিয়ে ভাসতে পেরেছে।

সঙ্গে তার উড়ানের ভিডিওর লিংক দিলামঃ

ht t p: / / www. yout ube. com/ wat ch?v=6gM7NZf i bJA&f ea t ur e=pl ayer embedded

তবে বাস্তব জগতে কাজে লাগাবার জন্য আরও অনেক উন্নতি দরকার আছে এর। যেমন ধরো, ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যাওয়া মানেই তো পোকা অচল। তখন ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য তাকে ফের ফিরিয়ে আনতে হবে কাজ থেকে। দিনের বেলা হলে তা- ও সোলার ব্যাটারি দিয়ে সমস্যাটার সমাধান করা যায়। কিন্তু ঘরের ভেতরে, রাতের বেলা, বা মেঘলা দিনে সে সমাধান কাজ করবে না। অতএব তৈরি করতে হবে এক দেড় গ্রাম ওজনের অথচ দীর্ঘক্ষণ চলে এমন ব্যাটারি। সে কাজ এখনো বাকি আছে।

পো(কা)রেন্ট

উড়ুক্কু পোকার একটা প্রধান কাজ হবে নীরব নজরদারী। এই যে রোজ রোজ চারপাশে এতো খবর শুনি যে শহরে বাজারে ইসটিশনে চোর, গুন্ডা, উগ্রপন্থীর হানা, উড়ুক্কু পোকার দল থাকলে তারা নীরবে হাওয়ায় ভেসে ভেসে এইসব জায়গায় একেবারে একশো শতাংশ অঞ্চল জুড়ে কড়া নজর রাখতে পারবে, যা কিনা আর কোনও যন্ত্র দিয়েই সম্ভব নয়। এ কাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারির দরকার হবে উড়ুক্কু পোকার। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য তার আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা না করে দুর্দান্ত একটা সমাধান বের করেছেন তার। সেটা হলো, যন্ত্রপোকার বদলে সত্যিকারের পোকাদের এ কাজে ব্যাবহার করা।

দেখা গেছে, সত্যিকারের উড়ুক্কু পোকাদের অ্যান্টেনার গায়ে ছোট্ট স্টিমুলেটর লাগিয়ে, তাদের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে, কিংবা স্নায়ু ও পেশিদের সংযোগস্থলে আনুবীক্ষণিক ইলেকট্রোড বসিয়ে এদের গতিবিধি সচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর তাই যদি সম্ভব হয় তাহলে আর কষ্ট করে যন্ত্রপোকা বানাবার দরকার কী?

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সমস্যা সেই একই—শক্তির নিরবচ্ছিন্ন জোগান। পোকার গায়ে লাগানো এইসব যন্ত্রপাতিকে শক্তি জোগাবে কে? অতিক্ষুদ্র ব্যাটারির ব্যবহার হয়েছে এ ক্ষেত্রেও , কিন্তু সমস্যা একই, ব্যাটারির শক্তি শেষ হলেই তো আর কথা শুনবে না পোকা। ইচ্ছে মতো উড়ে যাবে যেদিকে চোখ যায়।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়- এর ইথেম এরকান আকটাক্কা এ সমস্যার সমাধান করেছেন পোকাকে দিয়েই। ওড়বার সময় সে যে অনবরত ডানা ঝাপটায়, তার শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করবার জন্য তার দুই ডানায় দুখানা পিয়েজো ইলেকট্রিক জেনারেটর বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে পাওয়া গেছে সুক্ষ্ম পরিমাণের বিদ্যুতের নিয়মিত জোগান। জোগান আগামিতে আরও বাড়বে , যখন ডানার বদলে জেনারেটরদের জূড়ে দেয়া হবে সরাসরি পোকার ডানা ঝাপটাবার পেশির সঙ্গে। সেই শক্তিতেই চালু থাকবে পোকার শরীরে চাপানো তার নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি, তার গায়ে বাঁধা মানুষের ক্যামেরা। পোকা যতক্ষণ উড়তে পারবে, ততক্ষণ চালু থাকবে সবকিছু।

একটা মজার চিন্তা এলো মাথায়। আচ্ছা ধরো একটা পোকার গায়ে এসব যন্ত্র লাগিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাহলে সে যতক্ষণ থেমে থাকবে ততক্ষণ তার নিয়ন্ত্রক যন্ত্ররা অকেজো থাকবে, ফলে কেউ তার ওপরে খবরদারি করতে পারবে না। কিন্তু যেই সে আকাশে উড়বে, অমনি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র চালু হয়ে যাবে। পোকার আর নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তখন পোকাগুলো না আবার সব স্বাধীনতার লোভে আলসে হয়ে যায়!

চরক

৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন চরক। তাঁকে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম বলেন, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি কোন পূর্বজন্মের কর্মফল নয়। নির্দিষ্ট কিছু বিধি মেনে চললে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। চিকিৎসা করে রোগ সারাবার চেয়ে জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে রোগ যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করাটা অনেক বেশি দরকারী। আজকের যুগে এ কথাটা খুব সহজ একটা সত্য মনে হলেও আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে কোন মানুষের পক্ষে এই সত্যটা উপলব্ধি করাটা একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

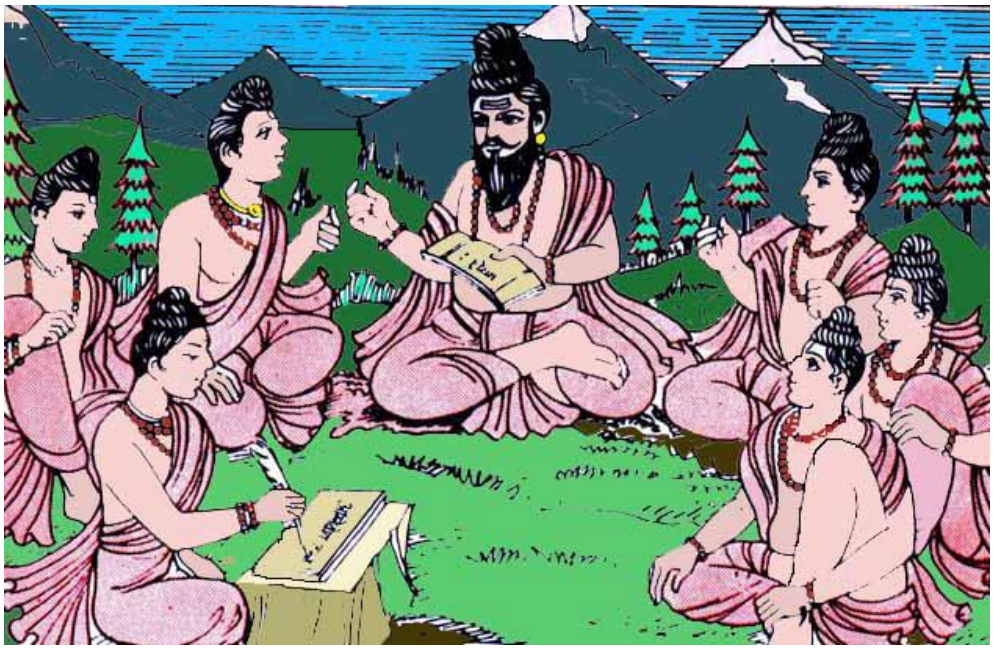

পাচনপ্রক্রিয়া, বিপাকক্রিয়া ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিলেন চরক। তাঁর তত্ত্ব দেখিয়েছিলো, তিনটে বস্তুর ভারসাম্য মানুষের সুস্থতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি হল, বায়ু, পিত্ত ও কফ। খাদ্যের ওপরে রক্ত মাংস ও মজ্জার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় এই তিনটির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়। এক একজন মানুষের শারীরিক গঠনের ও অভ্যাসের ওপরে নির্ভর করে এই ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণ। এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে বিভিন্ন অসুখ হয়। ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে রোগ উপশমের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োগের কথাও তিনি বলেছিলেন। এই

মূলনীতিটির ওপরে ভিত্তি করে তিনি তৈরি করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদ, যা আজও একটি স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। মানুষের শারীরসংস্থান অধ্যয়ন করে তিনি হিসেব দিয়েছিলেন দাঁত সহ মানুষের দেহে ৩৬০খানা হাড় আছে। বলেছিলেন হৃৎপিণ্ড, তেরোটি প্রধান ও অসংখ্য অপ্রধান নলের মাধ্যমে সারা শরীরে খাদ্য সরবরাহ করে ও শরীরের আবর্জনা নিষ্কাশন করে আনে। এদের কারো কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে নানান অসুখ হয়। প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানী আত্রেয়- র ছাত্র অগ্নিবেশ যে সুবিশাল চিকিৎসাগ্রন্থটি লিখেছিলেন (অগ্নিবেশ সংহিতা) সেটির আমূল সংস্কারসাধন করেন চরক। এরপর তা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধি পায়। পরবর্তি যুগে এটি আরবি ও ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে পশ্চিমি দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে ও আধুনিককালের চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম দেয়।

বনের ডায়েরি

এবারের বনের ডায়েরিতে রইল পুরুলিয়ার বন নিয়ে ৩টে ছড়া। পাঠিয়েছেন শ্রী তরুণ সরখেল।

রতু মাঝির বিপদ

মহুলটাঁড়ের মহুল ঘেরা বনে
রতু মাঝি কখন যে আনমনে
পথ হারাল সাঁঝ বেলাতে এসে
এবং শেষে বনেই গেল ফেঁসে।

ঠিক তখনই কাঁসাই নদীর পাড়ে
দলছুট এক দাঁতালে ডাক ছাড়ে,
শুনেই সে ডাক রতু মাঝি বলে
হায় কি বিপদ ঢুকে এ জঙ্গলে।

হাতির আছাড় খেয়েই যাবো মারা
বাঁচাও আমায় হয়েছি পথ হারা,
এমন সময় হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে
লখু শবর দাঁড়াল পথ জুড়ে।

বলল, আমি গাছের আড়াল থেকে হাতির মত যেই দিয়েছি ডেকে-
অমনি দেখি চমকালো তোর পিলে ভাবলি বুঝি বাঘেই খেল গিলে।
আমি এখন রোজ দু-বেলা বনে হরবোলা ডাক ডাকি আপনমনে,
রতু বলে, গাছ-গাছালির মাঝে এমন করে ভয় দেখাতে আছে ?

হলুদপাখি মেললো ডানা

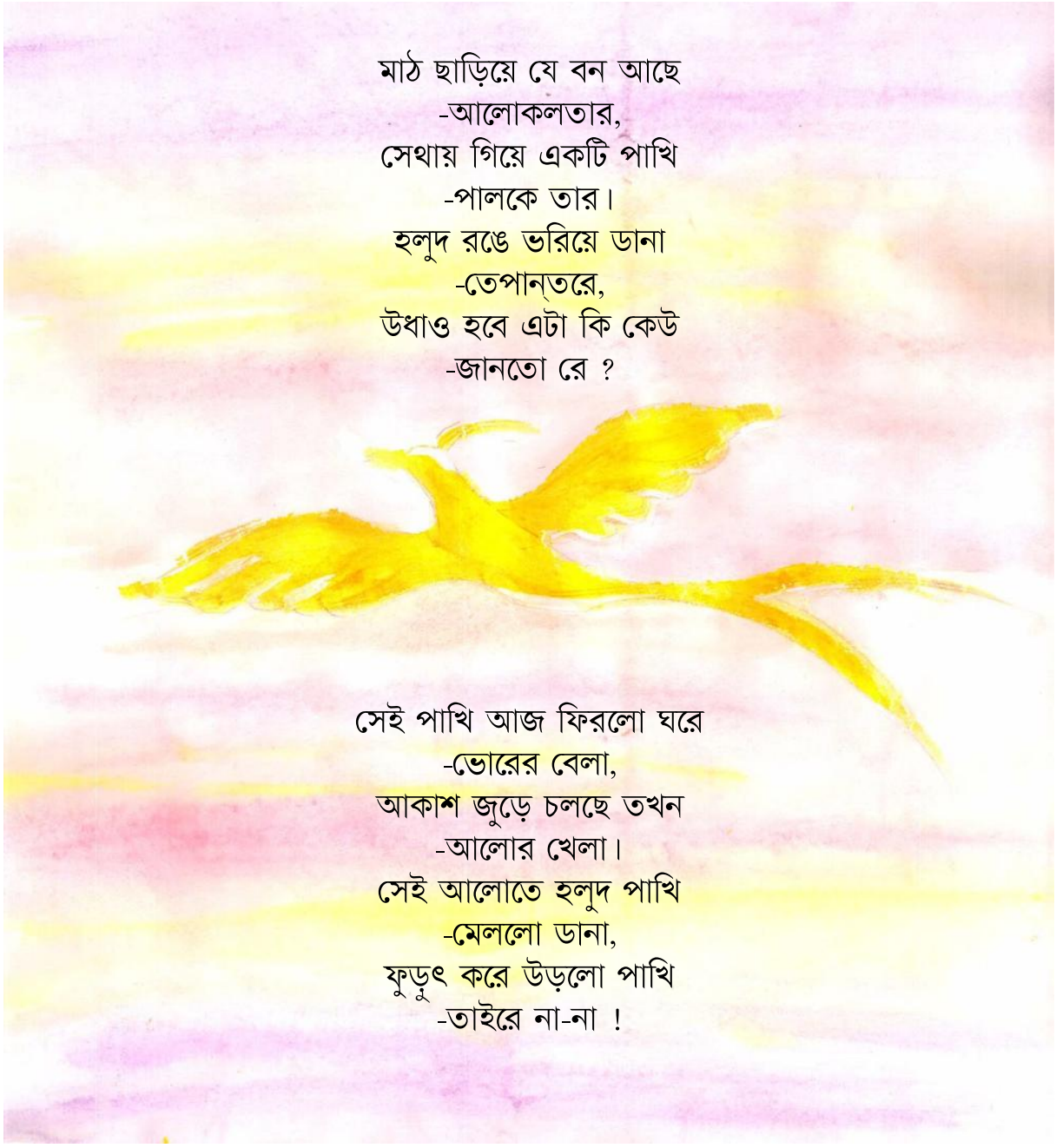

মাঠ ছাড়িয়ে যে বন আছে
-আলোকলতার,
সেথায় গিয়ে একটি পাখি
-পালকে তার।
হলুদ রঙে ভরিয়ে ডানা
-তেপান্তরে,
উধাও হবে এটা কি কেউ
-জানতো রে ?

সেই পাখি আজ ফিরলো ঘরে
-ভোরের বেলা,
আকাশ জুড়ে চলছে তখন
-আলোর খেলা।
সেই আলোতে হলুদ পাখি
-মেললো ডানা,
ফুড়ুৎ করে উড়লো পাখি
-তাইরে না-না !

ঠিক যেন ছবি

হাতিরামপুর যেতে গিয়ে আমি
নভেম্বরের শীতে,
গাড়ি থেকে নেমে ওম মেখে গায়ে
একটু জিরিয়ে নিতে--
সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর ঘেঁসে
দাঁড়িয়ে পড়েছি কাছে,
বনমালি বলে ওদিকে দেখেছি
চায়ের দোকান আছে।
মাটির পাত্রে ধোঁয়া-ওঠা চায়ে
চুমুক দেওয়ার পরে
মনে হল দূরে শাল জঙ্গলে
কুয়াশা-বৃষ্টি ঝরে।
রোদে দেওয়া ধান নিকোনো উঠান
হাঁস-মুরগীরা চরে,
হাতিরামপুর ঠিক যেন ছবি
দেখে যাই প্রাণ ভরে।

ছবিঃ মৌসুমী

মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান ও টাইগার রিজার্ভ

ভারতের বনাঞ্চল

সংহিতা

মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অংশ। নীলগিরি পর্বতমালার উত্তরপশ্চিম অংশ জুড়ে মুদুমালাই বা মুখ্য পর্বত। মালাই মানে পর্বত, মুদু মানে মুখ্য। এই পাহাড়ের মাথায় চড়লে দেখা যায় দক্ষিণপূর্ব কোণে একঝাঁক হরিণ হাঁ করে মানুষ দেখছে। এখন ওরা তামিলনাড়ুর মুদুমালাই জাতীয় উদ্যানের বাসিন্দা নাকি কেরলের ওয়াইনাদ জাতীয় উদ্যানের বাসিন্দা বলা মুশকিল। আবার মুদুমালাইয়ের মাথা থেকে উত্তরপূর্ব কোণে তাকালে দেখা যাবে মা- মাসির সাথে খোকা, খুকু হাতিরা কচুপাতা, কলাপাতা, চালতা খেয়ে চলেছে মচমচিয়ে। ওদের দেখে বোঝার জো নেই ওরা দর্শক মানুষের কথা টের পেয়েছে , নাকি মানুষকে ওরা আমলই দেয় না। ওদের দেখেও চেনা যাবে না ওরা মুদুমালাইয়ের নাকি কর্ণাটকের বান্দিপুরা জাতীয় উদ্যানের বাসিন্দা। তা হলে দাঁড়ালো মুদুমালাইয়ের মাথা থেকে দক্ষিণপুবে নামলে কেরল আর উত্তরপশ্চিমে নামলে কর্ণাটক। তিন রাজ্যের মিলন কিংবা বিচ্ছেদ হচ্ছে মুদুমালাইতেই।

এই যে কেরলের ওয়াইনাদ থেকে তামিলনাড়ুর মুদুমালাই হয়ে কর্ণাটকের বান্দিপুরাতে কিংবা এর উল্টোমুখে বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল সম্ভব, সেই জন্যই মুদুমালাইকে বন্যপ্রাণের করিডর বলা হয়। সব বন্যপ্রাণ করিডরের মতো মুদুমালাইও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের দিক থেকে দেখলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কারণ ওয়াইনাদে যদি হাতি এত বেড়ে যায় যে সব হাতির খাবার কিংবা থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল, তাহলে একদল হাতি মুদুমালাই ধরে বান্দিপুরা যেতে পারে খাবার আর থাকার জায়গার খোঁজে। আবার বান্দিপুরায় জলকষ্ট দেখা দিলে হরিণের ঝাঁক মুদুমালাই গিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারে। দুটো চিতা বা রয়েল বেঙ্গলের মধ্যে এলাকা দখল নিয়ে যদি বান্দিপুরায় মারপিট হয় তাহলে হেরো পাটি ওয়াইনাদ পালিয়ে বাঁচতে পারে মুদুমালাইয়ের পথে। ফলে বন্যপ্রাণের সংখ্যা ঠিক থাকে, ঠিক থাকে বনের, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য।

তবে বন মানে তো কেবল বাঘ, চিতা, হাতি, হরিণ নয় আরও অনেক কিছু। যেমন জায়েন্ট স্কুইরেল তার সোনালী পেট আর বাদামী পিঠ নিয়ে শাল, সেগুন শিশু গাছ থেকে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করেই পালিয়ে যেতে পারে। আবার ভরদুপুরে কোঁকর- কোঁ করে লাল ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে ডেকে উঠেই উড়ে যেতে পারে বন মোরগ। কিংবা সারা সকাল ময়ূরের ডাকডাকি শুনে অনেক খোঁজ লাগিয়ে চোখ ব্যথা করে দেখা যাবে আমড়া গাছের মগডালে পাতার আড়ালে তিনি রাজা সেজে বসে আছেন। আর আছে ঘেঁটু পাতায় পতঙ্গ দম্পতি। বড় গাছের গায়ে বনপায়রার গোল গর্ত। বনশুয়োর, বাঁদর, শেয়াল, আর কতো চমক।

মুদুমালাইয়ের প্রাকৃতিক বনের অনেকটায় চলে গেছে সেগুন বাগানের পেটে। মুদুমালাইয়ের বন জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে সেগুন গাছ কাটা আর লাগানো দুইই বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে প্রাকৃতিক গাছপালা। তার মধ্যে পশ্চিমঢালে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০০ মিলিমিটারের বেশি সেখানে ক্রান্তীয় আবহাওয়ার পর্ণমোচী গাছ যেমন তেজপাতা, তেতো কুঙ্গা, বিভিন্ন রকম বাঁশের ঝাড় দেখা যায়। এর মধ্যে আছে ফাঁপা বাশ আর ভরাট বাঁশ। দুরকম বাঁশই হাতি আর গাউর খায়। পুবের শুখা বনে আছে কাঁটা গাছ আর

ঘাসজমি। এখানেই বুনো ধান, আদা, হলুদ, ছোটো এলাচ, শিয়াকুল, পেয়ারা, মরিচ গাছ দেখা যায়। এই সব কটাই চাষও করা হয়। তাই মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান এইসব অর্থকরী শস্যের প্রাকৃতিক জিন পুলের কাজ করে। এই দুই বনের মাঝবরাবর আছে শুষ্ক পর্ণমোচী বন। যেখানে অল্প শাল আর রয়ে যাওয়া সেগুন দেখা যায়। তা বাদে যেখানেই জলাজমি কিংবা নদী আছে তার আশেপাশে আম, জাম, শিশু, করঞ্জের বন আছে।

মুদুমালাইয়ের গাছপালার বৈচিত্র্যের কারণে সেখানে প্রাণীও বহুরকম থাকে। ভারতের মধ্যে সব থেকে বেশি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে এখানেই। তাই এখানে ২০০৭ সাল থেকে তৈরি হয়েছে টাইগার রিজার্ভ। সে সময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল আটচল্লিশ। হাতি আছে দু হাজার থেকে আড়াই হাজার। চিতল হরিণ, গাউর, জায়েন্ট স্কুইরেল ছাড়াও দেখা যায় বন শুয়োর, স্লথ বিয়ার, মুনজ্যাক,সাম্বার, বনেট বাঁদর, হনুমান, বাদুড় আর বিভিন্ন জাতের খরগোশ। চিতা, বনবিড়াল, ঢোল, শেয়াল, হায়নাও থাকে এখানে।

মুদুমালাইতে পাখিও অনেক রকম। বনমোরগ কিংবা ময়ূর ছাড়াও আছে হাঁড়িচাঁচা, সোনাবৌ, বেনেবৌ, নীল টিয়া, সবুজ ঘুঘু, বি- ইটার, ফিঙে, শ্যামা, কোকিল, খঞ্জন, বুলবুল, টুনটুনি, নানা রকম কাঠঠোকরা, বিভিন্ন রকম ফ্লাই ক্যাচার, বিভিন্ন রকম পায়রা, আরও কত ধরনের পাখি।

পোকামাকড় প্রজপতিও অনেক রকম পাওয়া যায়। বান্দিপুরা আর ওয়াইনাদের সাথে যোগাযোগই মুদুমালাইয়ের বনকে এতো রঙিন আর বিচিত্র করেছে।

চাই মহাকাশযান

রতনতনু ঘাটী

তিনজন মামা ইটাহারে ছিলো বাড়ি
তার আগে বিনপুর
পূজাপার্বণে হত না বিশেষ যাওয়া
কলকাতা থেকে দূর।

পুজোর সময় চিঠি লিখতেন বাবা
মা- ও লিখতেন খামে,
“এবার আসিস, ভাগ্নেও ডেকেছে রে,”
তিন মামাদের নামে।

মামারাও লিখে পাঠাতেন আমাদের
“তোরাই আসিস চলে”
ডাকবিভ্রাটে সে চিঠি আসতো হাতে
কালীপুজো পার হলে।

এভাবে হত না কারও যাওয়া আসা
পুজো এসে চলে যেত
ভালো থাকা আর ভালোবাসাটাসা সব
চিঠিতেই পেতে হত।

ক’বছর পরে যাওয়া হবে ভেবে মা যে
কর দেখেছেন গুনে,
ছোট মামা বুধে, মঙ্গলে মেজো মামা,
বড় মামা নেপচুনে।
মামারা এখন পৃথক অন্ন তাই
আলাদা- আলাদা বাড়ি।
লিখেছেন ডাকে, “পুজোয় সবাই তোরা
চলে আয় তাড়াতাড়ি।”

সে- চিঠি পেয়েই বাবা গিয়েছেন খোঁজে
কম ভাড়াটাড়া হলে
মহাকাশযান নিয়ে আজ আমরাই
মামাবাড়ি যাব চলে।

ছবিঃ সৌভিক

বন্দি

লীনা ভট্টাচার্য

মেলায় দেখি চুড়ির পাশাপাশি
বাক্সে ভরা বিক্রি হচ্ছে হাসি
কোনটা হালকা কোনটা ভোলায় মন
কোনটা আবার ছোঁয় যে চোখের কোণ
গগনভেদি অট্টহাস্য একটা বড়ো বাক্সে
মুচকি হাসি ফোকলা হাসি
ঠিক যেরকম থাক সে
রঙবেরঙের চুড়ির পাশাপাশি
বিক্রি হচ্ছে হরেকরকম হাসি
জিগেস করি বাক্সে ভরা ভরা
এতো হাসি কোথায় দিল ধরা
লোকটা বলে, ছুটছে সবাই
কে জানে ভাই কীসের পিছুপিছু
ছুটতে গিয়ে করছে হাসি ত্যাগ
সেই হাসিরই কিছু
জোগাড় করে রেখেছি এই কোণে
আমার খুশি আঁকড়ে ধরে মনে
রঙবেরঙের চুড়ির পাশাপাশি
বিক্রি হচ্ছে হরেকরকম হাসি
বুঝলাম আজ কতো হাসিই মিথ্যে
যারা শুধু মনের কথা শোনে
তারাই আজও হাসছে যে নিশ্চিন্তে
হাজার কাচের চুড়ির পাশাপাশি
বাক্সে ভরা বিক্রি হচ্ছে হাসি
স্তব্ধ হই ভেবে
আজ বিক্রি হচ্ছে হাসি

ছবিঃ মৌসুমী

রিংকির কাণ্ড

অচিন্ত্য সুরাল

রিঙ্কির খুব বাঘ ভালো লাগে সন্তুর চাই ঘোড়া
বিন্দুটা নেবে ধবধবে সাদা ছাগলছানার জোড়া
তিতলির চাই বউ কথা কও খরগোশে খুশি রাখী
বাবলার নাকি বাঁদরের শখ রাণুর যে কোন পাখি
মনের মতন প্রাণীটাকে নিয়ে যার খুব মাতামাতি
রিঙ্কি নামের সেই মেয়েটার মাথাতে কেবলই হাতি

নিজের ছোট্ট ঘরের দেওয়ালে একটুও নেই ফাঁকা
যেদিকে তাকাও চোখে পড়ে যাবে অসংখ্য হাতি আঁকা
হাতিছাপ জামা হাতিছাপ ব্যাগ হাতিছাপ ভরা বই
জনে জনে বলে হাতি দিয়ে আমি পৃথিবীটা ভরাবোই

সেদিন পাড়াতে ডালপালা ঘাড়ে এসেছে বিশাল হাতি
কাছ থেকে দেখে রিঙ্কির মত পাল্টালো রাতারাতি
বাবাকে বলল, একঘর ভরে একটাই হাতি দিয়ে
আমরা তাহলে থাকবো কোথায় কাজ নেই হাতি নিয়ে

হাতি ছেড়ে তাই রিংকি হয়েছে পিঁপড়ের কারবারী
মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে দিতেই এল তারা সারিসারি
এল লাখে লাখে এলো কোটি কোটি শুরু হলো তাণ্ডব
ঘরে ঢুকলেই রেগে ছেঁকে ধরে ঢোকাই অসম্ভব

ঠোঁট কামড়িয়ে পিংকি এখন ভাবছে যে কাকে নেবে
কাকে নিয়ে সুখে ঘর করা যায় পাচ্ছে না কিছু ভেবে

ছবিঃ সৌভিক

মক্ষিরানি

সংহিতা

মক্ষিরানি লক্ষীসোনা যক্ষরাজার আলং ঝালং বউ
সন্ধেবেলা রুটির সাথে খচমচিয়ে খাচ্ছিল সে মৌ
তার পুষ্যি কুকুরছানা বাগানপানে চেয়ে চেয়ে গাইছিল ঘৌঘৌ
দুঃখী যত দুখ তাড়াতে লম্ফ দিয়ে খুশি খুশি নাচছিল যে ছৌ

রোদ লুকোল মেঘের বুকে আঁধার ছুঁল বনের মাটি
মক্ষি গেল হকচকিয়ে ছুটল ফেলে খেলনাবাটি
কুকুর- টুকুর লেজ গুটিয়ে বাগান থেকে বাসার দিকে দৌড়
মক্ষিরানি লক্ষীসোনা যক্ষরাজার আলং ঝালং বউ

তারপর সেই ভীষণ রাতে বড়াম বড়াম বজ্রপাতে
মক্ষিরানি কাঁপল শীতে কক্ষ মাঝে যক্ষ সাথে
কুকুর তখন কুণ্ডলীতে ভয়ের সুরে তান করে কৌঁ- ওঁ
মক্ষিরানি লক্ষীসোনা যক্ষরাজার আলং ঝালং বউ

জল থইথই উঠোন- দাওয়া মুখে দুধ খই, পেটে ঘুরপাক
যক্ষ তবু আপিসে যায় মক্ষি রাঁধে ঝাল কচুশাক
কুকুর আবার লেজ নাড়িয়ে ওম জড়িয়ে উঠল ডেকে ভো- ঔ
মক্ষিরানি লক্ষীসোনা যক্ষরাজার আলং ঝালং বউ

ছবিঃ সোমা

রবি ঠাকুরের ব্রেকফাস্ট

অমিতাভ প্রামাণিক

রবি ঠাকুরের প্রাতরাশ ছিলো
বড়ো গোলমেলে, দারুণ জোরালো!
প্রতি রাত্তিরে লুচিগুলো বেলে
মৃণালিনী ভাতে জল দিতো ঢেলে
প্রত্যূষে উঠে রবীন্দ্রনাথ
ঘি দিয়ে খেতেন সে পান্তাভাত!
তার সাথে কিছু মুড়কির মোয়া,
গুলাব জামুন, নাকি পান্তোয়া!
জ্যোতিদার বৌ পুঁছে দিয়ে ডেস্ক
সাজিয়ে রাখতো দুধ- কর্ণফ্লেক্স।

সঙ্গে মাখন, ক্ষীর- ননী- ছানা,
বড় এক গ্লাস শ্রীফলের পানা!
আদা- চা- র সাথে ভরে দুই প্লেট
তাঁকে দেওয়া হতো কিছু মামলেট।

কুড়ি- বাইশটা মরশুমী ফল,
তার সাথে সেই হলুদ তরল!
সাথে ডালমুট আর চানাচুর,
কিছু কিশমিশ, কিছু ঝোলাগুড়!

বুধুয়া আনতো ভর্তি বোঁচকা
আলুকাবলি ও রসালো ফুচকা!
দেবেন্দ্রনাথ ডাকতেন, রবি
ধোসা বেঁচে গেছে কয়েকটা, খাবি?

অবন ঠাকুর বলতো, ছোটকা,
খেয়ে নাও নাগো মাছের পটকা!
এই সব খেয়ে পায়খানা গিয়ে
খিদেটা আবার উঠতো চাগিয়ে!

হাঁক পাড়তেন, কোথা গেলি বেণু
রিপিট কর তো কয়েকটা মেনু!
খেয়ে, পান করে সকাল বেলায়
দুটো হজমোলা, জিভের তলায়!

খেতেন বলেই অমন সাইজ
ভুরি ভুরি খ্যাতি, নোবেল প্রাইজ!

ছবিঃ সৌভিক

আষাঢ়ে গপ্পো

জ্যোতির্ময় দালাল

দিনটা ছিল গেল বছর আষাঢ়মাসের গোড়ার দিক
ভরসন্ধেয় বাসায় ফিরে ভেজিয়েছি যেই দোরটা, ঠিক
তক্ষুণি হায় ঝপাস্ করে লোডশেডিং- এ ডুবলো পাড়া
হাতড়ে পেতে টর্চ - দেশলাই ঘাম ছুটিয়ে হলাম সারা!
বাইরে ছেড়ে প্যাচপ্যাচানো কাদায় ভরা "পাদুকা- দ্বয়"
সটান হলুম তক্তপোষে, ভ্যাপসা গরম আর কতো সয় !
জানলাটা তাই দিলাম খুলে, শুলাম এবার ছড়িয়ে ঠ্যাঙ
বাইরে তখন ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি - ঝিঁঝিঁ - গ্যাঙর গ্যাঙ!
হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে বাইরে গেল দৃষ্টি যেই
চাটুজ্জেদের বাড়ির ছাদে নাচছে কে ও তা ধেই ধেই ?
চমকে দেখি কচলিয়ে চোখ - সন্দেহ নেই, নয় কো ভুল
লিকলিকে এক ছায়ার শরীর, আলুথালু মাথার চুল!
ঠাওর করি - নয় সে একা, আরো কী সব কালচেপানা
কিলবিলিয়ে উঠছে নড়ে জমাট বেঁধে আঁধারখানা ।
ইলেকট্রিকের তারের খুঁটি, অ্যান্টেনাটার মাথার ' পরে
আঁধার- ছেঁড়া ঝাপসা দেহ দোলাচ্ছে ঠ্যাঙ আয়েশ করে!
এই কি তবে সেই ' তেনারা' - কৃপা করে দিলেন দেখা ?
চক্ষুদুটি ছানাবড়া - মুখখানি হাঁ, ভ্যাবাচ্যাকা!
এক নিমেষে দরদরিয়ে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে
ঠকঠকিয়ে কাঁপছি, মাথার চুল গেছে ভাই দাঁড়িয়ে ভয়ে!
চাইছি মনে করতে তখন - কী যেন বেশ মন্ত্রখানা,
জপলে ' পরে ' ফুস্' করে সব ভ্যানিশ হবে দত্যিদানা!
কিন্তু ভায়া, মগজ- দোরে ঝুলছে তখন বেঢপ তালা,
স্মৃতির ভাঁড়ার শূন্য, চোখে দেখছি সর্ষেফুলের মালা ।
এমন সময় খ্যানখেনে এক কন্ঠ শুনি কানের পাশে
হেঁচকি তুলে উঠলো পিলে লাফিয়ে দু- হাত, বিষম ত্রাসে!

" একুশ শতক চলছে বাপু, মিছেই এখন রাম- কে ডাকো
' ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না' - কো!
এই যে পোড়া বিজলি বাতি ছড়িয়ে রাতেও আলোর ধারা
শহর থেকে ঘাড়টি ধরে করলো মোদের বাস্তুহারা ।
তাই বলে কি গোল করেছি রেল রোকো বা ব্রিগেড ডেকে?
মিথ্যে ভয়ে ঘামছো, মোরা ভদ্র বাপু তোদের থেকে!
আজকে অনেক দিনের পরে আষাঢ় মাসের সন্ধেবেলা
বিগড়ে গেছে ট্রান্সফর্মার, তাই আমাদের খুশির মেলা।
বিষ্টিভেজা নিকষ কালো অন্ধকারে আমরা রাজা
ছায়ার থেকে ঘনীভূত ভূত হওয়া ভাই দারুণ মজা ।
তাই এত আজ ফুর্তি মোদের - নাচছি তা তা ধিনতা ধিন্
কে জানে ভাই ভাগ্যে আবার জুটবে কবে এমন দিন !
ইচ্ছে হলে চক্ষু মেলে দ্যাখো মোদের রাজ্যপাট
নবীন প্রবীণ অশরীরীর সমাগমে চাঁদের হাট!"
ধাতস্থ হই শুনে খানিক নয় তাহলে খতরনাক
ভেবেছিলুম যেমনধারা - জানলা তবে খোলাই থাক ।
দেখনু চেয়ে, হাজির হলেন নানান মাপের অশরীরী
ঘাড় বাঁকা, কেউ কোমর ভাঙা, দন্তপাটির দারুণ ছিরি!
কন্ধকাটাও আছে, কারোর দু- একখানা হাত পা নেই
প্রবল কাশির শব্দ শুনে চমকে উঠি - হারিয়ে খেই ।
থুথথুরে এক বৃদ্ধা হাজির ভর করে তাঁর লাঠিগাছে
" শ্যাওড়া গাছের ঠানদি ইনি" - শুনতে পেলাম কানের কাছে!"
তাকিয়ে দ্যাখো মামদোসাহেব শীর্ষাসনে গাছের ডালে
' উৎকোচজ্ঞ' ডাকসাইটে মামু ছিলেন জীবৎকালে ।
দেখল সবাই এক সকালে গাছের ডালে তেনার লাশ
ঝুলছে, মাথা নিচের দিকে, লটকে পায়ে দড়ির ফাঁস।
তখন থেকেই এন্ট্রি নিয়ে এই দুনিয়ায়, আপনমনে
মামদোসাহেব থাকেন ঝুলে গাছের শাখায় শীর্ষাসনে !
গণশা ছিল রেলের হকার - করতো ফিরি খেলনাপাতি
ফসকিয়ে হাত চাকার নিচে - বাড়ল মোদের একটি সাথী !

এই সেদিনও কল্লোলিনীর ঢাকনা খোলা মৃত্যুপথে

পাতালপ্রবেশ অনাথ শিশুর - নেই সে খবর কাগজেতে ।
পরীক্ষাতে রেজাল্ট খারাপ - বাবামায়ের শাসন কড়া
পালিয়ে ' বাঁচে' অনেক শিশু দিয়ে প্রাণের মূল্য চড়া ।
ঠানদিদিকে ঘিরে তারা ঐ যে দ্যাখো ছাদের কোণে
শুনছে বসে এ জগতের অ- রূপকথা আপন মনে।"
হঠাৎ দেখি ঠানদিদি সেই গল্প বলা থামিয়ে রেখে
করলো শুরু কাশতে আবার, মুখে থানের আঁচল ঢেকে।
ব্যাপার দেখে হুড়মুড়িয়ে দৌড়াল যে যেথায় ছিল
কন্ধকাটা বলল, " এ কী! ঠানদি বুঝি আবার ম' ল !
থামিয়ে কাশি ঠানদি বলে, " মামদো, বাছা যা শুনে
এ যাত্রাতে তুলছি পটল - বঙ্কা- কাশি, হাঁপ টানে ।
কলকেতার এই পলিউশানে ছাড়বে এবার নিয়েই জান
চাস্ বাঁচাতে নেহাৎ যদি - ইনহেলারটা কিনেই আন ।"
মামদো বলে , " ও হাঁপানি ইনহেলারের কম্মো নয়
' এরোসল' আর ' স্মগ' ভরেছে আজকে বাতাস শহরময় !
মানুষ হলে গিয়ে টেঁসে পড়বে ঢি ঢি ভূতের দেশে
তার চে' আঁটো গ্যাস মুখোশ আর প্রদূষণের নেই কো ভয়" ।
দেখে শুনে ততক্ষণে চক্ষু আমার চড়কগাছ
কানের কাছে ফ্যাঁসফেঁসে স্বর, " করছো ব্যাপার খানিক আঁচ?
হঠাৎ চোখে লাগল ধাঁধা - উঠল জ্বলে বিজলি বাতি
তাকিয়ে দেখি, ভূতবাবাজী ভ্যানিশ - নিয়ে সঙ্গীসাথী !!

ছবিঃ সৌভিক

সূর্যমুখী

জামাল ভড়

সূর্যমুখী পূর্বমুখী হলুদরঙা ফুলগুলি
প্রশমিত সুরভিত , সূর্য দেখে মুখ তুলি
সোনা- রোদে খোশ- আমোদে সিনান করে রবি- করে
খুশবু ছড়ায় মৃদু বায়ে খুশী মনে ভক্তিভরে ।
আসছে ছুটে মৌমাছিরা আসছে ছুটে প্রজাপতি
বসছে তারা হাসছে তারা গাইছে তারা প্রভাতগীতি ;
বিকালবেলায় মত্ত খেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি
দোয়েল ওড়ে শালিক আসে ফিঙে দেখায় রক্ত- আঁখি ;
সাঁঝের বেলায় জোছনা নামে , সূর্যমুখী ফুলগুলি
খুশীমনে ঘুম ভুলে সব করছে যেন কোলাকুলি ।

ছবিঃ সোমা

এক অটোওয়ালার গল্প

টাইটান ইন্ডাস্ট্রিজ- এর চাকুরে শ্রী শুভেন্দু রায় মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। কিছুকাল আগে এক রবিবারের সকালে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে শুভেন্দু বান্দ্রা থেকে আন্ধেরি আসতে গিয়ে তিনি একটা অটো ভাড়া করেন।

অটোতে উঠে গুছিয়ে বসবার পরে প্রথমেই তাঁর নজর পড়লো গিয়ে কয়েকটা ম্যাগাজিনের দিকে। ড্রাইভারের সিটের পেছনে এরোপ্লেনের সিট পাউচের ঢঙ- এ তৈরি ব্যাগে রাখা রয়েছে সেগুলো, যাত্রীর পড়বার জন্য। মাথা তুলতেই দেখা গেল সামনে একটা ছোট্ট টেলিভিশন সেট লাগানো আছে। তাতে দূরদর্শন চ্যানেল চলছে। খানিক বাদেই শুভেন্দুবাবুর স্ত্রীর নজরে পড়লো, তাঁদের পায়ের কাছে একটা ছোট ফার্স্ট এইড বক্স রাখা। খুলে দেখেন তার ভেতরে তুলো , ডেটল, নানা ওষুধপত্র গুছিয়ে

রাখা রয়েছে। এইবারে কৌতুহলী হয়ে শুভেন্দুবাবুরা চলন্ত গাড়ির মধ্যে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখেন, তাদের চারপাশে গাড়ির দেয়ালে লাগানো আছে রেডিও, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, দেয়ালঘড়ি, ক্যালেন্ডার। রয়েছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও শিখ ধর্মের প্রতীক। তার পাশাপাশি রাখা রয়েছে ২৬/১১-র মুম্বাই উগ্রপন্থী হানার সময়ের ভারতীয় বীর কামতে, সালাসকার, কারকারে ও উন্নিকৃষ্ণণের ছবি।

প্রথমে একটু বিদ্রূপের ভাব এসেছিলো শুভেন্দুর মনে। কিন্তু অটোওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর সে ভাবটা উবে গেলো। জানা গেলো, এক প্লাস্টিক কারখানার প্রাক্তন এই কর্মী, আট বছর আগে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অটো চালানো শুরু করেন। দুটি ছেলেমেয়ে তাঁর ইশকুলে যায়। সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি এই অটোই তাঁর বাড়িঘর। কাজে কোন ফাঁকি দেননা তিনি, শুধু দিনের অধিকাংশ সময়টা যেখানে থাকেন সে জায়গাটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। যাঁদের সেবা করে তাঁর সংসার চলে তাদের একটু সুখস্বাচ্ছন্দের খেয়াল রাখেন। সেই করতে গিয়ে অটো রিকশাটি তাঁর এতো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

অটো চালানো ছাড়া আর কী করো? প্রশ্নের উত্তরে সে হেসে জানালো, “অবসর আর কোথায় সাহেব? তবে হপ্তা দু হপ্তায় একদিন একটু সময় বের করতে পারি যদি তাহলে বৃদ্ধা মহিলাদের একটা আশ্রমে গিয়ে সময় কাটিয়ে আসি একটু। যেটুকু পয়সা জোটে তাই দিয়ে তাদের ব্রাশ, পেস্ট, সাবান, মাথার তেল এইসব কিনে দিয়ে আসি। ওনাদের ভারি কষ্টে দিন চলে তো স্যার!”

বলতে বলতেই একগাল হেসে গাড়ির মিটারের নীচে লাগানো নোটিশবোর্ডের দিকে দেখিয়ে দেয় সে। সেখানে লেখা,

“বয়স্ক মানুষ ও বিকলাঙ্গ মানুষদের জন্য ভাড়ায় শতকরা পনেরো শতাংশ ছাড়। অন্ধ মানুষদের জন্য পঞ্চাশ টাকা অবধি বিনামূল্যে সফর------ -“অথচ সে নিজেই ভারি গরিব মানুষ! কোন দামি ইশকুলেও পড়েনি। তবু, এমন সব লোকজন আজও আমাদের দেশে আছে বলেই তো আমরা আজও আমাদের দেশটা নিয়ে গর্ব করতে পারি! মুম্বাইয়ের সেই নাম না জানা অটোওয়ালাকে জয়ঢাক সেলাম জানায়।

ধাঁধা

এবারের প্রথম দুটো ধাঁধা যারা অংক ভালোবাসে কেবল তাদের জন্য। যদি তোমার অংক দেখলে গায়ে জর আসে তাহলে প্রথম দুটো ধাঁধাকে বাদ দিয়ে পরেরগুলো দেখো।

শুরু করছি মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে। বাগদাদ শহর থেকে হাজার কিলোমিটার মরুভূমি পেরিয়ে এক মরুদ্যানে মোল্লার খেজুরবাগান। সেবারে তার বাগানে তিন হাজার পুঁটুলি খেজুর হয়েছে। মোল্লার একটা উট আছে। সেটা একবারে হাজার পুঁটুলি অবধি খেজুর বইতে পারে, আর প্রতি দু কিলোমিটারে এক পুঁটুলি খেজুর খায়। খেজুর ছাড়া সে দেশের উট আবার আর কিছু খেতেই পারে না। এক পুঁটুলি খেজুরের দাম তিন গিনি, ভাড়ার উটগাড়িতে মরুদ্যান আর বাগদাদের মধ্যে মাথাপিছু একপিঠের ভাড়া ষোল গিনি আর একটা উটের দাম দেড়শো গিনি হলে মোল্লা সেবার ব্যবসায় আয় করবে কতো বলো তো? এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা**।

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

ছোটোবেলায় আমরা যে ইশকুলে পড়তাম সেখানে সেবারে ক্লাশ এইটের ক্লাশ শুরুর প্রথম দিন গিয়ে দেখি নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছে। তা, সে যে এমন পাগল তা কে জানতো! আমরা এক হাজার ছাত্র প্রেয়ারের শেষে এসে হোস্টেলের লকার রুমে জড়ো হয়েছি যার যার লকারের চাবি নেবার জন্য। সেখানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য এক একটা লকার থাকে। তাতে সে তার জিনিসপত্র চাবি দিয়ে রাখতে পারে। প্রথম ক্লাশের দিনে ছাত্রদের মধ্যে তাদের লকারের চাবি বিলি করাটা ছিল সে ইশকুলের রেওয়াজ। তা আমরা সবাই জড়ো হতে তিনি বললেন, কি যেন এক ভয়ানক অংকের ফরমুলা তিনি আবিষ্কার করতে চলেছেন, আর তাই দিয়ে দেশের খুব উন্নতি হবে। সেই জন্য একটা পরীক্ষা করতে চান তিনি। সেটা এইরকম--প্রথম ছাত্র গিয়ে সবকটা লকারের দরজা খুলে দেবে। দ্বিতীয় ছাত্র গিয়ে প্রতি দ্বিতীয় লকারের দরজা বন্ধ করে দেবে। তৃতীয়জন গিয়ে যদি প্রতি তৃতীয় লকারটা খোলা পায় তাহলে বন্ধ করবে আর বন্ধ পেলে খুলে দেবে। চতুর্থজন গিয়ে প্রতি চার নম্বর লকারের সঙ্গে সেই একইরকম ব্যবহার করবে--- এইভাবে হাজার নম্বর ছাত্র অবধি চলবে ব্যাপারটা। প্রিন্সিপ্যাল জানতে চান শেষ অবধি ঠিক কটা লকার খোলা থাকবে এই পদ্ধতিতে। এতে যে কী ভীষণ

আবিষ্কার হল তা জানিনা, কিন্তু সেদিন গোটা দিনটাই আমাদের মাটি হয়ে গিয়েছিল এই কর্ম করতে গিয়ে। তা, বলো দেখি শেষমেষ ঠিক কটা লকারের দরজা খোলা ছিলো?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

বোস মিউজিক-এর মালিক সুধন্য বোস সন্ধেবেলা দিল্লির ফ্লাইট ধরবার জন্য অফিস থেকে বের হচ্ছেন এমন সময় নাইট ওয়াচম্যান হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, 'স্যার, আপনি কি সন্ধে সাতটা সতেরোর ফ্লাইট ধরে দিল্লি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।, কেন বলো তো?'

'না স্যার, আপনি টিকেট বদলান। ও ফ্লাইটে যাওয়া আপনার হবে না।'

সুধন্যবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন,'কেন বলুন তো?'

'না, মানে আমি গত তিনরাত ঘুমিয়ে পরপর একই স্বপ্ন দেখেছি--দুরদর্শনে বলছে সতেরো তরিখের সাতটা সতেরোর কলকাতা-দিল্লি ফ্লাইট ক্র্যাশ করে সবাই মারা গেছে। আপনি ওর পরের কোন ফ্লাইটে যান স্যার। গরিবের কথাটা রাখুন।'

সুধন্যবাবু একটু সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। কথাটা শুনে কী মনে হতে টিকেট বদলে রাত আটটা ঊনিশের ফ্লাইটটা ধরলেন। দিল্লিতে নেমে ঘন্টাখানেক পরে জানা গেল সাতটা সতেরোর ফ্লাইটটা লক্ষ্ণৌয়ের কাছে ভেঙে পড়েছে।

ডুডলঃ

এটা কীসের ছবি?

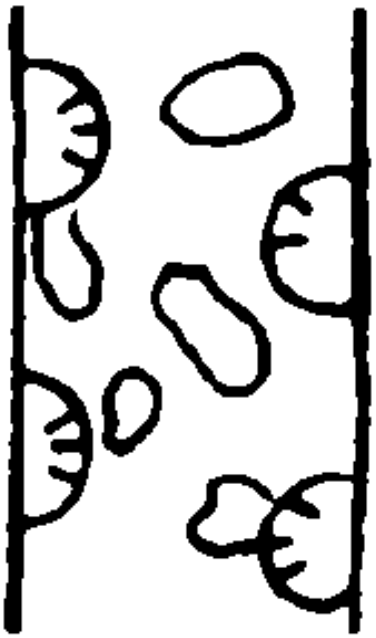

পরদিন সুধন্যবাবু ফিরে এসে নাইট ওয়াচম্যানকে অনেক টাকা পুরষ্কার দিয়ে বরখাস্ত করে দিলেন। কেন?

চতুর্থ ধাঁধাঃ

'তোর বাগানে হাঁটতে যাবো' বললে হবে মিথ্যে বলা,তবুও তোর বাগান জুড়ে হতেই পারে আমার চলা,জিভের ডগায় আভাস পাবো পায়ের আওয়াজ মিলবে যেই, আমার মুখে মৃত্যু আছে আমার মুখে মৃত্যু নেই।

কুইজঃ

১। বাতাসের চাপ মাপে কোন যন্ত্রে?
২। 'অ্যাংস্ট্রম' কীসের একক?
৩। ভূমিকম্প মাপবার স্কেল কোনটা?
৪। টাইপরাইটার কে আবিষ্কার করেছিলেন?
৫। মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের মডেল কে প্রথম বানান?

৬। টেলিভিশনের আবিষ্কারক কে?
৭। ব্লেজ পাস্কাল কী আবিষ্কার করেছিলেন?
৮। প্রথম আলোর বেগ মেপেছিলেন কে?
৯। ইউরেনাসের আবিষ্কর্তার নাম লেখো।
১০। স্টেথোস্কোপ কে আবিষ্কার করেন?

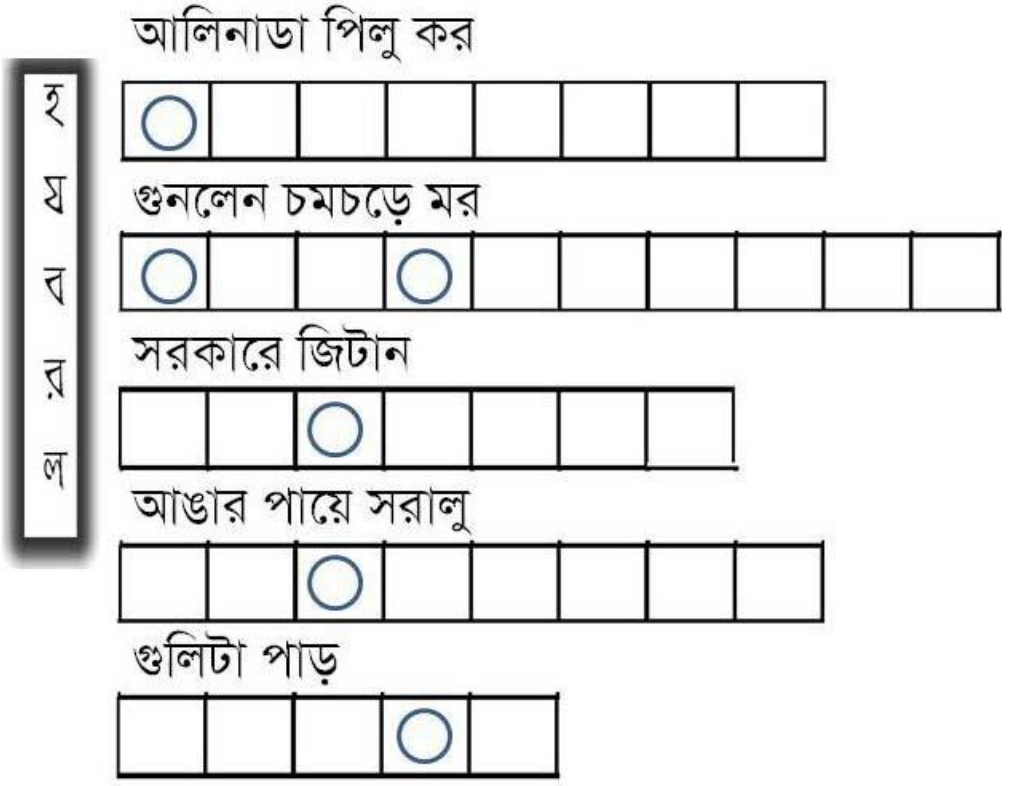

এবারে গোল দেয়া অক্ষরগুলো দিয়ে এই প্রশ্নটার জবাব তৈরি করোঃ
দোতলার রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে জগা
পাগলা কী বলে চিৎকার করেছিলো?

অবিশ্বাস্যঃ

এই অত্যাশ্চর্য মাছ ধরার ছবিটা দেখো। সংগ্রহ করে দিয়েছে মহাশ্বেতা।

জানো কি?

১। একটা গরু সারাজীবনে দু লক্ষ গেলাস দুধ দিতে পারে।
২। একটা ম্যাকাআরেল মাছ একবারে ৫ লক্ষ ডিম পাড়ে।
৩। এখনো অবধি সবচেয়ে বড়ো শুয়োরটা হল, ১৯৩৯-এ উত্তর ক্যারোলিনার ব্ল্যাক মাউন্টেন এলাকায় পোষা বিগ বয় নামের একটা শুয়োর। তার ওজন ছিলো ১৯০৪ পাউন্ড।

৪। ৭০১টা বিশুদ্ধ প্রজাতির কুকুর আছে দুনিয়ায়।
৫। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু যে প্রাণীর আক্রমণে ঘটে সেটা হল মশা।
৬। পিঁপড়েরা কখনো ঘুমোয় না।
৭। ফিতেক্রিমি এক ইঞ্চির পঁচিশ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে ৫০ ফিট অবধি লম্বা হতে পারে।
৮। সাপ কখনো নিজের কামড়ে মরে না, সে যতই বিষ ঢালুক না কেন?
৯। বেড়ালের গলা থেকে অন্তত একশো রকমের শব্দ বের হয়। কুকুরের আছে মোটে দশটা শব্দ।
১০। চিংড়ি মাছের হৃৎপিণ্ড থাকে তার মাথায়।

মজার ইন্টারনেটঃ

১। এসো কমিকস বানাইঃ

কমিকস পড়তে ভালোবাসো যারা তারা এই সাইটটাকে পছন্দ করবেই। কারণ এতে নিজের ইচ্ছে মতো কমিকস সৃষ্টি করতে পারবে তুমি মাউসের খোঁচায়। পাবে রেডিমেড অজস্র চরিত্র। তারা তোমার তৈরি গল্পের অপেক্ষায় আছে। তৈরি করো মনের মতো গল্প, তারপরে এই সাইটে এসে তৈরি করো তার কমিকস রূপ, তারপর চাইলে জয়ঢাকে পাঠিয়ে দিতে পারো তোমার তৈরি কমিকস। চেষ্টা করে দেখবে নাকি একবার?

http://superherosquad.marvel.com/create_your_own_comic

২। কুমড়ো আর্টঃ

কোন ফুল ভালোবাসি জিজ্ঞাসা করায় আমি একবার একজনকে বলে ফেলেছিলাম ফুলকপি। শুনে তো সে আমায় মারতে কেবল বাকি রেখেছিলো। বলে, ‘কি পাষণ্ড রে তুই?’ তা আমি যদি বলি, কুমড়ো দিয়ে ভাস্কর্য বানাতে হবে তাহলে তোমরাও বোধ হয় আমাকে সেরকম কিছু একটা করে বসবে আবার। বলবে, ‘কুমড়ো!? ছ্যা ছ্যা। ওই ফলতু সবজি দিয়ে আবার ভাস্কর্য কী?’

বিশ্বাস করো , কুমড়ো থেকে যে কতো অসমভব সুন্দর এবং অসমভব মজার সব ভাস্কর্য তৈরি হতে পারে সে ব্যাপারে আমারও এর আগে কোন ধারণাই ছিল না-- মানে এই সাইটটা দেখবার আগে। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই দেখে নাও না!

http://www.creatingreallyawesomefreethings.com/2011/09/20-unique-pumpkin-ideas.html

কীসের ফোটো

মজার খেলা

টুকরোগুলো জুড়ে একটা মোবাইল ফোন বানাতে হবে

গত সংখ্যার উত্তর;

ধাঁধার উত্তর:

১। যেকোন একটা লোককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে সূর্য কোনদিকে ওঠে। উত্তরে সে পুবদিকে বললে, সেদিকের রাস্তাটা ধরবে। নচেৎ উল্টোদিকের রাস্তাটা ধরতে হবে।

২। প্রথমে দেশলাই কাঠিটা জালাতে হবে।

৩। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। খেয়াল করে দেখো, প্রথম ও দ্বিতীয়কে এক নম্বর ঘরে রেখেছে। তারপর তিন থেকে ন নম্বর লোককে সে আলাদা ঘর দিয়েছে। তারপর দশম বলে শেষ ঘরটা সে যাকে দিয়েছে সে হল আসলে দ্বিতীয় লোকটা। আসল দশম লোকের কোন ঘর মেলে নি।

কুইজের উত্তর: শান্তা, ঋষ্যশৃঙ্গ, গণেশ, রতি, বীরভদ্র, ঘটৎ কোচ, বক, দশরথ, ঋষ্যশৃঙ্গ, পাঁচ শবর ও তাদের মা। আগুন লাগবার দিন পাণ্ডবরা তাদের নেমন্তন্ন খেতে ডেকে এনে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে রেখে পালিয়ে যান যাতে তারা পুড়ে মরলে লোকে ভাবে পাণ্ডবরা মা কুন্তিসহ পুড়ে মরেছে।

ডুডলের উত্তর:

একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেঁচো

একটা ব্লেডের ওপর দিয়ে যাবার চেষ্টা

করে চলেছে।

হযবরল-র উত্তর:

বাস্তবপক্ষে, সসাগরা ধরণী, পরার্থে জীবনদান, একেবারে ভণ্ড, বেলতলাতে নেড়া

প্রশ্নের জবাব: তেতলা বাসভবন

কীসের ফটো: এরোপ্লেনের ককপিট

মজার খেলার উত্তরঃ

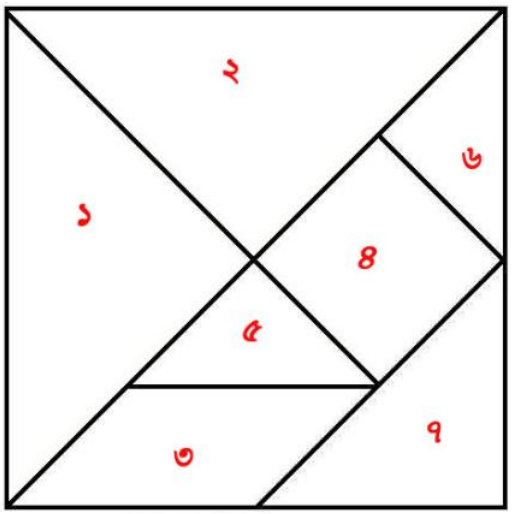

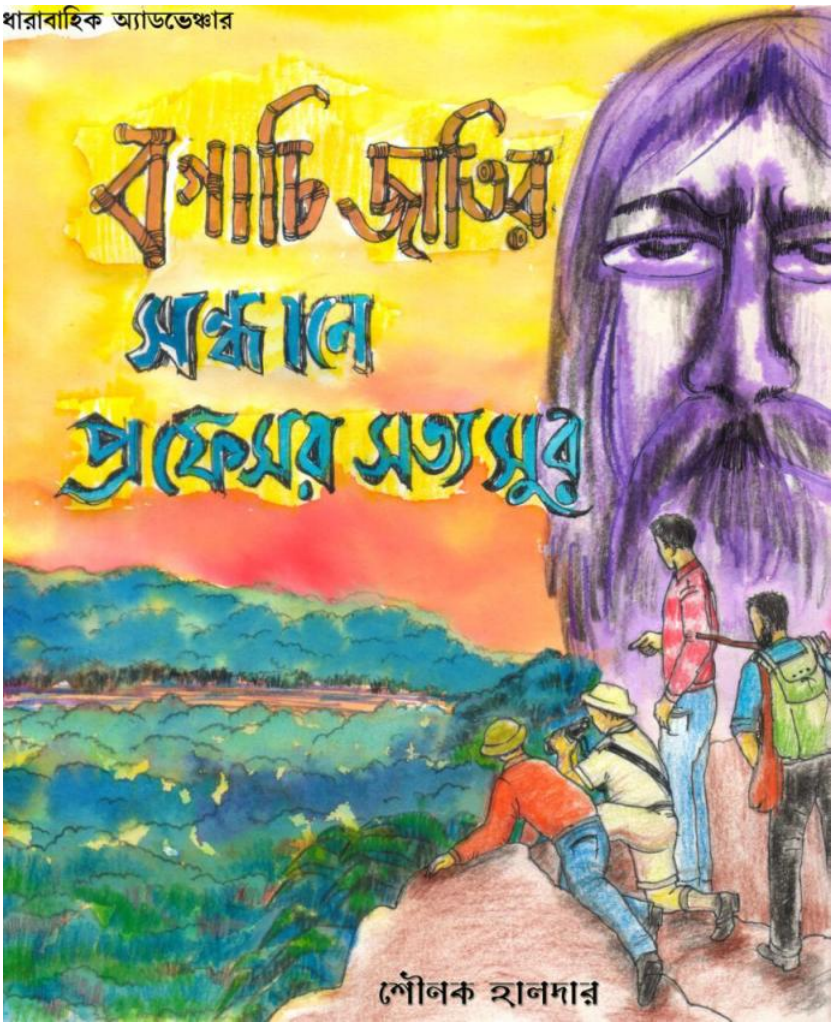

বর্মামুলুকের পাহাড়ে হারিয়ে যাওয়া ইহুদিদের এক শাখার খোঁজে বের হয়ে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা, স্থানীয় গাইড থাঙ্গার সঙ্গে মিজোরামের বনপাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এসে পৌঁছেছে আচাই জাতির মানুষদের আড্ডায়। সেখানে দুদিন থাকবার পর জানা গেল, নীলপর্বতের মাথার অজানা বাসিন্দাদের গ্রাম প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলের নিচে তলিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে সেই হ্রদের পাড়ে আজও মায়াবিরা ঘুরে বেরায়। অভিযাত্রীরা রওনা হলেন সেইদিকে। তারপর----

২৫শে মে

আজ প্রায় ছ মাস হয়ে গেল আমরা মিজোরাম ছেড়ে এসেছি। অভিযানের শেষ অংশটা ভুলতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ছমাসেও কই ভুলতে পারলাম? অভিযাত্রী ক্লাবের নির্দেশে তাই সেই শেষ পর্বটা আজ লিখতে বসেছি।

প্রথমদিন

আচাইরা মানুষ ভালো। আমাদের যত্নআত্তি করেছিল। আমরা রওনা দিচ্ছি শুনে বাধাও দিয়েছিল সরলভাবে। পরে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে মেনে নিলেও আমাদের ওপর অনেক তুকতাক করেছিল যাতে পথে বিপদ না হয়। শেষ রাতে ভীমরাজপাখির পুজো করে পুরোহিত মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিল। ভাগ্যিস সেইসব শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম !

আচাইদের গ্রাম ছাড়তে নীলপর্বতের খাড়াইটা বেড়ে গেল। আর সে কী গভীর জঙ্গল! অনেকদিন বোধহয় মানুষ বা বড় জন্তুর সেখানে পায়ের চিহ্ন পড়ে নি।

আচাই গোষ্ঠীপতির সঙ্গে কথা বলে গ্রামের সীমানা থেকে একটু উঁচুতে নীলপর্বতের গায়ে আমাদের বেসক্যাম্প পাতা হয়েছিল। থাঙ্গা আমাদের সাথে যাবে না। তাছাড়া

দানিকেনের পা তখনো পুরোপুরি ঠিক হয়নি, জ্বর নেমে গেছিল যদিও। থাঙ্গাকে ওর দায়িত্বে রেখে আমরা ওপরে উঠলাম। অতনুর জ্বর নেই,কিন্তু দুর্বলতা রয়ে গেছে। সবাই বারণ করাতেও অতনু শুনল না। অভিজ্ঞ হিমালয় পর্বতারোহী ,সামনে পাহাড় দেখলে সে কি আর বসে থাকতে পারে? অতনুকে একটা পাতলা বাঁশের লাঠি বানিয়ে দেওয়া হল।অবশেষে আমরা উঠতে শুরু করলাম।

পাহাড়টা বেশ খাড়া। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যে ধরণের চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়, এটা অনেকটা সেরকম। মাথার ওপরে রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ,ঠান্ডাঠান্ডা প্রাণ জুড়ানো হাওয়া। আমাদের পাহাড়ে চড়তে খুব ভালো লাগছিল। চঞ্চলদা হাতে দা নিয়ে এগোচ্ছিল সামনের ঘন লতাপাতা কাটতে কাটতে। হিংস্র জন্তু জানোয়ার নাই বা থাকুক, সাপখোপের অভাব কী? মাঝে মাঝে দানিকেনের অভাব বোধ করছিলাম। একটু জিরোনোর জন্য থামলেই দানিকেন ''দুর্গম গিরি'' গাইতে শুরু করে। বেচারা নিচে কী করছে কে জানে?

কর্ণেল ডেভিড লেভিন প্রায় একশো বছর আগে নীলপর্বতের মাথায় উঠেছিল প্রায় সাত/আট ঘন্টা ক্লাইম্ব করে। আশা করা যাক তখন একটা পায়ে চলা পথ ছিল। সেই হিসাব করলে আমাদের সন্ধের আগেই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছনোর কথা। ধীরে সুস্থেই উঠছিলাম। যত উপরে উঠছি, বন তত দুর্ভেদ্য হচ্ছে, নিস্তব্ধতা বাড়ছে--- আর জীবিত প্রাণীর উপস্থিতি কমে আসছে। একটা গন্ধক মেশানো বুনো গন্ধ পাচ্ছি। আশ্চর্য, একটা পাখিও চোখে পড়ছে না যে!

সূর্যাস্তের আগেই পাহাড়ের ভাঙা মাথায় পৌঁছে গেলাম। দুর্ভেদ্য গাছপালা ছাড়িয়ে হঠাৎই একটা চ্যাটালো জায়গা, তুলনামূলক ফাঁকা আর ছড়ানো। গোষ্ঠীপতির ভূমিকম্পের গল্প যে বানানো নয়, তা স্পষ্ট হল। এবারে সত্যদা তার ভূতত্ত্বের জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে ফেলল। এদিক সেদিক দেখিয়ে নানা ব্যাখা করতে লাগল। অতনু এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আস্তে আস্তে বলল, ''অধিরাজ বলতো, সত্যদা আসলে ঠিক কী বিষয়ে নিয়ে পড়াশুনা করেছিলো?''

সত্যদার কানে গেল কথাটা। বললো, ''অতনু তোর যে ভূতত্ত্বের ডিগ্রি আছে, সেটা আমি জানি। তবে জানিস তো, পড়াশুনাটা শুধু ডিগ্রিতে আটকে থাকলে চলেনা - তার চর্চা না করলে সেটাকে আর জ্ঞান বলে না।''

''আ: সত্যদা, চটছো কেন? তুমি যে প্রফেসর সত্য সেটা তো সবাই জানে--'' অতনু হাসাবার চেষ্টা করলো। তাতে বিশেষ লাভ হল না। মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ''হুম'' বলে সত্যদা তাঁবুর দিকে চলে গেল।

''এদিকে এসো সত্যদা,অতনু,অধিরাজ----সবাই আয়----,'' চঞ্চলদা চ্যাটালো চত্বরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে দূরবীণ চোখে লাগিয়ে আমাদের ডাকছিল। গলাটা খুব উত্তেজিত।

আমরা পৌঁছতেই সত্যদার হাতে দূরবীণটা ধরিয়ে দিয়ে বলল,''সত্যদা এই সেই হ্রদ, যেখানে তোমার বগাচিরা তলিয়ে গেছে।''

সত্যদা তখন উত্তেজনায় ফুটছে। দূরবীণ দিয়ে দেখে এমন একটা লাফ মারল আনন্দে যে দূরবীণটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল।

''পেয়েছি,পেয়েছি!!'' দু হাত তুলে বেঁটেখাটো মানুষটা নাচতে শুরু করে দিল।

''আর্কিমিডিস!''এবারে অতনু গলাটা আরো নাবিয়ে বলল।

দূরবীণ চোখে দিয়ে দেখি,খানিকদূরে নীচে ঝাপসা মেঘের মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা চকচকে জায়গা।জলাশয়, তাতে সন্দেহ নেই।

ঠিক হল কাল খুব ভোরে উঠে চারপাশটা ভালোভাবে সার্ভে করতে হবে,আর কোনো জলাশয় আছে কিনা দেখতে হবে। তারপর হ্রদের দিক ধরে নামতে হবে। আপাতত রাতটা এখানেই কাটাবো।

জায়গাটা অনেক বিস্তৃত আগেই বলেছি। তবে সমান নয়। উঁচুনীচু টিলাতে ভরা। কোথাও কোথাও ফাটলও আছে। একশো বছরে প্রকৃতি লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে অনেকটা। বেশির ভাগ জায়গাতেই বড় বড় গাছ আর লতাপাতায় ঢেকে গিয়েছে। অজানা ফুলের লতাতে ছাওয়া চারপাশ। অচেনা একটা গন্ধ বাতাসে। চারপাশটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে। তাঁবু খাটাতে খাটাতে পশ্চিমদিকে মস্ত সূর্যাস্ত দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এখানে একটা আস্ত গ্রাম ছিল। কিছু মানুষ,তাদের সুখদু:খ আশা আকাংখা,---সব আজ কোথায় মিলিয়ে গেছে। সত্যি তারা কোথায় হারিয়ে গেল? অতনু চুপচাপ

বসেছিল। হঠাৎ বলল, ‘‘দেখেছো তোমরা, এখানে একটাও পাখি নেই! কোনো পোকামাকড়ও চোখে পড়ছে না।অচেনা ফুলের লতা---জায়গাটা কেমন অদ্ভুত লাগছে না?’’

‘‘তাহলে এবারে বলতে শুরু কর মায়া--মায়া--’’
বোঝা গেল সত্যদার অতনুর উপর রাগটা এখনও পড়েনি।

প্রথম রাত

খাওয়াদাওয়ার পরে আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। আশপাশে যখন জন্তুজানোয়ারের আশংকা নেই,তখন আর বাইরে আগুন জ্বালানোর প্রশ্ন উঠল না।বেশ ঠান্ডা।তাঁবুর পর্দা শক্ত করে আটকে আমরা চারজন স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে লম্বা হলাম।

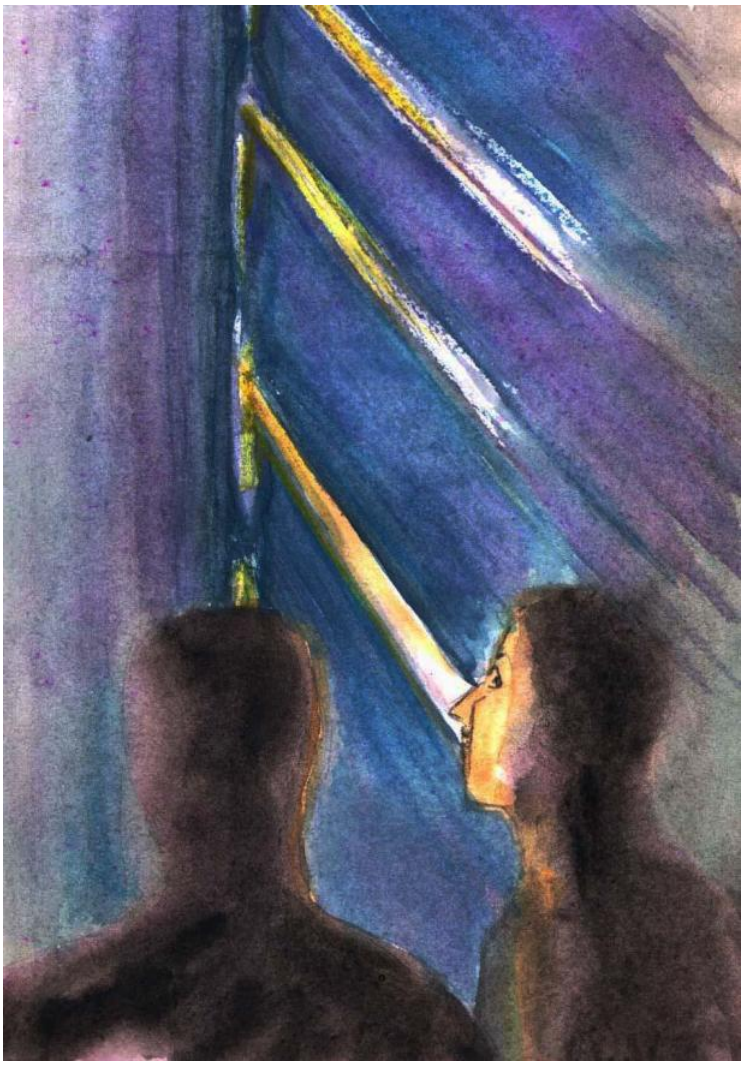

মাঝরাতে একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দূর থেকে কারা যেন ডাকছে! স্বপ্ন দেখছি নাকি? আধাঘুম আধাজাগা অবস্থায় সচরাচর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। তাই চোখদুটো ভালো করে খুলে তাকালাম। সত্যদারা সবাই ঘুমিয়ে। সবার ওপরে সত্যদার ভয়ংকর নাকডাকা চলছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে যেন দূর থেকে আসা স্পষ্ট কোলাহল টের পাচ্ছি। কি ব্যাপার? কোথায় কারা আওয়াজ করছে? স্বাভাবিকভাবেই তাঁবুর দরজার দিকে চোখ গেল। সরু সরু ফাঁক থেকে যেন ভেতরে আলো ঢুকছে! বিদ্যুতের আলো নাকি? আবার কি বৃষ্টি নামল? ভোর হয়ে গেল বুঝি?

অস্বস্তিটা হতেই উঠে পড়লাম। তারপর তাঁবুর দড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। বাইরে হালকা কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার আকাশ। নীচে দূরে কোনো এক জায়গা থেকে আওয়াজটা আসছে। তাকিয়ে দেখি সেই জায়গাটা যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে। ভালো করে তাকালাম। কানটাও খাড়া করলাম। ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি নাকি। পাশে কার হালকা ছোঁয়ায় চমকে উঠলাম। চঞ্চলদা। ফিসফিস করে বলছে, ‘‘আমিও দেখেছি অধিরাজ, আমিও শুনেছি ---ঐ হ্রদের দিক থেকেই আওয়াজটা আসছে।’’

দ্বিতীয় দিন

সে রাত্রে শেষপর্যন্ত কখন এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ঘুম ভাঙল অতনুর ঠেলাঠেলিতে,''ওঠ ওঠ কুম্ভকর্ণ,ভোর হয়ে গেছে---নামতে হবে না?''

''সে কী রে? এই তো ঘুমালাম, এক্ষুনি ভোর হয়ে গেল?''

''চটপট উঠে রেডি হয়ে নে, সার্ভেটা করে ফেল,'' সত্যদার আদেশ এল।

''দরকার হবে না।আমি চারধার তন্নতন্ন করে দেখে নিয়েছি সত্যদা--'' বলতে বলতে তাঁবুতে ঢুকল চঞ্চলদা। মুখ বেশ গম্ভীর।

''চলো নামা যাক। ঐ একটাই হ্রদ। মাঝখানে একটা পাহাড়ের শিরা আছে।ফাটলটা ওখানে কোথায় হবে। নেমে খুঁজতে হবে।ফাটল দিয়ে ওধারে নামলে সম্ভবত হ্রদটা পাবো।-

''নামবার আগে এক কাপ চা খেয়ে নিই জুত করে,'' অতনু সবার হাতে ধোঁয়াওঠা চায়ের গেলাস এগিয়ে দিল।

সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা নামা শুরু করলাম। আবহাওয়া চমৎকার। আকাশ পরিচ্ছন্ন। অতনুও ফিট। নামার মুখে অতনু মোটা গলায় গান ধরল (দানিকেনের অনুপস্থিতিতে)''দূর্গম গিরি কান্তার মরু----''আমরাও গলা মেলালাম।সবারই স্নায়ু টানটান।সবারই গলায় উত্তেজনা। ওঠাটা যত সহজ ছিল,নামাটা ততই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। প্রথমত পাহাড়ের এদিকটা অসম্ভব এবড়ো খেবড়ো। হয়তো নীল পর্বতের মাথাটা ভেঙে এই অংশের উপর দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে গেছে। এত খাঁজওয়ালা, সামঞ্জস্যহীন উঁচুনীচু পাহাড়ের গা সচরাচর আমি দেখিনি।তার ওপরে এখানকার জঙ্গল। এত আদিম ও এত নিবিড় সে জঙ্গল যে ভাবা যায়না! পাহাড়ে ওঠার সময় লক্ষ্যটা উপর দিকে থাকে, তাই ধরে এগোতে হয়। নামার সময় একেবারে নতুন জায়গায় সঠিক নিশানাটায় নামতে ভুল হয় পদেপদে। নামবার আগে আমরা সূর্যের অবস্হান,হাওয়ার গতি, কম্পাসের তথ্য এবং আরো কিছু নিশানার ওপর ভিত্তি করে রুটটা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু নামতে গিয়ে বারেবারে দিক ভুল হয়ে যাচ্ছিল।এরকম সংকটমুহূর্তে সত্যদা,আমদের দলনেতা প্রফেসর সত্য সুরের একটা ট্যালেন্ট আবিষ্কার করা গেল।যখন চঞ্চলদা আর অতনুর মতন পোড়খাওয়া পর্বতারোহী নিশানা ভুল করে হতাশ হয়ে পড়ল,ছোট্টখাটো একটু পরেই তার গমগমে গলা শুনলাম, ''ডানদিকে সরে এসেছি। বাঁদিক ধরে নামতে হবে। একটু পরে বাঁদিকে একটা সুন্দর ঝর্না পড়বে।''

সত্যদা নেমে আসাতে আমরা তিনজন একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলাম।সত্যদা তার চওড়া হাসিটা আর আটকালো না।অতনুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, ''ছোটবেলায় গরমের ছুটিতে গোবরডাঙায় মামারবাড়িতে বেড়াতে যেতাম, বুঝলি তখন সেখানে আম, জাম, জামরুল, লিচুর সিজন। আমি তো সারাদিন গাছেই থাকতাম। এখনো গাছ দেখলে চড়বার লোভ হয়----''

সত্যদার বুকটা গর্বে ফুলে গেল,চোখদুটো ছোটছোট হয়ে গেল আস্তেআস্তে।

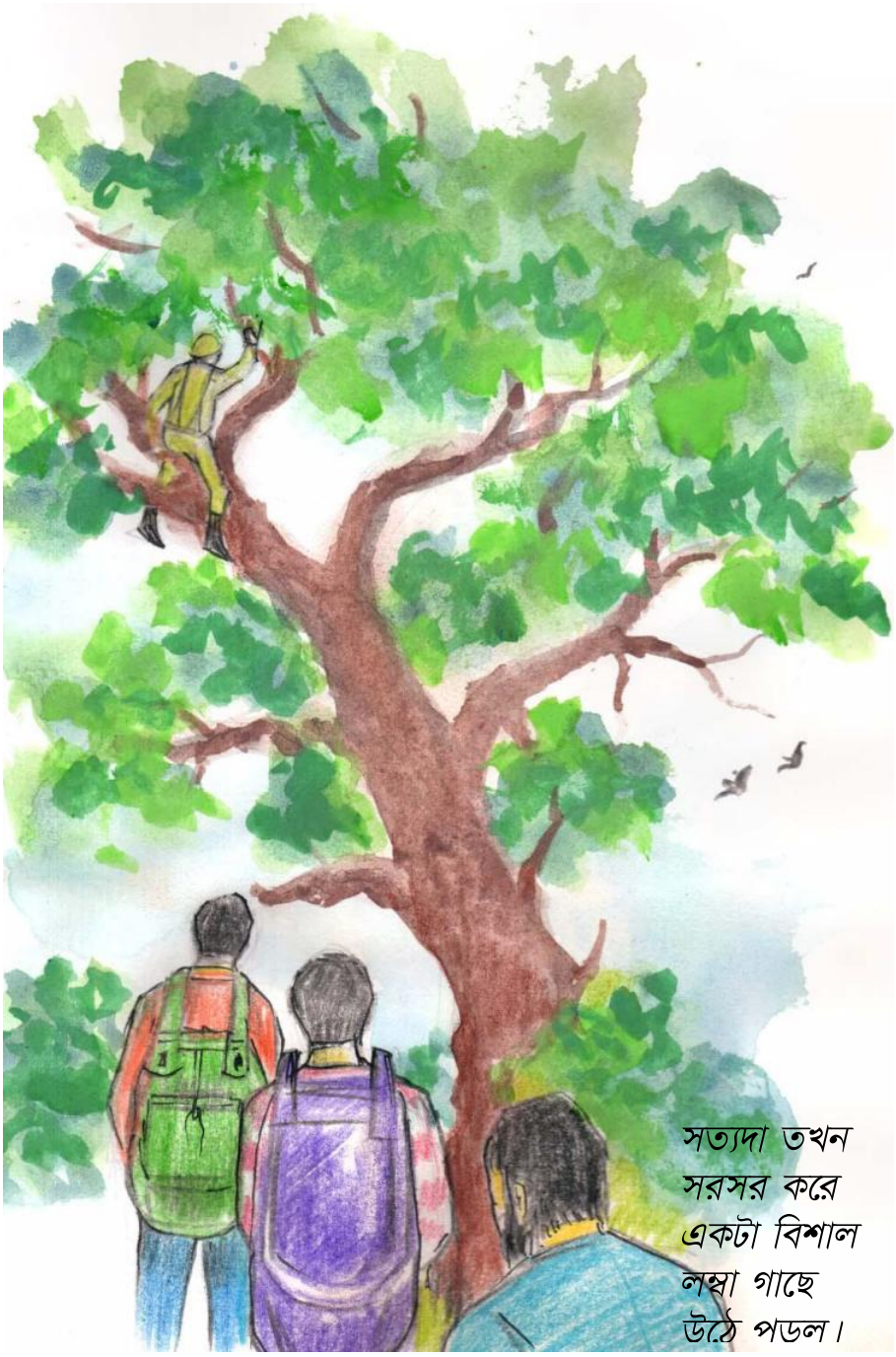

সত্যদা তখন সরসর করে একটা বিশাল লম্বা গাছে উঠে পড়ল।

চঞ্চলদা গিয়ে সত্যদার হাত ধরে বলল, ‘‘থ্যাংক ইউ বস। আবার প্রমাণ করলে যে তুমিই দলনেতা।’’ আমরা ফের এগোলাম।

আধঘন্টা পরে রাস্তার বাঁ দিকে একটা ভারি সুন্দর ঝর্না চোখে পড়ল। পাথরের উপর দিয়ে ভীমবেগে বয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। পিছল পাথরে সাবধানে পা ফেলে আমাদের ঝর্না পেরোতে হল। দুপুরে পাহাড়ের একটা কানাগলির মুখে খেতে বসলাম। সত্যদা আর একবার গাছে উঠে দেখে বলল, ‘‘না, আর কোনো রুট নেই। সামনে পাহাড়ের এই শিরাটা পাঁচিলের মতন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে খাঁজটা পেরোলেই হ্রদটা সামনে পড়বে।’’

মাথার ওপরে সূর্য।অতনু ফের বলল, ‘‘দেখেছো কোনো পাখি নেই, কোনো পোকামাকড়, জন্তুজানোয়ারও চোখে পড়ল না।ভারি অদ্ভুত জঙ্গল।’’

সত্যি বনভূমির স্বাভাবিক শব্দগুলো এখানে নেই।একটা গুমোট থমথমে অবস্থা। হাওয়াও কম। যে রুটে নামলাম, তার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক সংকেত রেখে এসেছিলাম ইচ্ছে করে, যাতে ফিরে যাবার সময়ে অসুবিধা না হয়।

সত্যদা মোটা পেটটা খুলে পাথরের ওপর শুয়ে ছিল।বলল, ‘‘গোষ্ঠীপতির গল্পটা তোরা মনে কর দেখি। ওদের গ্রামের দুজন শিকার করতে নেমেছিল এইখানে। তারপর পাহাড়ের কোনো ফাটল দিয়ে হ্রদের দিকে চলে যায়। তার মানে ফাটল একটা আছেই।

‘‘ঠিক বলেছো। খেয়ে উঠেই ফাটল খুঁজতে হবে দুটো গ্রুপে ভাগ করে---’’চঞ্চলদার গলা, ‘‘কিন্তু সত্যদা, তোমার কি মনে হয় ঐ মানবগোষ্ঠী এখনো বেঁচে আছে?’’

‘‘আলবত বেঁচে আছে। তারা আলাদা থাকতে ভালোবাসত। এখনো গোপনে থাকে। মায়া, ভূত এসব কিছু একটা চালাকি দিয়ে বাইরের লোককে ঠেকিয়ে রাখে।’’

‘‘যাই বল,আচাইরা কিন্তু ওদের সমপর্কে কিছু বলতে ভীষণ ভয় পায়।’’

‘‘সে তো আগেও পেত।ফাদার ফিনিকোর বর্ণনাতেই আছে না?’’

‘‘কিন্তু সত্যদা’’, আমাকে এবার ভূগোলের কিছু জ্ঞান বের করতেই হল, ‘‘এতবড় ভূমিকমপ হল, যেখানে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ভেঙে গেল-তার পরেও একটা আস্ত গ্রাম-শুদ্ধ লোক কী করে বেঁচে থাকে বল তো?’’

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

কাতুকুতু

ক। নতুন রূপকথা

তরুণ ব্যাং রাজপুত্র গিয়েছেন ব্যাং জ্যোতিষীর কাছে—

রাজপুত্রঃ জ্যোতিষী মশাই আমার হাত দেখে বলুন আমি কোন সুন্দরী কন্যার দেখা কবে পাবো?

জ্যোতিষী (মনযোগ দিয়ে হাত দেখে)- অবশ্যই কুমার। খুব শীগগিরিই

আপনি এক পরমা সুন্দরী কন্যার দেখা পাবেন, সে আপনার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী হবে ও আপনার সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চাইবে।

রাজপুত্রঃ আহা, বলুন , কবে , কোথায় তার দেখা পাবো?

জ্যোতিষীঃ আগামি মাসে, ক্লাস ইলেভেনের বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে।

খ। ডাক্তারি

মানসিক রোগিঃ ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান।

ডাক্তারঃ আপনার সমস্যাটা কী?

রোগিঃ আজ্ঞে আমি রাতে ঘুমোতে পারিনা। খাটের ওপরে শুলে মনে হয় খাটের নিচে কে যেন ঢুকে রয়েছে। ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠি। আর খাটের তলায় ঢুকে যদি শুই

তাহলে মাঝরাতে মনে হয় খাটের ওপরে কেউ একজন শুয়ে শুয়ে আমায় খুন করবার ফন্দি করছে। আমায় আপনি বাঁচান।

ডাক্তারঃ ঠিক আছে। হয়ে যাবে। আগামি দু'বছর ধরে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। মাসে একবার করে সিটিং দেবেন। সব ঠিক করে দেবো।

রোগিঃ আর আপনার ফিজ?

ডাক্তারঃ প্রতি সিটিং- এ দু হাজার টাকা।

রোগি (মনে মনে) ওরে বাবা। বলে কী? (মুখে)ঠিক আছে ডাক্তারবাবু। ভেবে দেখি।

(দু মাস পরে একদিন রাস্তায় ডাক্তারের সঙ্গে রোগির দেখা)

ডাক্তারঃ ওহে ছোকরা, তারপর তো আর এলে না! রোগ সারাতে হবে তো? না কি?

রোগিঃ সে তো আমার কবে সেরে গেছে। তাছাড়া না সারলেও আপনার কাছে আসতাম না। যে চড়া ফিজ আপনার!

ডাক্তারঃ তা কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলে ? কত ফি নিলো?

রোগীঃ এক পয়সা ফি লাগে নি। উলটে দুহাজার টাকা লাভ করেছি। খাটটা বেচে দিয়েছি। এখন আমি মেঝেতে শুই।

গ্যালারি

বউল

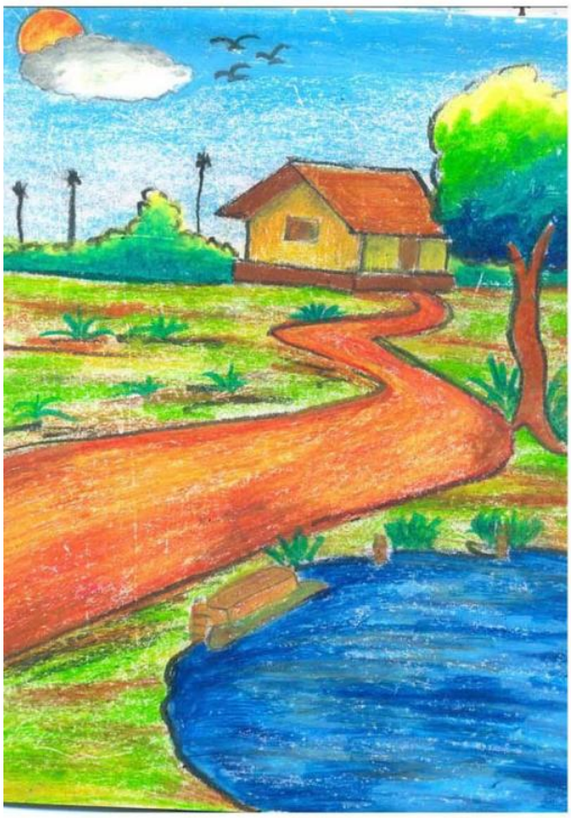

অন্তরা

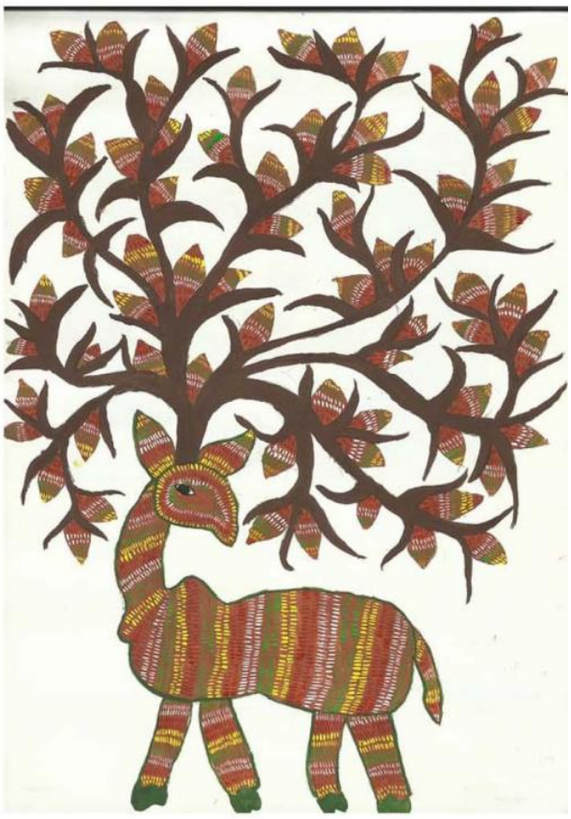

রুপসু

সমাদৃতা

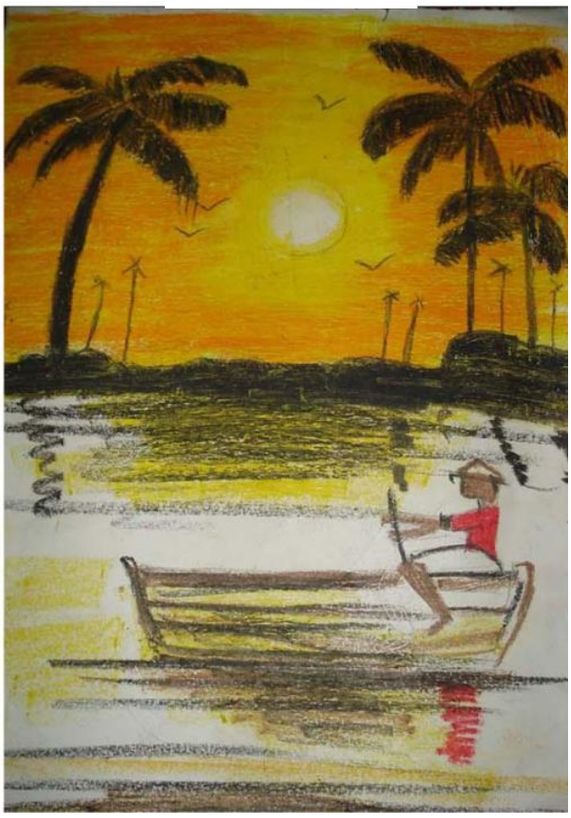

গোরস্থানে সাবধান

অরুন্ধতি

ক্লাস সিক্স,নৈহাটি কাত্যায়ণী বিদ্যালয়।

আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বুধ ও শনিবারে গঙ্গার ওপারে চুঁচুড়ায় পড়তে যাই। এস কে জি স্যারের কাছে। স্যারের বাড়িটা হলো গোরস্থানে। আমি যেদিনকে প্রথম পড়তে এলাম, সেদিন মাকে আগেই বলে দিলাম, "মাগো, গোরস্থানে সাবধান!"

আমি পড়ে বেরোই প্রায় চারটের সময়। তখন সেখানে যখন মুসলমানরা আজান দেয় তখন শেয়ালগুলো হুক্কাহুয়া করে ডেকে ওঠে। আমি চমকে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরি। গোরস্থানের ভেতরটা বিশাল জঙ্গল, আর সেই জঙ্গলের ভেতর বিরাট

উঁচু উঁচু কালো কালো গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন রিকশা করে যাই, তখন মাথা উঁচু করে পাঁচিলের ওপর দিয়ে দেখি যখন তখন আমার নিজেরই দেখলে ভয় লাগে। যারা একটু ধনী তারা কবরের ওপরে বড় বড় পিলার করে দিয়েছে। যারা গরীব তারা এমনি ঢিপি রেখে দিয়েছে। গোরস্থানের বাইরের গেটে যিশুর অনেক বাণী লেখা। তার মধ্যে একদিন যেতে যেতে চোখে পড়লো একটা বাণী। বাণীটা হলো, "আমাকে যে বিশ্বাস করে সে মরেও মরবে না।" আমার তো এই বাণীটা পড়েই খুব আনন্দ হলো। কারণ আমি তো যিশুকে বিশ্বাস করি। তাহলে আমার যদি কোনদিন মৃত্যু হয় তাহলে আমি মরেও মরবো না।

যাক গে এসব কথা। এখন আসল কথা শোন। গোরস্থানের ভেতরে যাদের কবর আছে তারাও আসলে কেউ মরা নয় কারণ তারা যিশুকে বিশ্বাস করে। তাই সেখানে রাত্রিবেলা সব মরা মানুষ জেগে ওঠে। এই কথাটা লিখতে লিখতে একটা ম্যাজিকের কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হলো কবরের কান্না। তা যাক। এবার আসল কথা শোন। গোরস্থানের ভেতরে নাকি মরা মানুষের অফিস আছে। সেটা প্রত্যেক দিন রাত্রি একটা থেকে তিনটে অবধি খোলা থাকে। সেখানে একটা আদালতও আছে। সেটা হলো, যে মরা মানুষ দোষ করে তাকে ওই আদালতে বিচার করা হয়। গোরস্থানের ভেতরে রোজ রাত বারোটা থেকে একটা অবধি হাট বসে। সেখানে নানাধরণের ভূতমানুষ হাট- এ বাজার করতে আসে। কেউ হাড় দিয়ে তৈরি, কাউকে আবার সদ্য কবর দেয়া হয়েছে। সবাই বাজার নিয়ে যায়। এখানকার মতো আলু, পটল এসব না। নিয়ে যায় ইঁদুর পচা, শ্যাওলা, বিভিন্ন রকমের রোগ—তা যাক গে এসব কথা। আমার এই কথাগুলো ভেবেই ভয় লাগছে। তোমাদেরও নিশ্চয়ই ভয় লাগছে। আজকে তবে এখানেই শেষ করলাম।

ছবিঃ ঋত্বিক

কমিকস্

বাড়ি পালানোই ভালো !!!

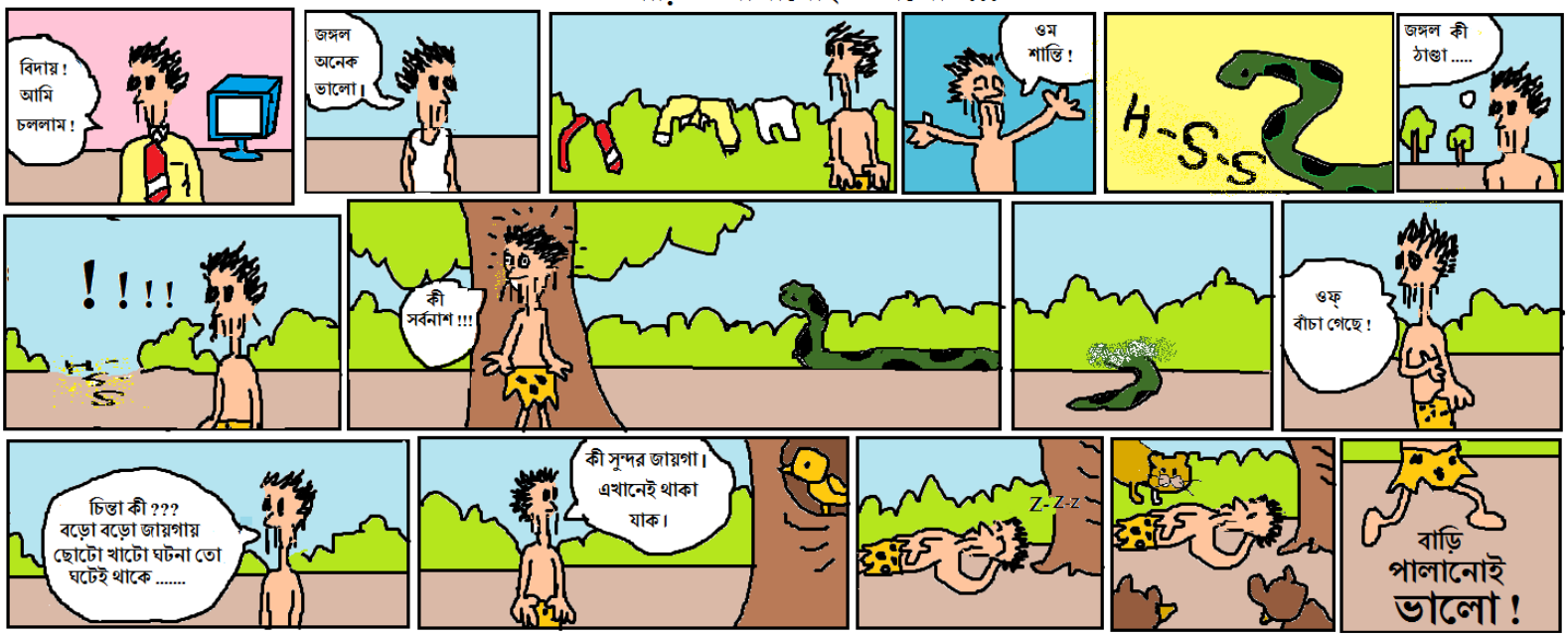

লেখা ও ছবি : রঙ্গিত মুখোপাধ্যায়
পঞ্চম শ্রেণি , সেন্ট জেভিয়ার্স কলিজিয়েট স্কুল

পুরাণ কথা

রাজা সোমকান্ত

সংহিতা

জীবনে একবার পাপ করলে তার শাস্তি থেকে মানুষের নিস্তার নেই, সে পাপের পর যতই পুণ্য অর্জন করুক না কেন মানুষ। কিন্তু রাজা সোমকান্ত পাপের শাস্তি ভোগ করতে করতে পুণ্যের সাধনা থেকে সরে আসেন নি। বরং পাপের ফলভোগ করার সময় তিনি শান্ত সমাহিত সুবিবেচক হয়ে উঠেছিলেন। সেই দুঃসময়ে তিনি পুণ্যের অহংকারও জয় করেছিলেন। তিনি কোনো অভিযোগ করেন নি। দেবতার দরবারেও না। কাউকে শাপশাপান্তও করেন নি। রোগ ও তার হাত ধরে এগিয়ে আসা মৃত্যুকে তিনি স্বাভাবিক নিয়মের মতো মেনে নিয়েছিলে। আর তাই অবিচলিতভাবে পালন করেছিলেন তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য। রোগে ব্যাথাতুর হয়েও তিনি ধর্মের পথ থেকে সরে আসেননি।

দেবলোকের সৌরাষ্ট্র প্রদেশের রাজা ছিলেন সোমকান্ত। তিনি চাঁদের থেকেও বেশি ঝলমলে ছিলেন। তাই তাঁর নাম ছিল সোমকান্ত। আবার তিনি সূর্যের চেয়ে বেশি তেজিও ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ ছিলেন, ছিলেন অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মনে করা হতো তিনি বৃহস্পতির থেকেও বেশি সুবিবেচক, কুবেরের থেকেও বেশি ধনী, পৃথিবীর থেকেও বেশি ধীর, মহাসমুদ্রের থেকেও বেশি গভীর, প্রেমের দেবতা কামদেবের থেকেও বেশি সুদর্শন।

যখনই সোমকান্ত সৌরাষ্ট্রের বাইরে যেতেন তখনই তাঁর সঙ্গে যেত কুড়িটা হাতি, দুহাজার ঘোড়া, ছহাজার রথ। যুদ্ধে গেলে তাঁর সঙ্গে যেত অগুণতি পদাতিক সেনা। এই সেনার একদল ছিল আগ্নেয়াস্ত্রে ধুরন্ধর, আরেকদলের কেরামতি ছিল তীরধনুকে। তাঁর এতো সমৃদ্ধিতে অনবদ্য অবদান ছিল তাঁর পাঁচ মন্ত্রীর – রূপভট্ট, বিদ্যাধীশ, ক্ষেমঙ্কর, জ্ঞানগম্য ও সুবল। ধীরস্থির, বলশালী, রাজনীতিতে সুপটু এই মন্ত্রীদের জন্যই ত্রিভুবনে তাঁর শত্রু নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

রানিদের মধ্যে সুধর্মা ছিলেন সেরা। তাঁর সারা গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকত তাঁর গয়নার হীরে জহরতের ছটা। তাঁর গয়নার মণিমাণিক্যের লাবণ্য মিশে যেত তাঁর লাবণ্যে। তাঁর হাজার হাজার রঙিন কাপড়ে মিশে থাকত তাঁর মনের কমনীয় রং। সুধর্মাই সবথেকে বেশি খেয়াল রাখতেন রাজার সুখসুবিধের। সুধর্মার দয়া পেতে দিকদিগন্ত থেকে মানুষ জুটতেন তাঁর আশ্রয়ে এবং কেউ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতেন না। তাঁর অতিথিদেরও তিনি যারপরনাই যত্নআত্তি করতেন। তাই তাঁর সুনাম ছিল আকাশছোঁয়া। তাই তাঁকে অন্য রানিরা - রতি, রম্ভা, তিলোত্তমা - হিংসে করতেন খুব। এঁরা

সুধর্মাকে এতই হিংসে করতেন যে নিজেদের হিংসেয় তাঁরা নিজেরাই যে অসুখী হচ্ছেন তাও বুঝতেন না।

সুধর্মার ছেলে হেমকান্তই ছিলেন রাজা সোমকান্তর উত্তরাধিকারী। জ্ঞানী, সাহসী হেমকান্তর গায়ে হাতির জোর। শত্রু তাঁর নাম শুনলে ভয়ে কেঁপে উঠত।

সোমকান্ত বিশ্বজয় করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। প্রজারা তাঁর অনুগত ছিল। তাঁর সুশাসনের ভক্ত ছিল। তিনিও প্রজাদের খুশি রাখতেন যত্ন করে। তাদের সুখে রাখার চেষ্টাও করতেন। তাঁর এই ইচ্ছে পুরণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর পাঁচ মন্ত্রী, রানি সুধর্মা ও রাজপুত্র হেমকান্ত।

এত কীর্তি, এত পূণ্য তাঁর ধূলিসাৎ করে একদিন দেখা দিয়েছিল দূরারোগ্য কুষ্ঠ। তিনি কালবিলম্ব না করে মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন হেমকান্তকে সিংহাসনে বসানোর তোড়জোড় শুরু করতে। তিনি চেয়েছিলেন হেমকান্তকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে চলে যেতে। সেখানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় মন দিতে। তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন মন্ত্রীরাও। তখন সুধর্মা সকলকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে রাজার সাথে তিনি নিজে যাবেন রাজার সেবা করতে। রাজাও মন্ত্রীদের বললেন যে হেমকান্ত যোগ্য কিন্তু নবীন, অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা তার পাশে না থাকলে সে মুশকিলে পড়তে পারে, তাই তিনি চান মন্ত্রীরা হেমকান্তর সঙ্গেই থাকুন। মন্ত্রীরা রাজার কথা মেনেই চলতেন, তাই এই কথাটাও মেনে নিলেন। কিন্তু শেষকালে বেঁকে বসলেন হেমকান্ত। তিনি সোমকান্তকে ধরে পড়লেন যে বাবাকে ছাড়া তিনি থাকতে পারবেন না।

এদিকে রাজা সোমকান্তর অসুখ খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর সারা গায়ের চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তিনি অধিকাংশ সময় অচৈতন্য থাকতে লাগলেন। তারপর সুধর্মার সেবায় আবার একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি নিজে হেমকান্তকে রাজধর্ম ও রাজনীতি শিখিয়েছিলেন। তারপর রাজ্য হেমকান্তর হাতে সঁপে দিয়ে বনে চলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি আমৃত্যু সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন। শুধু রাজভোগ নয়, সাধারণের জীবনের ভোগটুকুও বাদ দিয়ে বাঁচতেন তিনি। সারাদিন কাটাতেন ঈশ্বরের কথা ভেবে।

ছবিঃ মৌসুমী

রাশিয়ান সাহিত্য

সিংহ আর কুকুরছানা

লিও টলস্টয়

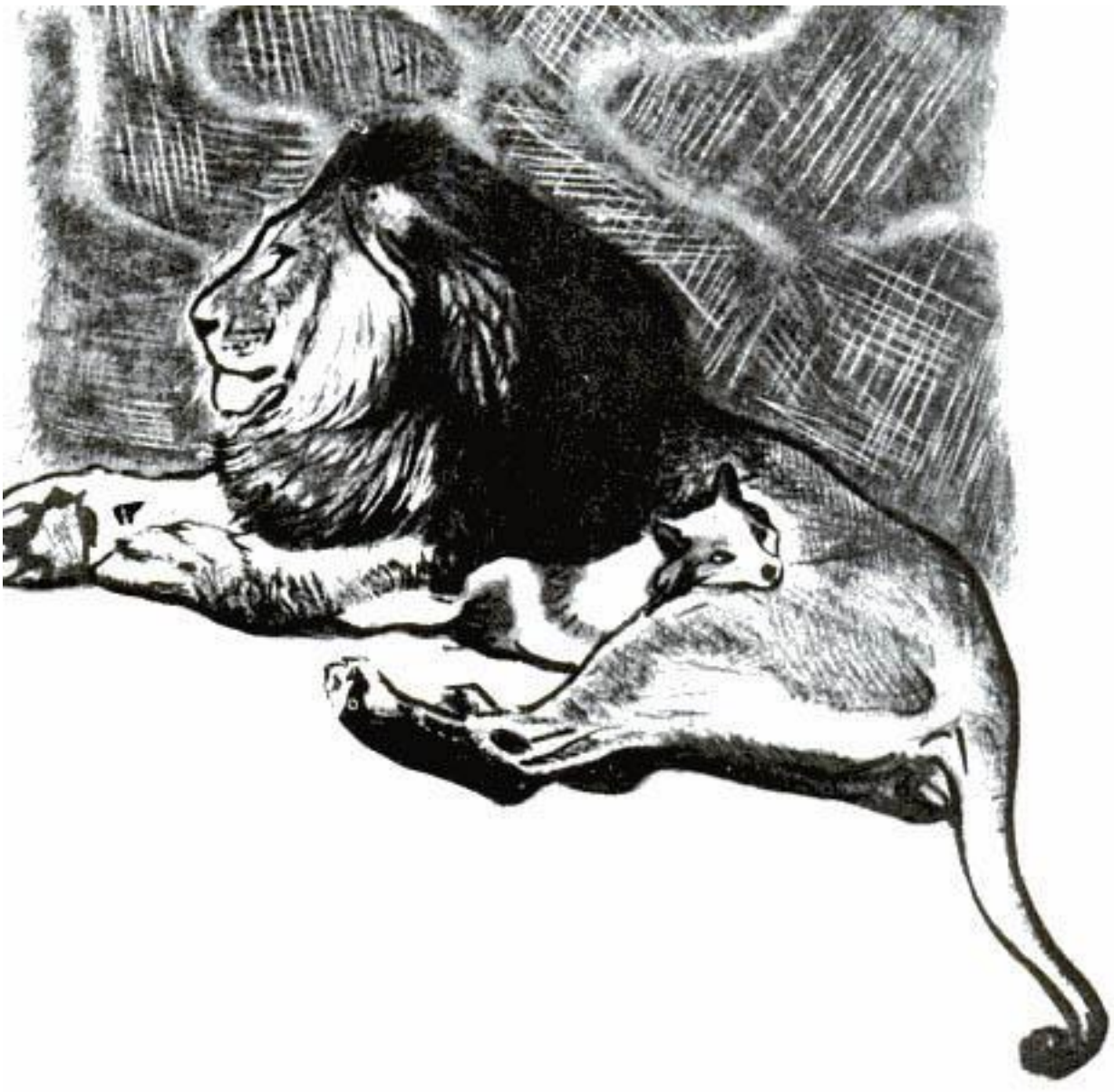

লণ্ডনের এক চিড়িয়াখানায় ঢোকবার জন্য ভাড়া ছিলো দু রকম। হয় পয়সা দিয়ে টিকেট কাটো, না হয় সঙ্গে করে বাঘ সিংহের খানা হিসেবে কুকুর কি বেড়াল নিয়ে এসো একটা। একদিন এক ভদ্রলোকের চিড়িয়াখানা দেখবার শখ হয়েছে।

ওদিকে পকেটে পয়সা নেই। তিনি করলেন কি, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো একটা সুন্দর কুকুরছানা ধরে পকেটে পুরে নিয়ে এলেন চিড়িয়াখানায়। দারোয়ানের হাতে কুকুরছানা দিয়ে তিনি গেলেন চিড়িয়াখানা দেখতে। দারোয়ান কুকুরছানাটাকে নিয়ে সিংহের খাঁচায় ফেলে দিলো তার বিকেলের টিফিন সারবার জন্য।

ছোট্ট কুকুর ভয়ে লেজটা পেছনের দুপায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে খাঁচার এক কোণে গিয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিক বাদে সিংহ এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক শুঁকলো তাকে। কুকুরছানা অমনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে তাবা চারটে ওপরের দিকে করে লেজ নাড়াতে শুরু করলো পট পট করে। সিংহ মাথাটা নামিয়ে নাক দিয়ে ঢুঁ মেরেউল্টে দিলো তাকে। কুকুরছানা ওমনি লাফ দিয়ে উঠে পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সিংহের সামনে। সিংহ তার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু। তাকে কিচ্ছুটি করলো না। খানিক বাদে চিড়িয়াখানার লোকেরা যখন সিংহের জন্য একতাল মাংস ছুঁড়ে দিলো খাঁচার ভেতরে, তখন তার সবটা না খেয়ে ছোট্ট একটা টুকরো সিংহ রেখে দিলো কুকুরছানার জন্য।

সেদিন রাতে দেখা গেল সিংহ আর কুকুরছানা একসঙ্গে ঘুম দিয়েছে। কুকুরছানার মাথাটা সিংহের থাবার ওপরে আরামে রাখা, যেন একটা নরম বালিশ।

সেদিন থেকে সিংহ আর কুকুরছানায় খুব ভাব হয়ে গেল। তারা একসঙ্গে থাকতো খেতো খেলতো আর ঘুমোতো। কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক চিড়িয়াখানা দেখতে এসে খাঁচার মধ্যে কুকুরছানাকে দেখে বলেন, ‘‘আরে, এ যে আমার পোষা কুকুরটা! রাস্তা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো কিছুদিন আগে। আমার ওকে ফেরৎ চাই। তাই শুনে খাঁচাওয়ালা কুকুরছানাকে তু তু করে ডাকতেই সিংহ বেজায় রেগে গিয়ে ঘাড়ের লোম খাড়া করে ভয়ানক এক গর্জন ছাড়লো খাঁচাওয়ালার দিকে তাকিয়ে। কাজেই কুকুরছানাকে আর তার মালিকের কাছে ফেরৎ দেয়া হলো না।

এর পর একটা গোটা বছর তারা এক খাঁচাতেই বন্ধু হয়ে ছিলো। কিন্তু শীত আসতে কুকুরছানা অসুখে পড়লো। কদিন পরেই মারা গেল বেচারা। সিংহ তখন খাওয়া বন্ধ করে দিলো। সারাক্ষণই সে শুধু তার ছোট্ট বন্ধুকে ঘুরে ঘুরে শোঁকে আর

থাবা দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়িয়ে তাকে জাগাতে চায়। তারপর যখন সে বুঝতে পারলো যে তার বন্ধু আর কখনো চোখ খুলবে না, তখন রাগে দুঃখে সে ঘাড়ের লোম খাড়া করে লাফ দিয়ে উঠলো, লেজের ঝাপটা দিল নিজেরই গায়ে, আর তারপর খাঁচার শিকের গায়ে বারবার এসে আছাড় খেতে লাগলো।

গোটা একটা দিন সে এইভাবে তর্জন গর্জন করেছিলো আর ছুটে বেরিয়েছিলো খাঁচা জুড়ে। অবশেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে সে এসে তার কুকুরবন্ধুর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো, তারপর থাবা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রইলো। পাঁচপাঁচটা দিন সে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এইভাবে আগলে রেখেছিলো তার বন্ধুকে। একবারের জন্যও তার পাশ ছেড়ে নড়েনি।

ছ দিনের দিন সিংহ মারা গেল।

ছবিঃ সংগৃহীত

পুরাতনী

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা
চৌপর দিনভর, দেয় দূর পাল্লা
কঞ্চির তীর ঘর, ওই চর জাগছে
বুনো হাঁস ডিম তার, শ্যাওলায় ঢাকছে।
টুপটুপ ওই ডুব, দেয় পানকৌটি
দেয় ডুব টুপটুপ, ঘোমটার বৌটি।
ঝকঝক কলসির, বগবগ শোন গো
ঘোমটার ফাঁক রয়, মন উন্মন গো।

তিন দাঁড় ছিপখান মন্থর যাচ্ছে
তিনজন মাল্লা কোন গান গাচ্ছে?
রূপশালী ধান বুঝি এই দেশে সৃষ্টি
ধূপছায়া যার শাড়ি তার হাসি মিষ্টি।
মুখখানি মিষ্টি রে চোখদুটি ভোমরা
ভাব কদমের ভরা রূপ দ্যাখো তোমরা।
ময়নামতির জুটি ওর নামই টগরি
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে জল হল গোঘরি।

ডাক পাখি ওর লাগি ডেকে ডেকে হদদ
ওর তরে সোত জলে ফুল ফোটে পদ্ম
ওর তরে মন ধরে নদ হেথা চলছে
জলপিপি ওর মৃদু বোল বুঝি বলছে।
দুই তীরে গ্রামগুলি ওর গানই গাইছে
গঞ্জে যে নৌকো সে ওর মুখে চাইছে।
আজকে যে সেই ডিঙা চাইছে সে স্পর্শ
সঙ্কটে শক্তি ও সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোমরা
রূপশালী ধান ভানা রূপ দ্যাখো তোমরা।

পান সুপারি পান সুপারি এইখানেতে শঙ্কা ভারি।
পাঁচ পীরেরই সিন্নি মেনে চল রে টেনে বৈঠা হেনে।
বাক সমুখে সামনে ঝুঁকে বায়ে বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে।
বুক দে টানো, বৈঠা হানো সাত সতেরো, কোপ কোপানো।
হাত বেরুলো খেজুরগুলো ডাইনী যেন ঝামর ঝুলো।
নাচতে ছিলো সন্ধ্যাগমে লোক দেখে কি থমকে গেল?
জমজমাটি জাগিয়ে ক্রমে রাত্রি এল, রাত্রি এল।
ঝাপসা আলোয় চরের দিকে ফিরছে কারা মাঠের পাশে।
পীর বদরের কুদরতিতে নৌকো বাঁধা হিজল গাছে।

আর জোর দেড় কোশ জোর দেড় ঘন্টা
টান ভাই টান সব নেই উৎকণ্ঠা।
চাপ চাপ শ্যাওড়ার দীপ সব সার সার
বৈঠার ঘায়ে সেই দিক সব পড়ছে
ভিলবিলে হাঁস তার জল গায়ে চড়ছে।

ছিপখান তিন দাঁড় তিনজন বাইছে
তিনজন মাল্লা কোন গান গাইছে।

ছবিঃ মৌসুমী

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

তিন

বড়মামার কিছু কাহিনী বহুল প্রচারিত আছে। টুকরো ঘটনা, তাৎক্ষণিক গল্পের ফানুস হাওয়ায় ভাসানো। জনপ্রিয় গল্পের মতই নানান মুখে প্রশ্রয় পেয়ে চিত্রিত হয়ে উঠেছে সেগুলো। প্রথম গাড়ি কিনল শোনা যায় সাতশো টাকা দিয়ে। শখ হত সকলকে আরোহণ সুখ দেবে। আমরা সেটা এড়িয়ে চলতাম সযত্নে। সেটা আসতে দেখলে নিচু হয়ে গাড়ির তলায় তলিয়ে দেখতাম কোন দ্বিপদ প্রাণী পেছন থেকে ঠেলে আনছে কিনা। গাড়িটার আবার এই ধরণের আয়েস ছিল, প্রায়ই হত সে ধরণের বিপদ। একমাত্র রুনুমামার ভারি ইচ্ছে ছিল গাড়িটা চালায়। বড়মামা সেটা দিত না। একদিন সকালে দাড়ি কামিয়ে অফিসে যাওয়ার আন্দোলন করছে। উদার সুরে ছোটভাইকে ডেকে বলল, 'রুনু, গাড়িটা গ্যারেজ থেকে নিয়ে আয়তো।' বলা বাহুল্য, এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করা উচিত। রুনুমামা ফিরল গাড়ি ঠেলে ঘাম শরীরে। বলল, 'দাদা, স্টার্ট নেওয়া তোমার গাড়ির ধাতে নেই।' জ্যেষ্ঠভ্রাতা অম্লানবদনে জবাব দিল, 'চলবে কেমন করে, কাল ব্যাটারি খুলে রেখেছি যে।'

কিছু গল্প আছে চিকিৎসা সংকট ঘটিত। দাঁত নড়ছে - ব্যাথার যন্ত্রণায় মামা কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার মামার পরিচিত। কিন্তু মামা কেবলই এড়িয়ে যায়। দাঁত তোলায় বড় ভয়। একদিন মরিয়া হয়ে বধ্যভূমিতে যেতে হল। সঙ্গে আমাকে নিল। ডাক্তারের চেম্বারে তখন রুগী, আমরা পাশের ঘরে, ঝড়ের হাওয়ায় ঝরা পাতার মত বসে আছে বড় মামা। এমন সময় পাশের ঘরে আর্ত চিৎকার, 'বাবাগো।' মামা এক পা বাড়াল নিষ্ক্রমণের জন্য। ডাক্তার ছুটে এসে পরাস্ত করলে তাকে। রুগী বয়স্কা মহিলা। দাঁত তোলার পর স্বান্ত্বনার সুরে

বললেন, ‘কষ্ট তেমন কিছু হয়নি। পয়সা দিয়ে দাঁত ওঠালাম। একটু আহা উহু করতে পারব না?’

এবার মামাকে যেতে হল ভেতরে। নানান প্রশ্নে উত্যক্ত করে তুলল ডাক্তারকে। ‘....এত যন্ত্রপাতির কী দরকার। এগুলো কি না হলেই নয়....’, ইত্যাদি। ডাক্তারও উত্তেজিত হয়ে বকবক করে চলেছে সমানতালে। তারপর অনেক অধ্যবসায়ে রুগীকে ম্যানেজ করে ঝুঁকে পড়ে দাঁত তোলার উপক্রম করেছে সে। মামার আর্ত চিৎকার ‘বাবাগো।’ ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে বললে, সে দাঁতে হাতও দেয় নি।

‘ডাক্তার তুমি আমার বাঁ পায়ে বুড়ো আঙুলে ব্যাথার ওপর দাঁড়িয়েছ,’ এবার রুগী কাতর। ডাক্তার ঘোঁত ঘোঁত করে পেছিয়ে এসে এবার দ্বিতীয় চেষ্টা করল আক্রমণের ভঙ্গীতে। দাঁত উঠে এল, রক্ত উঠল না। শুকনো কাজ। ডাক্তারের মুখও শুকনো। শুধু একটা জিজ্ঞাসা বেরিয়ে এল, ‘ব্লাডলেস ক্যুপ?’ মামা ঘোষণা করল,‘অ্যানিমিয়া। দাঁত দেব কিন্তু রক্ত দিতে হবে এমন তো শর্ত নেই।‘ ফ্যাকাশে মুখে তড়িঘড়ি ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে গাড়িতে চেপে বসল। আমি বললাম, ‘আশ্চর্য কাণ্ড।’ বড়মামা এবার থলি থেকে বেড়াল বের করলেন, ‘ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার দাঁত ভেঙেছিল। সেই থেকে একটা বাঁধানো দাঁত ছিল। ভুল করে সেটাই উঠে এসেছে। এখন ব্যথা নেই। বাড়ি চল।

কলকাতায় সাধারণ, অসাধারণ, হাতুড়ে সব ধরণের ডাক্তারদের সঙ্গে খাতির জমান মামা। এক সন্ধ্যায় পাড়ার ডাক্তারের কাছে যাওয়া হল। এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক তার হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে এনেছেন। ছেলেটি একমাস হল বেশ হাঁটতে শিখেছে। কিন্তু আজ কেবলই দু-পা হেঁটে গড়িয়ে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ডাক্তার রোগের কারণ ধরতে পারে না। তাকে দক্ষিণা দিয়ে শুকনো মুখে পিতা ও পুত্র ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় মামা নামালেন ছেলেটিকে তার বাবার কোল থেকে। হঠাৎ তার পরণে ছোট প্যান্ট টান দিয়ে খুলে ফেলে আবার সেটা পরিয়ে দিলেন। বাচ্ছা এবার অনায়াসে দিব্বি হেঁটে চলল। সকলে চমৎকৃত। কেমন করে সম্ভব? মামা ফাঁস করল, ছেলেটির দুই গোদা পা প্যান্টের একটাই গর্তে প্রবেশ করেছিল, তাই এই দুর্বিপাক। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বললেন ‘মেরা ফিজ বরবাদ হয়ে গেল।’

স্কুলে কান্ট্রি মাউস আর সিটি মাউসের কাহিনী জেনেছিলাম। আমার মাতুল টাউন মাউস। পাড়াগাঁয়ে যেতে তাঁর কিছুতেই ভরসা হয় না। আমার পিতামহ থাকতেন বিহারের পূর্ণিয়া জেলার এক গ্রামে। অতঃপর বড়মামার মুখেই শোনা পরবর্তী কাহিনী।

‘তোমার ঠাকুর্দা অনেকবার আমাকে লেখালেখি করাতে নিরুপায় হয়ে একবার যেতে হয়েছিল তোমাদের বাড়িতে। প্রাণ পকেটে নিয়ে ঐ সাপখোপের জায়গায় সাতদিন কেটে গেল। বেদম হেঁটে আর প্রচুর খেয়ে কাহিল হলে পড়েছিলাম। এবার বোঁ করে কলকাতায় ফিরতে পারলে হয়। ফেরবার আয়োজন হল। উনি বললেন ‘বরুণ, তুমি হাতি চেপে

স্টেশনে যাবে।' কাছারি ঘরের সামনে খোলা মাঠ। প্রকান্ড এক হাতি এনে দাঁড় করানো হল সেখানে। পোষা হাতি, কিন্তু স্বাধীন মেজাজে চলে। ওঠা, বসা, চলা তার আপন ইচ্ছে মত। হাতিতে সওয়ার হওয়ার আগে ধুতিতে মালকোঁচা দিলাম। বল্লমসহ কয়েকজন সেপাই হাতিকে ঘিরে দাঁড়াল। যাতে সেটা বাড়ির ভেতরে ঢোকার উপক্রম না করে। মাহুত বহুত ডাঙশ চালাল, হাতিও শূন্যে শুঁড় ঘোরালো। তারপর হঠাৎ খেয়াল মতো বসে পড়ল। জয় মা কালী বলে হাতির পিঠে নিজেকে সঁপে দিলাম। হাতি রওনা দিল।

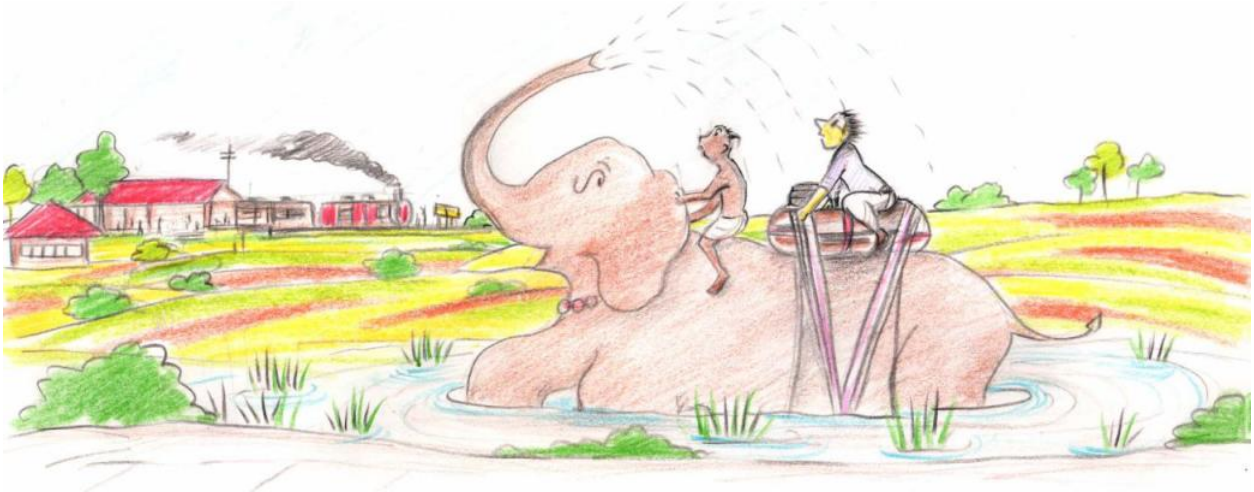

বাড়ি ছেড়ে আমবাগানের মধ্যে। ষ্টেশনের রাস্তায় যাওয়া তার রুচি হল না। পিঠে সওয়ারীরা শুয়ে পড়েছে। গাছের ডাল সর্বাঙ্গে আঁচড় দিচ্ছে। এবার এক ডোবায় হাতি নেমে দাঁড়াল, বোধহয় স্নান করতে চায়। শুঁড় দিয়ে জল তুলে সকলকে স্নান করালো। দূরে স্টেশনে ট্রেন বাঁশি বাজাচ্ছে, ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। গ্রামের অতিথি শহরে ফিরবে, তার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে। হাতিও বুদ্ধিমানের মতো এবার স্টেশনের পথ ধরল। উল্টোপথে এক মৌলবি আসছে ঘোড়ায় চেপে। হাতিকে দেখে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়াকে এক চাবুকের আঘাত দিয়ে নিজে দৌড়াল মাঠের মধ্যে। ঘোড়াও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পালিয়ে বাঁচল। হাতি চলেছে গদাইলস্করী চালে, গলায় ঘন্টা বাজছে, ক্রমে স্টেশনে এসে পৌঁছে দিল আমাকে। এবার কয়েক মিনিট অধীর প্রতীক্ষা, হাতি বসবে কতক্ষণে। শেষে অবশ্য দয়ার সাগর ঐ অবলা প্রাণী মুক্তি দিয়েছিল। কলকাতায় ফিরে তোমার দাদুর চিঠি পেলাম, 'বরুণ তুমি ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নে স্টেশনে পৌঁছাতে পেরেছিলে। তারপর হাতি সাতদিন পরে বন-বাদাড়ে ঘুরে বাড়ি এসেছিল, মাহুত ফেরে পায়ে হেঁটে।'

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

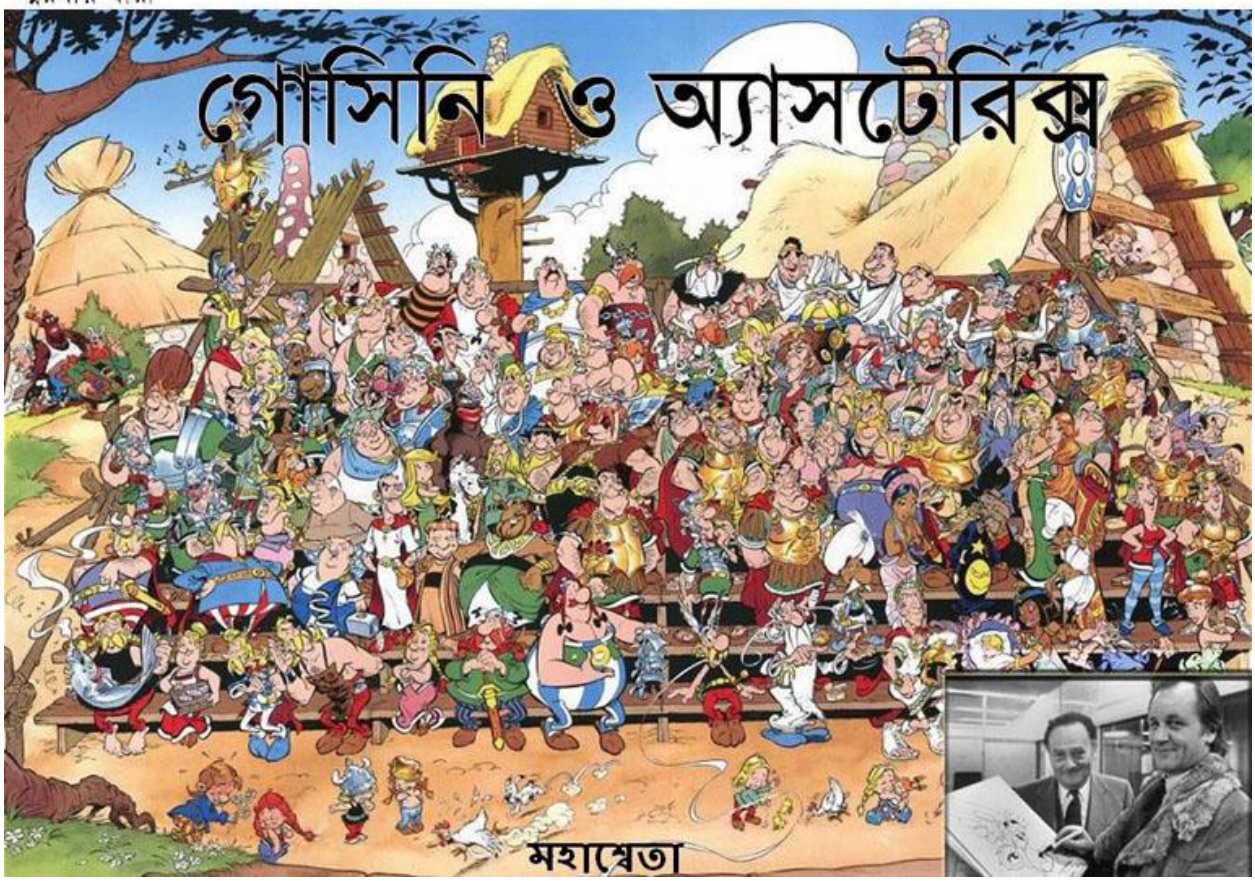

"যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গলদেশ রোমের অধীনে---- --- ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশী আক্রমণকারীদের----- ”

চেনা চেনা ঠেকছে? যারা অ্যাসটেরিক্স পড়েছে তাদের তো বিশেষভাবেই চেনা চেনা লাগার কথা লাইনগুলো। কারণ অ্যাসটেরিক্স সিরিজের প্রতিটি কমিক-বই শুরু হয় এই অদম্য লাইন দুটো দিয়ে। বিশ্ববিখ্যাত এই সিরিজের স্রষ্টা রেনি গোসিনি, ও চিত্রকর আলবার্ট ইউদেরজো। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রায় একশোরও বেশি ভাষায় ভাষান্তর হয়েছে এই সিরিজের ৩৪টি বইয়ের। হাঙ্গেরিয়ান থেকে ভিয়েতনামিজ - পৃথিবীর সব কটা প্রধান ভাষাতেই এর ভাষান্তর হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে গোমড়া মানুষের মুখেও হাসি এনে দিতে পারে এই বইয়ের চরিত্ররা।

এই সিরিজের মুখ্য চরিত্র ছোটখাটো যোদ্ধা অ্যাসটেরিক্স, তার প্রাণের বন্ধু মোটাসোটা ওবেলিক্স, গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত এটাসেটামিক্স

(ইংরিজি সংস্করণে গেটাফিক্স), মহামান্য গ্রামপ্রধান বিশালাকৃতিক্স (ইংরিজি সংস্করণে ভাইটালস্ট্যাটিসটিক্স), বেসুরো চারণকবি কলরবিক্স (ইংরিজি সংস্করণে ক্যাকোফনিক্স) আর বাকি অদম্য গ্রামবাসীরা - সবাই মিলে তাদের গ্রামকে বাঁচিয়ে রেখেছে রোমান আধিপত্যের কবল থেকে। রোমানরাই বরঞ্চ গল গ্রামকে আতঙ্কের চোখে দেখে থাকে। এর কারণ এক, তাদের সাহস, আর দুই, তাদের পুরোহিত এটাসেটামিক্সের বানানো এক জাদু পানীয়, যা খেলেই বহুগুন বেড়ে যায় গায়ের শক্তি। এই বীর যোদ্ধারা তাদের সাহস আর জাদু পানীয় সঙ্গে নিয়ে কখনো যায় মিশরে, কখনো বা ব্রিটেনে, কখনো খোদ রোমেই। উদ্দেশ্য একটাই, সেখানকার রোমানদের উচিত শিক্ষা দেওয়া।

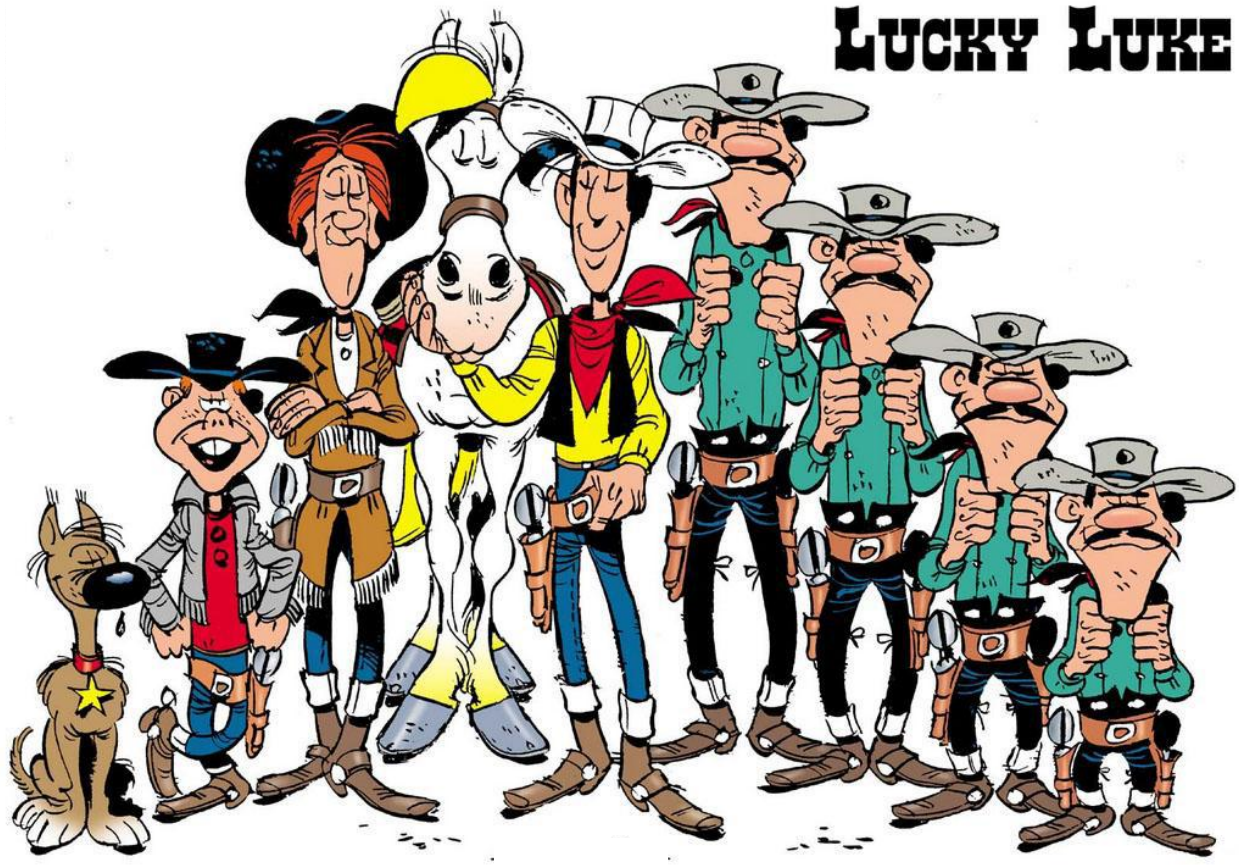

অ্যাসটেরিক্সের স্রষ্টা রেনি গোসিনির হাত থেকে অ্যাসটেরিক্স ছাড়াও বেরিয়েছে লাকি ল্যুক ও মরিসের মতো বিখ্যাত সব কমিক সিরিজ। গোসিনির জন্ম হয়েছিল প্যারিস শহরে, ১৯২৬ সালের ১৬ আগস্টে। তার

বাবা স্তানিস্লাভ গোসিনি আর মা আনা গোসিনা - দু' জনেই আদতে ছিলেন পোল্যান্ডের মানুষ। রেনি তাদের দ্বিতীয় সন্তান। রেনির একমাত্র দাদা ক্লঁদ তার থেকে ছ' বছরের বড় ছিল। স্তানিস্ল্যাভ ছিলেন কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার। রেনির যখন দু' বছর বয়স, তখন স্তানিস্ল্যাভ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স এয়ার্স- এ কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারের পদে একটা চাকরি পেয়ে সপরিবারে সেখানেই চলে গেলেন। রেনি তার ছোটবেলাটা বুয়েন্স এয়ার্স- এ বেশ হেসে খেলেই কাটালেন। সেখানকার ফরাসি স্কুলগুলোতে পড়াশুনা করলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তিনি অন্যকে হাসিয়ে আনন্দ পেতেন। ছবি আঁকতেও ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসতেন রেনি।

১৯৪৩ সালে রেনির ১৭ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলেন। মা আর ছেলের অভাবের সংসার চালানোর জন্য চাকরি খুঁজতে হল রেনিকে। চাকরি পেলেন একটা টায়ার রিকোভারির কারখানায়। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই চাকরি ছেড়ে একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় ইলাস্ট্রেটর চাকরি নিলেন রেনি আবার। কিন্তু সে চাকরিও বেশিদিন করা হল না তার। ১৯৪৫ সালে মায়ের সাথে নিউ ইয়র্ক চলে গেলেন রেনি, মামা বরিসের সঙ্গে থাকতে। সেখানে কিছুকাল অনুবাদকের কাজ করলেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় আমেরিকার হয়ে লড়তে আপত্তি থাকায় রেনি ১৯৪৬ শালে ফ্রান্সে চলে গিয়ে ফরাশি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরও কিন্তু তার লেখা- আঁকার পাট চুকলো না। কর্পোরাল পদে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও রেনি সৈন্যবাহিনীর ইলাস্ট্রেটর হয়ে গিয়ে সবরকম পোস্টার পরিকল্পনা ও আঁকার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

১৯৪৭ সালে আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে এলেন তিনি। তার পরের কয়েক বছর তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় বলা যেতে পারে। এই সময়টাতে না ছিল তাঁর কোন চাকরি, না ছিল হাতে একটুও পয়সা। ইংরিজি ভালো না জানায় অনেক খুঁজেও রেনি একটা

ছবি- আঁকিয়ের চাকরি পেলেন না। এই অবস্থায় বেশ কিছু দিন কাটানোর পর ১৯৪৮ সালে একটা ছোট স্টুডিয়োতে চাকরি পেয়ে গেলেন রেনি। এখানেই তার আলাপ হল পরবর্তীকালে দমফাটা হাসির কমিকস- ম্যাগাজিন ' ম্যাড' - এর স্রষ্টা হার্ভি কার্টজম্যান আর উইল এল্ডারের সঙ্গে। তাদের বন্ধুত্ব যে রেনির মৃত্যু অবধি অটুট থাকবে তা তারা তখন জানতেন না। সেখানে যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই তাঁর কাজের এত উন্নতি হল যে তিনি চোখে পড়ে গেলেন "ওয়ার্ল্ড প্রেস এজেন্সি' র জর্জে ত্রাইফঁতেন- এর। তার উৎসাহেই রেনি অ্যামেরিকার পাট চুকিয়ে প্যারিসে চলে এলেন পাকাপাকি ভাবে। সেখানে থাকাকালীন "দুপুই' এজেন্সির হয়ে বেশ কিছু কাজও করলেন। ১৯৫১ সালে ওয়ার্ল্ড প্রেসের প্যারিস অফিসের ম্যানেজার হয়ে গেলেন রেনি। আর সেখানেই তার প্রথম দেখা হল আলবার্ট ইউদেরজো- র সঙ্গে।

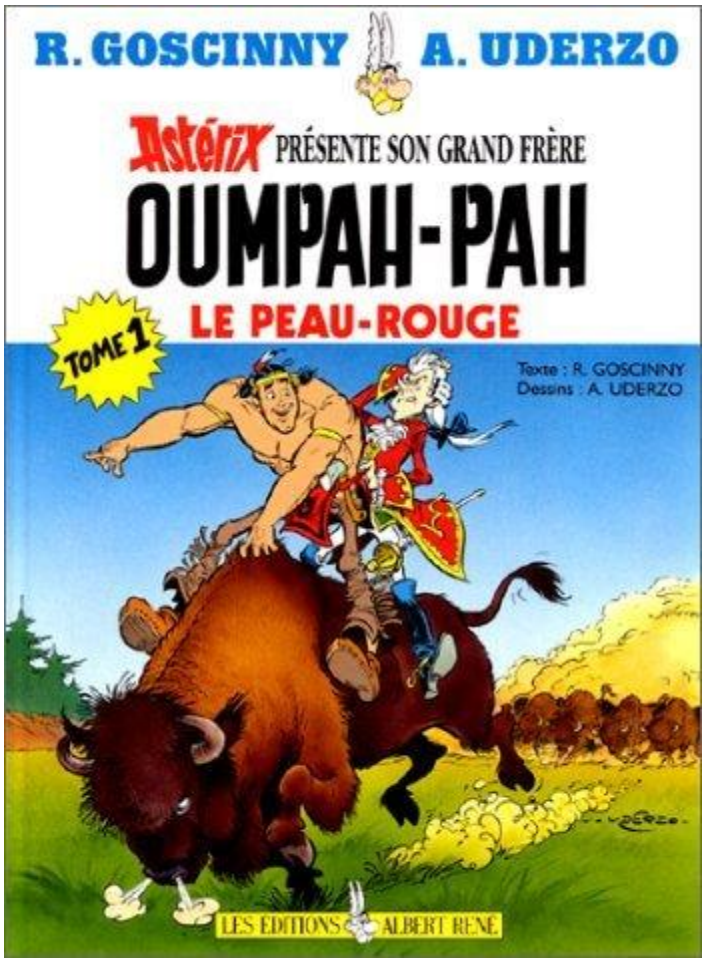

গোসিনি ও ইউদেরজো প্রথমদিকে দুপুই এজেন্সির হয়ে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা "ওউম্পা- পা' এর মত নিজস্ব কিছু কমিক্সের ওপরও কিছু কাজ করতে শুরু করলেন। কিন্তু ওউম্পা- পা কমিক্সটি দুপুই এজেন্সির ঠিক পছন্দ হল না, তাই সেটা তখন ছাপানোও হল না। অনেক পরে টিনটিন নামের একটা ম্যাগাজিনে সেটা ছেপে বেরোয়। ১৯৫৫ সালে, মরিস দে বেভেরের ছবি ও রেনি গোসিনির লেখা কমিক্স লাকি ল্যুক প্রকাশিত হল আর কিছুদিনের মধ্যেই তা বিশ্ব জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে

উঠল। ততদিনে ছবির থেকে পুরোপুরি লেখার জগতে চলে গেছেন গোসিনি।

১৯৫৫ সালেই মতবিরোধ হওয়ায় রেনি "ওয়ার্ল্ড প্রেস এজেন্সি' র চাকরি ছেড়ে দিলেন। তাঁকে সমর্থন করে ইউদেরজোও পদত্যাগ করলেন। তারপর দুপুই-এর আর্ট ডিরেক্টর জাঁ-মাইকেল চার্লিয়ের ও জাঁ হেব্রার্দ-এর সাহায্য সহকারে গোসিনি ও ইউদেরজোর হাত থেকে জন্ম নিল দু'টি স্বতন্ত্র সিন্ডিকেট - "এডিপ্রেস' ও "এডিফ্রান্স' । ১৯৫৯ সালে সেখান থেকে তাঁরা "পিলোতে' নামের একটা কমিক্স-পত্রিকা প্রকাশ করতে লাগলেন। বড়-সড় প্রকাশনী সংস্থা তাদের একঘরে করে দেওয়ায় ও বড় শিল্পীরা তাদের পত্রিকার কাজ করাতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তারা অখ্যাতনামা শিল্পীদের কাজই পিলোতে-তে ছাপাতে শুরু করলেন। সেখানে জাঁ-জ্যাক সেম্পের সঙ্গে গোসিনি "অ্যাগোস্তিনি' ছদ্মনামে "লা পেতিত নিকোলাস' নামের বাচ্চাদের বইয়ের একটি সিরিজও লিখতে শুরু করলেন। সেইসঙ্গে "পিলোতে' - র জন্য লেখা ও কিছু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও লিখতে

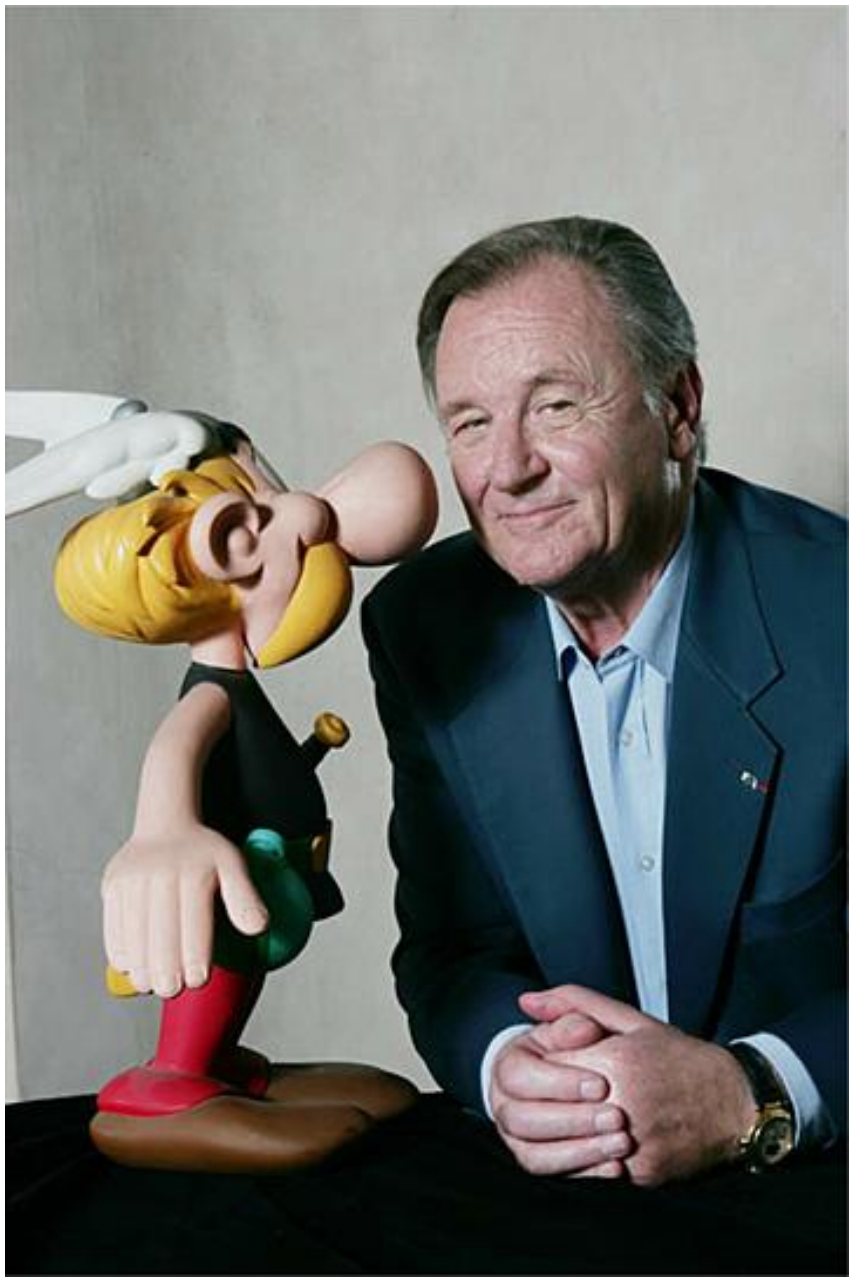

গসিনি ও আস্টেরিক্স

লাগলেন গোসিনি। ১৯৬২ সালে জাঁ ত্যাবারির সঙ্গে "লা গ্রান্ড ভিজিয়ার ইজ নো গুড' নামের একটি কমিক্সের কাজ করলেন গোসিনি। কিন্তু "অ্যাসটেরিক্স' - এর সাথেই গোসিনি প্রথম বিখ্যাত হলেন। পিলোতের প্রথম সংখ্যার জন্য বানানো এই কমিক্সটি তার জনপ্রিয়তা এক লাফে অনেকটা বাড়িয়ে দিল। ১৯৬১ সালে, পিলোত- এ প্রকাশিত অ্যাসটেরিক্সের সমস্ত টুকরো জুড়ে "অ্যাসটেরিক্সে দা গল' নাম দিয়ে অ্যাসটেরিক্স- সিরিজের প্রথম বইটি প্রকাশিত হল। তারপর থেকে গোসিনি- ইউদেরজো বছরে একটা করে অ্যাসটেরিক্সের বই প্রকাশিত করতে লাগলেন।

শুরুতে ইউদেরজো অ্যাসটেরিক্সকে বানিয়েছিলেন একজন বড়- সড় চেহারার গলযোদ্ধা। কিন্তু গোসিনি তাঁর মনশ্চক্ষে অ্যাসটেরিক্সকে ওরকম ভাবে দেখেননি। তিনি অ্যাসটেরিক্স বলতে ভেবেছিলেন একজন ছোটখাটো বুদ্ধিমান যোদ্ধা। কিন্তু অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু যে একটু মোটাসোটা ও বোকা হবে সে ব্যাপারে দু' জনেরই ছিল একমত। অ্যাসটেরিক্স এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও পিলোতে পত্রিকার আর্থিক অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে এগোচ্ছিল। শেষমেষ পিলোতে- কে কিনে নিলেন জর্জে দারগদ।

১৯৬৮ সালে মতবিরোধ হওয়াতে, পিলোতে পত্রিকাকে ত্যাগ করে গোসিনি- ইউদেরজো মূলত অ্যাসটেরিক্স- এর কাজেই মন বসালেন। ১৯৭৪ সালে তাদের হাতে জন্ম নিল আইডেফিক্স স্টুডিয়ো। সেখান থেকে অ্যাসটেরিক্সের একটি কার্টুন সিরিজ বের করতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের প্রথম ছবি ছিল "দা টুয়েল্ভ টাস্কস অফ অ্যাসটেরিক্স' । কমিক্সের মত এই ছবিগুলোও দারুণ জনপ্রিয় হল। লাকি ল্যুক- এরও একটি ছবি বানালেন তাঁরা। ততদিনে গোসিনি ও ইউদেরজো ফ্রান্স- এর জাতীয় হিরোয় পরিণত হয়েছিলেন। বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরষ্কারও পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭৪ সালে সুইডেন থেকে অ্যাডামসন অ্যাওয়ার্ড পেলেন গোসিনি সেরা কমিক্স- এর জন্য। কিন্তু তার ঠিক তিন বছর পরে, ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র ৫১ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেলেন গোসিনি। তখন তাঁর একমাত্র মেয়ে অ্যান গোসিনির বয়স মাত্র ন' বছর।

টুয়েল্ভ টাস্কস অব অ্যাস্টেরিক্স-এর দৃশ্য

গোসিনির মৃত্যুর পর ইউদেরজো কিন্তু অ্যাসটেরিক্সের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই বইগুলোর লেখার কাজ, আঁকার কাজ দুটোই করতেন ইউদেরজো একা। কিন্তু সমালোচকেরা গোসিনির লেখা বইগুলোর তুলনায় ইউদেরজোর একার বইগুলোকে নিছকই রসহীন বলেছেন। গোসিনিকে সম্মান করে ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর ফ্রান্সের অ্যাঙ্গোলিমে কমিক্স ফেস্টিভালে সেরা কমিক্স- শিল্পীকে "রেনি গোসিনি অ্যাওয়ার্ড" দেওয়া হয়।

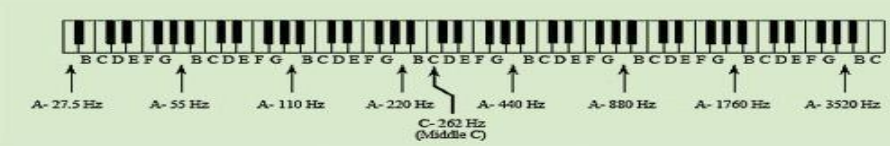

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ কথা বলার সময় স্বরের ওঠানামা রেখা দিয়ে দেখানোর প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল গতবারে, তাহলে ঐ একই ভাবধারায় করা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরলিপি বা স্টাফ্ নোটেশন নিয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

‘জনগণমন’ গানটির প্রথম লাইনে স্বরের ওঠানামার ধরণ গতবার রেখায় দেখেছিলাম, এবার ঐ লাইনটাই স্টাফ্-এ কেমন দেখতে হবে একটু তুলনা করে দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে -

গতবার রেখায় গানটির চলন যেমন দেখানো ছিল -

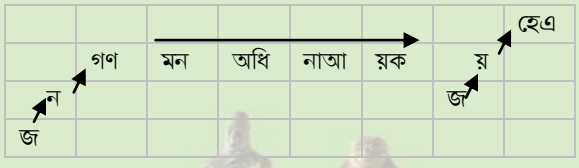

স্টাফ্-এ যেমন দেখতে হবে -
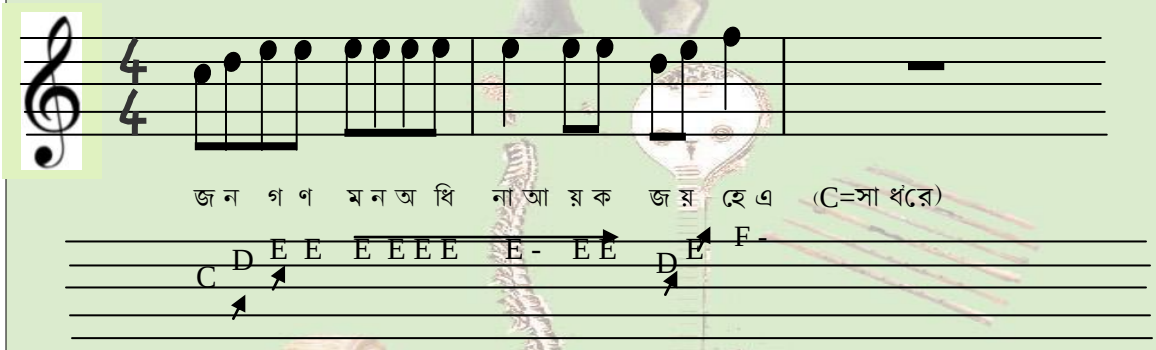
স্বরের ওঠানামার রেখাচিত্রের সাথে স্টাফ্-এর এই যে মিল, সেটা মূলতঃ স্টাফ্-এর ওপর স্বর সাজানোর মিলের কারণেই। স্টাফ্ আসলে পাঁচটি আনুভূমিক রেখা। এই পাঁচটি রেখা আর সেগুলোর মধ্যকার চারটি ফাঁক,

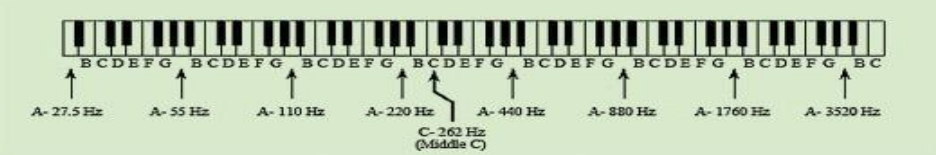

এই হলো স্টাফ্। নীচের রেখাচিত্রে স্টাফ্ আর তার ওপর স্বরের অবস্থান দেখানো হল।

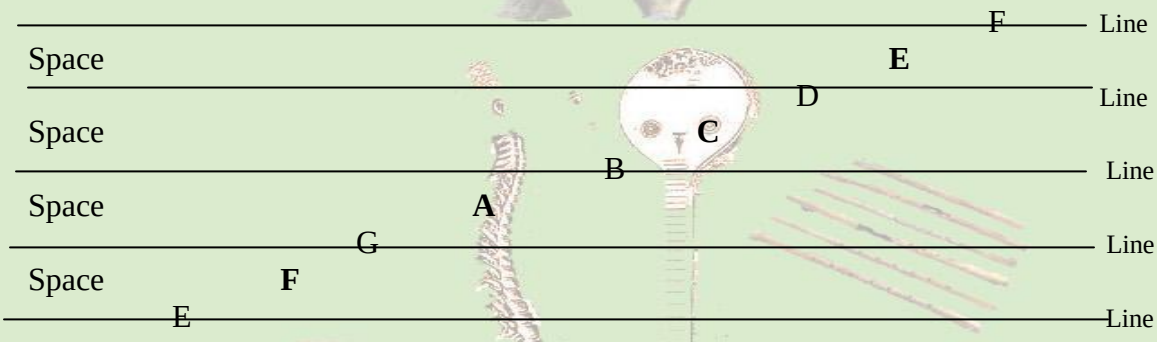

নীচ থেকে ওপরে (মানে স্বরের ক্ষেত্রে খাদের থেকে চড়া স্বরে) পড়লে লাইনগুলোর ওপরে থাকে E, G, B, D, F স্বরগুলো, আর লাইনের ফাঁকগুলোয় থাকে F, A, C, E স্বরগুলো।

একটু সময় নিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে স্টাফ্-নোটেশনের মধ্যে এমন কিছু গভীর রহস্য নেই। তবে বদহজমের ভয় আছে বলে আজ এটুকুই থাক। কারণ ওপরের এই স্বরস্থানগুলো ক্লেফ্ অনুযায়ী পাল্টে যায় - ওহ্ - বলিনি বুঝি ... ঐ যে লাইনগুলোর শুরুতে সুন্দর একটা ইংরেজির বড় হাতের ‘জি’ বা ‘অ্যান্ড’ চিহ্নের মত দেখতে যে একটা গয়না লাইনগুলোকে ধরে রেখেছে - ওটাকে বলে ট্রেবল্ ক্লেফ্ বা জি ক্লেফ্। এরকম আরো দুটো ক্লেফ্ আছে - এফ্ ক্লেফ আর সি ক্লেফ - তবে শেষেরটা কম প্রচলিত। এই ট্রেবল্ ক্লেফ্টাকে কেন জি-ক্লেফ্ বলে যদি খুঁজে বের করতে পার তাহলে বাকিগুলোর পরিচয় এমনিই পেয়ে যাবে। খোঁজার সূত্র কিন্তু ওই গয়নাটা আর লাইনের মধ্যেই লুকোনো আছে।

ট্রেবল্ ক্লেফ্ বা ‘জি’ ক্লেফ্।
জি স্বরটির অবস্থান পিয়ানোর চাবি অনুযায়ী কোথায় কোথায় সেটা নিচে দেখে নাও।

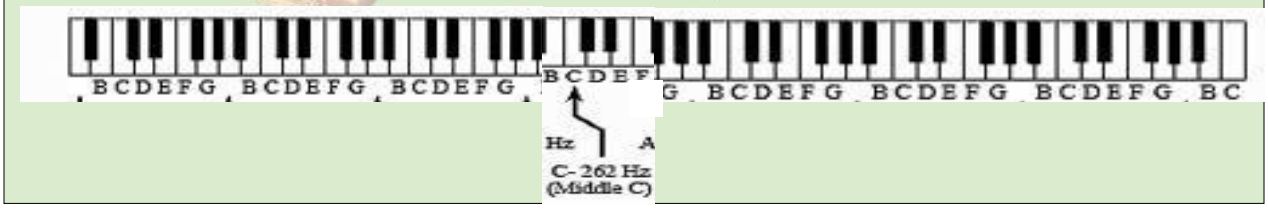

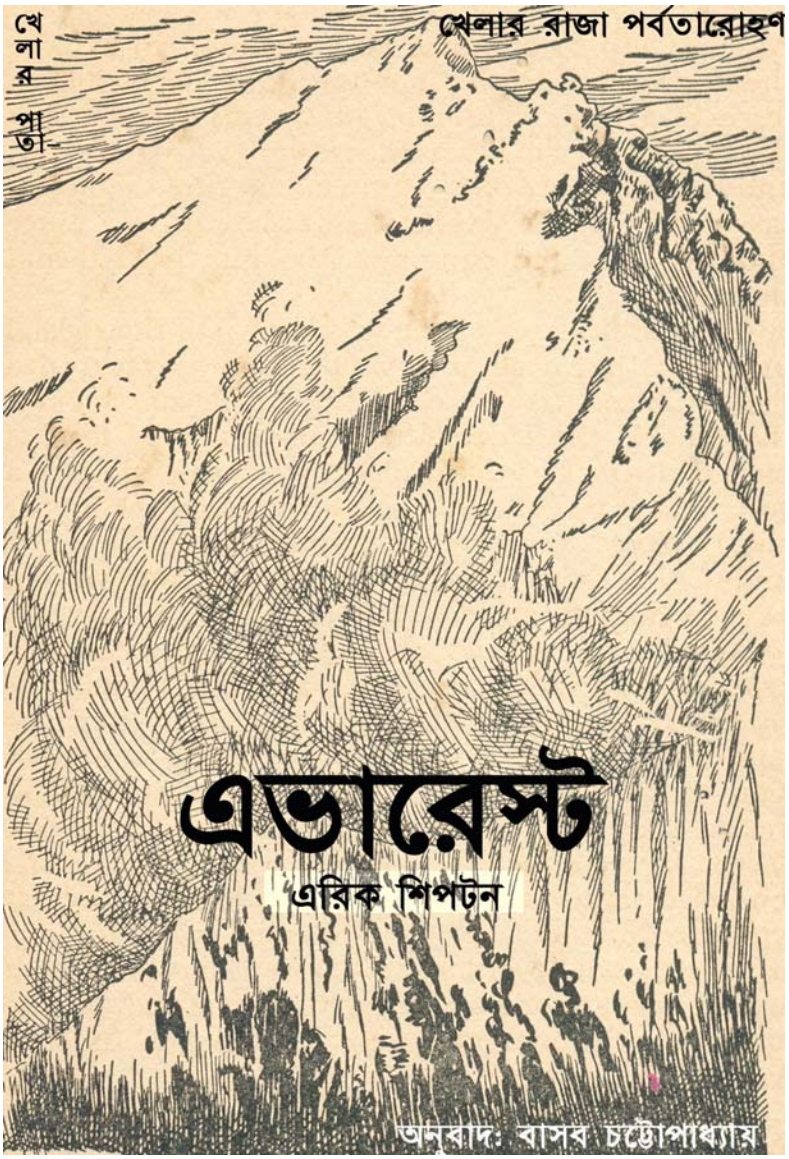

নর্থ কলের পূর্ব দিয়ে এভারেস্টের রাস্তা খুঁজে পাওয়াই আসল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ঐদিক দিয়ে রাস্তা অন্বেষণই অভিযাত্রীদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ হয়ে উঠল।

তারা কিন্তু জানতো নর্থকলের পূর্বদিকের রাস্তা তাদের খুব কাছেই রংবুক হিমবাহের কিছু মাইল উপরে একটি সংকীর্ণ গিরিসংকট ধরে পূর্বদিকে এগিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা হিমবাহ দিয়ে ওঠানামার পথে এই পথটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। আসলে কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকামুখ ছিল। পথটা ছিল উঁচু আর খোলা। নর্থ পিকের পূর্ব দিকটাকে ঘিরে এটি এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব পাদদেশে এসে সমাপ্ত হয়েছে। নর্থকলের পূর্বদিকের পাদদেশের তুলনামূলক সহজ রাস্তার ম্যাপ পরে দেখানো হবে।

পথটাকে উপেক্ষা করবার ফলে অনাবিষ্কৃত পর্বতমালায় একটি পথ খুঁজে পেয়েও প্রতিনিয়ত ভুল হতে থাকায় দীর্ঘ সময় লেগে গেল তা শুধরে নিতে।এই ত্রুটির জন্য পরিশ্রান্ত হয়ে দলে অনেকেই শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল।

২৫ জুলাই রংবুক উপত্যকা ছেড়ে তাঁরা উত্তরদিকের পথ অতিক্রম করে অরুণ নদীর উপত্যকায় পৌঁছলেন।এই উপত্যকাটির নাম খাতরা। হাওয়ার্ড বিউরি এখানেই অভিযানের প্রধান দপ্তর স্থাপন করলেন। দপ্তর থেকে বিজ্ঞানীরা যখন অভিযানের খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত,ম্যালোরি ও বুলক তখন রংবুক হিমবাহ অণ্বেষণ করছিলেন। সুস্থ হবার পর রিবার্ণ সহ অভিযানের অন্য সদস্যরাও পুনরায় মিলিত হলেন।

পরবর্তী ছয় সপ্তাহের অভিযানে এভারেস্টের পূর্বদিকটি সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা তৈরি হল। ধীরে ধীরে মর্সেড ও হুইলারের কাছে অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান উন্মোচিত হল। অভিযাত্রীরা সিদ্ধান্তে এলেন, পূর্ব দিক দিয়ে এভারেস্ট আরোহণ করা যাবে না। নর্থকলের রাস্তাই যে এভারেস্ট আরোহণের সহজতম পথ ম্যালোরির এই বিশ্বাস অনুমোদিত হল।

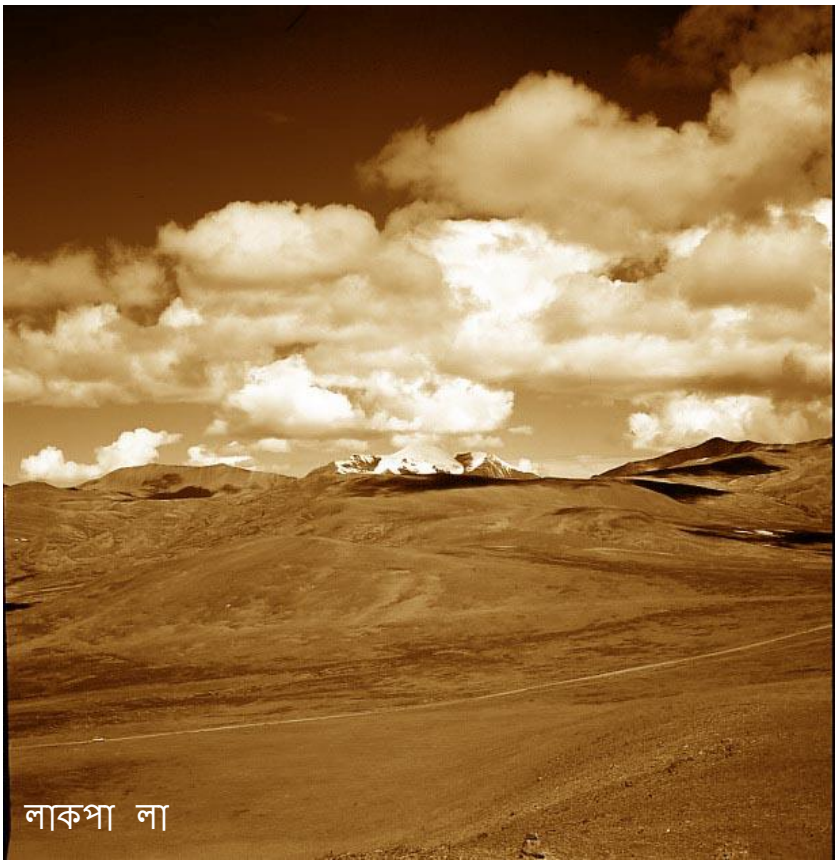
লাকপা লা

ম্যালোরি এবং বুলক দীর্ঘ উপত্যকা ধরে পথ তৈরি করতে করতে খাতরা থেকেও আরো পশ্চিমে ২২০০০ ফুট উচ্চ কলটিতে পৌঁছলেন। এই কলটির নাম লাকপা লা অথবা ঝোড়োহাওয়ার অঞ্চল। মধ্য এশিয়ার পর্বতমালার বহু শৃঙ্গ,হিমবাহ এবং কল-এর নামকরণ স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী করা হয়েছিল। যুগে যুগে মধ্যএশিয়ার ভ্রমণ অণ্বেষকরা বিভিন্ন হিমবাহ,শৃঙ্গ,উপত্যকার মানানসই নাম তৈরি করে সেটি যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানকার ভাষায় সে নাম রেখেছিলেন। এ পদ্ধতিটা খুবই সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। উচ্চ হিমালয়ে এভারেস্ট অঞ্চলের অধিকাংশ নামের উৎসেই উপরোক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। ,যেমন লোটসে (সাউথ পিক),নাপ্টসে(ওয়েস্ট পিক) এবং একটু আগে বলা লাকপা লা।

ম্যালোরি এবং বুলক এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব গাত্র থেকে ডানদিকে বিস্তৃত এক হিমবাহ দেখতে পেয়েছিলেন। পশিমদিকে বেসিনটির বিপরীত দিকে তাঁরা দেখেছিলেন অন্য একটি কল,যাকে নর্থ কল হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন যে এই দিক দিয়ে আরোহণ অপেক্ষাকৃত সহজ। শুধু তাই নয় তাঁদের আবিষ্কৃত এই নতুন হিমবাহ উত্তর-পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেটি কোনোভাবে রংবুক উপত্যকা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। পরে হুইলারের জরিপে জানা যায় এই হিমবাহ পূর্বলিখিত সংকীর্ণ গিরিখাতে প্রবেশ করেছিল। এই নতুন হিমবাহটির নাম রাখলেন পূর্ব রংবুক হিমবাহ।

ম্যালোরি এবং বুলক খাতরায় ফিরে তাঁদের আবিষ্কারের কথা সকলকে জানালেন। দল তখন দুটি বিকল্পের সম্মুখিন হয়ে কোনটি গ্রহণ করবে সেই ধন্দে পড়ল। হয় তারা তাদের রংবুক হিমবাহের উপরের পথ ধরে এগোবে,নতুবা তারা খাতরার পশ্চিম উপত্যকা ধরে লাকপা লা অতিক্রম করে হিমবাহের ওপর অঞ্চলের অধিত্যকা ধরে নীচে নামবে। ম্যালোরি দ্বিতীয় বিকল্প কঠিন পথই বেছে নিলেন। কারণ এই পথে অনেক কম সময়ে তাঁরা লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারবেন বলে মনে করলেন। অভিযান বিলম্বে শুরু হওয়ায় শীতও এগিয়ে আসছিল। অভিযাত্রী দল ইংল্যান্ড ফেরার আগে পর্যন্ত ম্যালোরির আবিষ্কৃত নর্থ কলে পৌঁছনোর এই রাস্তাটিই যে হবে একমাত্র সঠিক এবং সহজতম পথ তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে রইল।

কিন্তু তবুও শৃঙ্গ আরোহণ যে দূর অস্ত সে কথা তাঁরা অবচেতন মনে পোষণ করছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন এভারেস্টের উঁচুর দিকের ঢালে-এ পৌঁছেছিল তখন তারা নতুন করে বুঝেছিল এভারেস্ট শৃঙ্গের এ উচ্চতা আরোহণে কী পরিমাণ শ্রম এবং সাহস প্রয়োজন।

সেপ্টেম্বরের শেষে হাওয়ার্ড-বিউরি, উলাসটন, রিবাণ, বুলক, হুইলার এবং ম্যালোরি ফের খাতরা উপত্যকায় পৌঁছে এবং ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় লাকপা লা-র নিচে শিবির স্থাপন করলেন। শেষ পর্বের অভিযানের জন্য তখন সকলেই প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাতিক্রম অভিযাত্রী রিবার্ণ। অসুস্থতার জন্য তাঁকে শিবিরে রেখে যাওয়া হল। অভিযাত্রীরা ২২ শে সেপ্টেম্বর ভোর ৪টের সময় ২৬ জন মালবাহককে সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

তাঁরা লাকপা লা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলেও কলটির শীর্ষস্থানের নিকটেই শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু অভিযাত্রীদের কাছে সে রাত বড় সুখের হল না। ছোট্ট তাঁবুর চারপাশে বায়ুর হুংকারে এবং শূন্যের নীচের তাপমাত্রার প্রভাবে তাঁদের রাত কাটাতে হল। ওঠার পরেও উচ্চতার কারণে সকলেই অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠলেন।

নর্থ কল-এর বিশাল তুষার ঢালের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল পুরো অভিযাত্রী দলের পক্ষে সামনের পথ অতিক্রম করা খুবই কঠিন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অধিকতর দক্ষ তিনজন আরোহী ম্যালোরি, বুলক এবং হুইলার কিছু মালবাহককে সাথে করে ঐ দুর্গম রাস্তা পাড়ি দেবেন। তাঁরা হিমবাহ অতিক্রম করে এবং দীর্ঘ রাস্তা হেঁটে শিবির স্থাপন করলেন। পরের দিন ২৪ শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১.৩০ টায় অভিযাত্রীরা ছমাস পূর্বে বহুদূর থেকে দেখা সেই অধরা নর্থ কলের শীর্ষে পৌঁছলেন।

পথটি সমপর্কে ম্যালোরি লিখেছেন, ‘‘রাস্তাটা নি:সন্দেহে সহজ ছিল। দীর্ঘ পথ জুড়ে থাকা নুড়ি পাথর ও বরফের ঢাল চড়া কঠিন ছিল ন, বিপজ্জনক তো নয়ই।’’ লক্ষ্যস্থলের সহজ পথ খুঁজে বের করে এইভবে অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হল।

নর্থ কলের বিশাল তুষার ঢাল

আরোহীরা তবুও ক্লান্ত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অভিযাত্রীদের এমনই অবস্থা হল সে মুহূর্তে অধিকতর উচ্চতায় বেয়ে ওঠার ক্ষমতা তাঁদের ছিলনা। উল্টে, প্রচন্ড বাতাসের বেগ অভিযাত্রীদের বেশ চিন্তায় ফেলে দিল।। কলটির নীচে বরফের বিশাল প্রাচীরের সামনে মাথা নত হয়ে গেল ম্যালোরি এবং তার সহ অভিযাত্রীদের ।

সেই অভিজ্ঞতার কথা ম্যালোরি লিখে গেছেন এই ভাষায়---যত উঁচুতে উঠবেন ততই ভয়ংকর চেহারা নেবে হিমালয়। এভারেস্টের প্রস্তরপ্রাচীরের গায়ের তুষারধুলি তীব্র হাওয়ায় ভর করে এসে ক্রমাগত ঘা মারছিল আমাদের চলার পথে। তুষারকণাবাহী ঝড়ের হাওয়া পাহাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা খেয়ে সটান ওপরের দিকে উঠে এসে তীব্র তুষারঝড়ের রূপ নিয়ে নেমে যাচ্ছিল প্রস্তরগাত্রের উল্টোদিক হয়ে।

পূর্ব রংবুক হিমবাহের শিবিরে ফিরে আসা দলটির সামনে এর ফলে আর কোন বিকল্প রইল না। দলটি লাকপা লা অতিক্রম করে খাতরা উপত্যকায় ফিরে এল ফের। এভারেস্ট শৃঙ্গের প্রাথমিক অনুসন্ধানের সমাপ্তি হল।

কিন্তু অভিযান অন্য অর্থে সফল। কারণ এভারেস্টের শীর্ষ আরোহণের গোটা একটা রাস্তা এইবারে খুঁজে পাওয়া গেল। ১৩০০০ বর্গমাইল অঞ্চলকে জরিপ করে তার মানচিত্র

লিপিবদ্ধ করা হোলো। শুধু তাই নয়, এ অভিযানে এই এলাকার প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যবান তথ্যও সংগৃহীত হয়েছিল।

(চলবে)

এশিয়ার উপকথা

জানাচ্ছেঃ মহাশ্বেতা

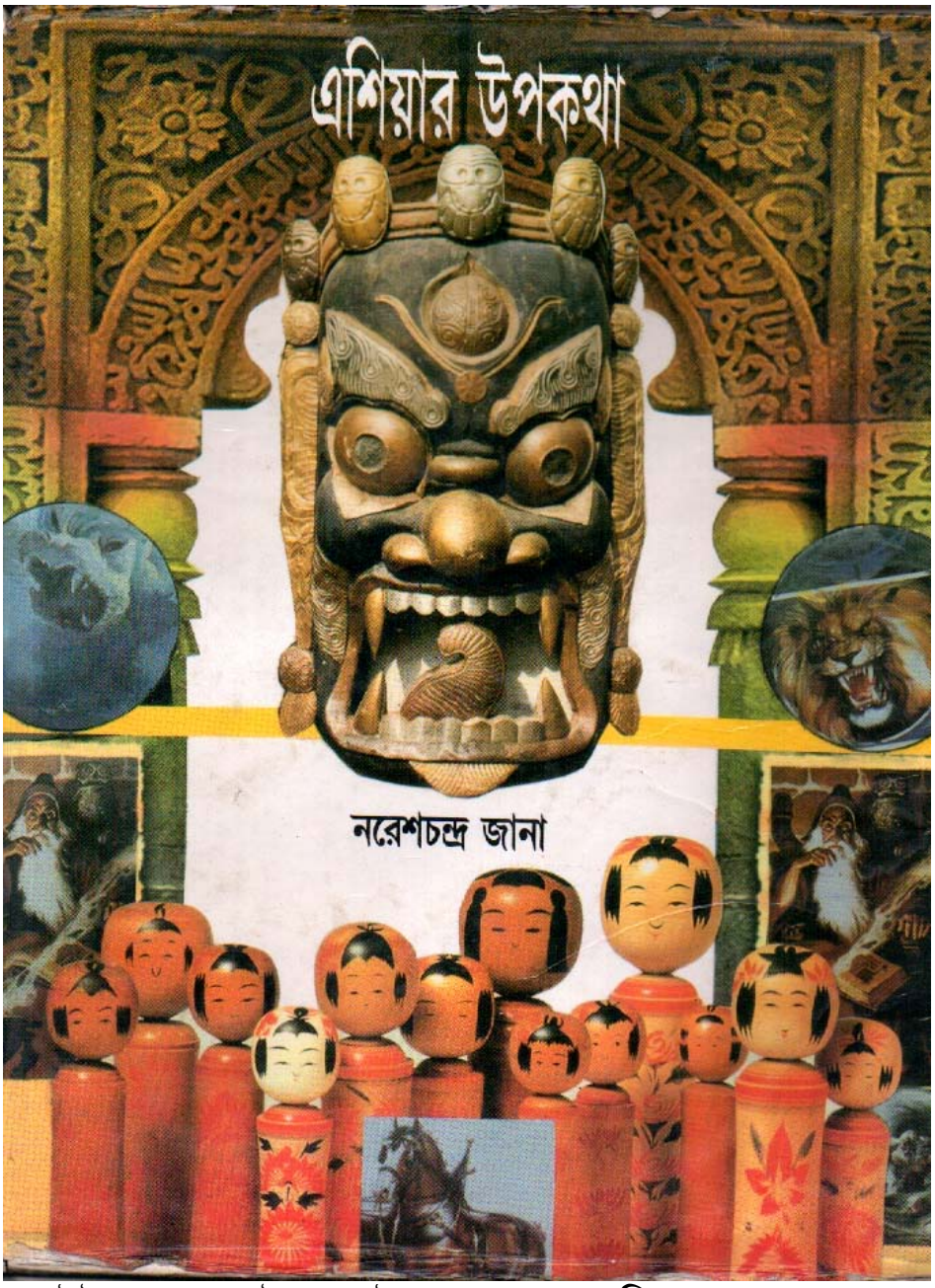

বইটা আমি আমার আট নম্বর জন্মদিনে পেয়েছিলাম। কে দিয়েছিল মনে নেই, তবে প্রচ্ছদে অনেক ধরণের পুতুল আর ভূতুড়ে মুখোশের ছবি দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল বইটা। তার পরে প্রায় রোজই খেতে বসার সময় এই বইটা সাথে নিয়ে পড়তাম। তাই বইটার প্রায় প্রত্যেকটা পাতায় শুকনো ভাত কিংবা হলুদ হলুদ ছাপ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। সে সময় বইটার প্রত্যেকটা গল্পই মুখস্ত হয়ে গেছিল আমার। আমার

এত প্রিয় বই বলেই ভাবলাম তোমাদেরকে এর ব্যাপারে জানাই।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়ায় মোট ৩২ খানা দেশ রয়েছে। একদম পুবে জাপান থেকে শুরু করে পশ্চিমে ইরান – প্রত্যেকটি দেশের আছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি আর নিজস্ব লোককথা। এশিয়ার উপকথা বইটা এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের কিছু জনপ্রিয় আবার কিছু স্বল্পপরিচিত লোককথার সংকলন। সব স্বাদেরই গল্প আছে বইটাতে। মজা চাইলে হাসির গল্প পাবে, আবার ভয় চাইলে ভয়াল গল্প পেয়ে যাবে, দুঃখ চাইলে দুঃখের গল্প আর ম্যাজিক চাইলে ম্যাজিকের গল্প – সবরকমেরই উপকথা রইয়েছে বইটাতে। ভারত থেকে নেওয়া শ্যামা পাখির গল্প যেমনি মজাদার, ঠিক তেমনি ভয়ের হচ্ছে কোরিয়ার ডাকিনী বুড়ির গল্প, আবার সিঙ্গাপুরের লাল পাহাড়ের গল্প ঠিক তেমনিই দুঃখের। প্রত্যেকটা গল্পের সাথেই মজার মজার ছবিও রয়েছে। শীতকালে দুপুরবেলা বারান্দায় বসে পড়ার পক্ষে আদর্শ বই।

তোমরা পড়ে জয়ঢাককে জানিও কিন্তু কেমন লাগলো।

সংগ্রহ ও অনুবাদঃ নরেশচন্দ্র জানা

ছবিঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

দামঃ ৬০ টাকা

প্রকাশকঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

টাইম মেশিন আমাদের নিয়ে চলেছে পুরোন শতাব্দির মধ্যভারতের ঠগীদের দুনিয়া। ঠগি ইসমাইলের এক শিকারের ছেলে এখন ইসমাইলকেই বাবা বলে জানে। সে বছর ঠগী ধর্মে তার দিক্ষার পর বাবার সঙ্গে সে প্রথম ঠগী অভিযানে বের হয়েছে। তারপর----

বদ্রীনাথ ছিল আমাদের নিশানবাহক। সবার আগে আগে সে 'খুশি'(একটা মন্ত্রপূত কুড়ুল) কাঁধে হাঁটছিলো। সন্ধের মুখমুখ সে আবার নতুন করে পিলাহু আর থিবাহু শুনতে পেল। পরদিন সকালে পথে যে প্রথম নালাটা পাওয়া গেল তার ধারে বসে গুড় আর ভেজানো ডালের প্রসাদ খাওয়া হোল একটু একটু। সে নাকি ভারি পবিত্র কাজ। এইভাবে কয়েকদিন চলতে চলতে আমরা এসে পৌঁছোলাম গনেশপুরে। শহরে পৌঁছে আমরা ঘাঁটি গাড়লাম শহরের বাইরের একটা আমবাগানে, আর লোক ভুলিয়ে ধরে আনবার কাজ করে যে সোথাইরা তাদের পাঠিয়ে দেয়া হল শহরের দিকে, শিকারের সন্ধানে। এরা ছিলো, বদ্রীনাথ আর গোপাল। শুনলাম, মিষ্টি কথায় লোক ভুলিয়ে আনবার কাজে দুজনেই ভারী পটু নাকি। সন্ধেবেলায় তারা ফিরে এলে আমরা সবাই মিলে তাদের ঘিরে বসলাম্তাদের কাজকর্মের খবর নেবার জন্য। বদ্রীনাথ বলল, ''আমি গেছিলাম শহরের বাজার এলাকার দিকে। গোটা বাজার ঘুরে ঘুরেও মনের মত কোন শিকারের খোঁজ না পেয়ে যখন ফিরে আসব ঠিক করেছি তখন হঠাৎ শুনি একজন বেশ ভদ্র চেহারার বুড়োর সঙ্গে এক দোকানদারের ঝগড়া বেঁধেছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বুড়ো আমাকে সাক্ষি মেনে বলে দোকানদারটা ঠক। তাকে সে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে যাবে। ওদিকে দোকানদারও সহজে বশ মানবার পত্র নয়। তারও মুখ চলেছে তুবড়ির মতন। আমি অনেক চেষ্টায় ঝগড়ার নিষ্পত্তি করতে বুড়ো আমার ওপরে খুব খুশি। বলে সে নাগপুরের রাজার দরবারে চাকরি করে। ছেলেকে নিয়ে ছুটির পর কাজের জায়গায় ফিরে চলেছে। কথায় কথায় সে আমায় কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাব এইসব নানান কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি বুড়োকে খুব করে বুঝিয়েছি যে আমরা অনেক যাত্রী চোরডাকাতের ভয়ে একটা বড়ো দল বেঁধে একসঙ্গে নাগপুরেই যাচ্ছি। গনেশপুরের লোক বেজায় জোচ্চোর। সেখানে রাতের বেলা থাকলে বিপদ হতে পারে। তাই শহরে না ঢুকে উপস্থিত শহরের বাইরে আস্তানা গেড়েছি আমরা।বুড়ো চাইলে আমাদের সঙ্গেই এসে থাকতে পারে। সে টোপটা খেয়েছে। আমি তখন গোপালকে তার কাছে রেখে এসেছি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দুজনকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য। মনে হয় সূর্য ডোববার আগেই ওরা পৌঁছে যাবে।''

''বারিক আল্লা,''বলে বাবা লাফিয়ে উঠলো একেবারে। বলে, ''যা বললে তাতে লোকটা আর খানিকক্ষণের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবার কথা। রাজদরবারে কজ করে যখন, তখন ব্যাটার কাছে টাকাপয়সা সোনাদানাও মন্দ হবে না। সেগুলো লুটতে পারলে নাগপুর অবধি আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না।আর একটুক্ষণ দেখি। নিজে থেকে এলে তো সমস্যা কমল। আর না এলে কটা লুগাইকে(যারা ঠগীদের শিকারের জায়গা স্থির করে সেখানে আগেভাগে মরা লুকোবার গর্ত কেটে রাখে) পাঠিয়ে দেবো আগেভাগে গিয়ে নাগপুরের রাস্তায় কোথাও ভিল (শিকারের স্থান)তৈরি করে রাখতে। ব্যাটার পিছু পিছু গিয়ে সেইখানে ধরবো।''

অবশ্য তার আর দরকার হলো না। সূর্যাস্তের আগেই বুড়ো দেখি তার ছেলেকে নিয়ে আমাদের ঘাঁটিতে এসে উপস্থিত। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ। সঙ্গের ছেলেটাও খুব সুন্দর দেখতে। সঙ্গের মহিলাদের গাড়িতে রেখে তাদের আব্রুর জন্য তার চারপাশে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। বাবা আর আমাদের বাকি দলবল ততক্ষণে কার্পেট বিছিয়ে সভা করে বসেছে। সেখানে বসে বসে দুপক্ষের কথাবার্তা শুরু হল। হাসিঠাট্টা, কথাবার্তা চলছিল সবার মধ্যে । বুড়ো দেখি হাসি হাসি মুখে বারবার বদ্রীনাথকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ওই বিশ্রী শহরটা থেকে তাদের উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে জায়গা দেবার জন্য। লোকদুটো জানেনা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেয় তাদের প্রাণ যাবে আমাদের হাতে। যখন তারা তাদের গাড়ির গায়ে পর্দা টাঙাচ্ছিলো, ঠিক তখনই আমি বাবার সঙ্গে গিয়ে তাদের জন্য কবর খোঁড়াবার কাজ চালু করে দিয়ে এসেছি। বুড়ো বলছিলো, ''উ:। ওই শহরটার মধ্যে থাকলে আজ রাত্রে দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা এক করতে পারতাম না আমি। এখানে এসে কি যে সোয়াস্তি হয়েছে আমার! আজ রাতে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোন যাবে।''

শুনে আমার বসা এক বুড়ো ঠগী মুখ ভেঙচে নিচু গলায় বললো, ''হুঁ হুঁ। ভালো করে ঘুমোবার বন্দোবস্তই করবো আমি তোমাদের আজ।''

''কীভাবে?'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বলতেই সে ইশারায় গলার ওপর দিয়ে হাতটা চালিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, আজ সে হবে ভুত্তোটদের (যে ঠগীরা খুনটা করে) একজন। তারপর বলে, ''ব্যাটার ওপর আমার একটা পুরোন রাগ আছে। আজ তার বদলা নেবো।''

''কী করেছিলো বুড়ো?''

''উঁহু, এখন না। কাল রাতে মজলিশে বসে গল্পটা বলবো তোমায়। লোকটার নাম ব্রিজ লাল। ও যত মানুষের প্রাণ নিয়েছে আর যতো খারাপ কাজ করেছে তার কাছে আমরা ঠগীরা তো ছেলেমানুষ! কিন্তু. এইবারে ব্যাটার আয়ু ফুরিয়েছে। প্রাণটা একেবারে মুখের আগায় এসে গেছে। একটা রুমালের প্যাঁচ, বাস! সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।''

''আর সঙ্গের ছেলেটা? ওকে মারবে না তো?''

''হুঁ:! ছেড়ে দিই আর ফিরে গিয়ে সব বলে দিক দুনিয়াশুদ্ধু লোককে!তারপর আমরা দলবল শুদ্ধু গিয়ে ফাঁসিকাঠে লটকাই! না হে মিঞাঁ। আমরা অত বোকা নই। তুমিও কিছুদিনের মধ্য সব শিখে যাবে দেখো।''

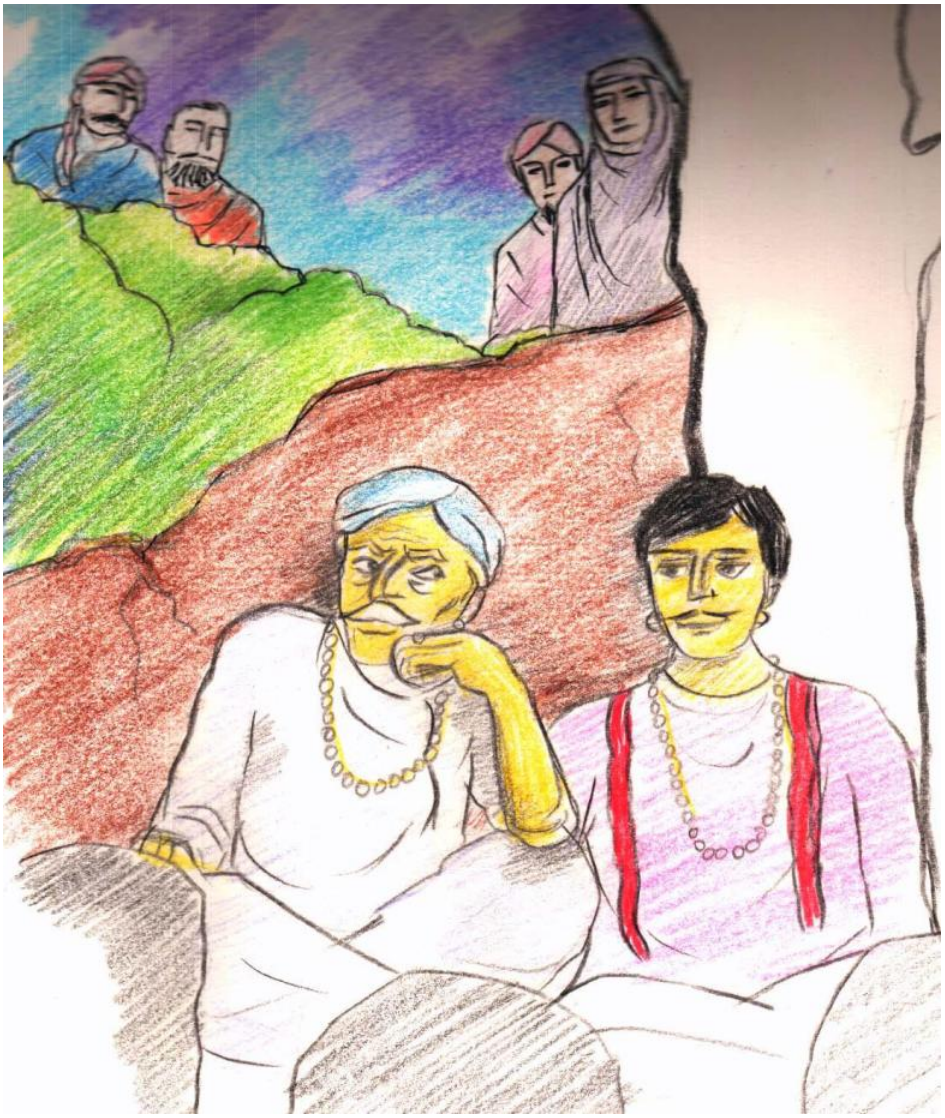

বলতে বলতে সে গিয়ে ব্রিজলালের ঠিক পেছনে জুড়ে বসেছে। বুড়ো একবার ঘুরে তাকাতে গিয়েছিলো, তা বাবা বলে, ''আরে ও কিছু নয়। আমাদের দলের একজন আপনার গল্প ভালো করে শোনবার জন্য কছে এসে বসেছে। বুড়ো নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে ফের কথাবার্তা শুরু করল। কেবল আমার চোখে পড়ছিলো, তার পেছনে বসে বুড়ো ঠগী তার খুনি রুমালটাকে হাতে নিয়ে নিরীহ ভাবে নাড়াচাড়া করে চলেছে। উত্তেজনায় আমার মাথা ঘুরছিলো। চোখের সামনে বুড়োটা বসে আছে। পাশে তার সুন্দর দেখতে ছেলেটা। তাদের পেছনে সতর্কভাবে অপেক্ষা করে চলেছে তাদের খুনীরা , সর্দারের সংকেতের অপেক্ষায়। একবার ইচ্ছে হলো উঠে এক দৌড়ে পালিয়ে যাই। তারপরে মনে হলো তাহলে তো আগে আমার প্রাণ যাবে, এরাও বাঁচবে না। বারকয় দুর্ভাগা মানুষদুটোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার্ চেষ্টাও করে দেখলাম। ফল হলো না। চোখদুটো অবাধ্যের মতো ফের ঘুরে ফিরে আসছিলো তাদের দিকেই। খানিক বাদে আর সহ্য করতে না পেরে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে

আমার বাবা পেছন পেছন এসে ফিস ফিস করে বলে , ‘‘কোথায় যাচ্ছিস? আজ তোর জাতব্যবসায় হাতেখড়ির পালা। তোকে পুরোটা দেখতে হবে।’’

বললাম, ‘‘আমার শরীর ভালো লাগছে না। বাইরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে এসে ফের বসবো।’’

‘‘ছ্যা:। কাপুরুষ কোথাকার। এই মনের জোর নিয়ে ঠগী হতে চাস তুই? এখন যা, তাড়াতাড়ি করে ঘুরে আয়। দেরি হয়না যেন।’’

বাইরে বেরিয়ে একটু বাদেই মাথা ঠাণ্ডা হতে আমি ফের ফিরে এসে সভার মধ্যে আমার পুরোন জায়গায় বসে পড়লাম। শুনি বুড়ো তখন নাগপুরের রাজার সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি নিয়ে লম্বা গল্প ফেঁদেছে। সবে মাত্র সাদা চামড়ার সঙ্গে সমঝোতা করবার জন্য রাজাকে গালাগাল করতে শুরু করেছে সে এমন সময় বাবা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, ‘‘তাম্বাকু লাও।’’

এটাই ছিলো সে রাতের ঝিরনি (আক্রমণের সংকেত। প্রতিটি শিকারের সময় তা বদলে দেয়া হত ও ভুত্তোটদের সেদিনের শিকারের ঝিরনি কী হবে সেটা জানিয়ে দেয়া হত আগেভাগে।)

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

লোককথা

মহাশ্বেতা

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন সমুদ্র বলে কিছুই ছিল না পৃথিবীতে। পূব- পশ্চিম- উত্তর- দক্ষিণ – পাপুয়া নিউ গিনির চারিদিকে যতদূর দু'চোখ যেত শুধু ছিল গরম বালিতে ভরা শুকনো মরুভূমি। কোন কোন জায়গায় অবশ্য গাছপালায় ঢাকা পাথরের ছোট ছোট টিলা ছিল। তাতে বইত ছোট ছোট নদী। সেই টিলা ঘিরেই কয়েকঘর মানুষ চাষবাস করে কোনরকমে দিন কাটাতো। সে ছাড়া বাকি মরুভূমিতে ছিল না এককোঁটাও জল।

এইরকমই একটা টিলার মাথায় একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতো এক বুড়ি থুড়থুড়ি, নাম তার ছিল কিলাও। বয়সের ভারে তার চামড়াটাও ছিল একদম কোঁচকানো। তার স্বামী, ছেলে- মেয়ে, নাতিপুতি সবাই অনেকদিন আগে মরে গিয়েছিল, তিন কুলে আর ছিল না কেউ। অনেক নিচে যে কয়েকঘর মানুষের বসতি, তাদের সাথেও কোন যোগাযোগ ছিল না বুড়ির। ঘরে তার ছিল না কোন পোষা জন্তু, না ছিল কোন চাষজমি বা তরকারি- বাগান। তার ভেঙে পড়া শরীরে যতটুকু শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে সে কোনরকমে জঙ্গলের ফলমূল এনে তাই খেয়ে তার দিন গুজরান করত। কিলাও- এর কুঁড়ের ঠিক পাশ দিয়ে বয়ে যেত একটা ছোট তিরতিরে নদী। প্রতিদিন বুড়ি সেই নদী থেকে দুটো নারকোলের মালা ভর্তি করে জল এনে ঘরে রেখে দিত। সেই জল খেয়েই তাকে বাকি দিন কাটাতে হত।

এরকম ভাবেই বুড়ির শেষ দিনগুলো সুখে না হলেও শান্তিতে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন একদিন। দেশে এল এক ভয়ঙ্কর খরা। গাছপালা শুকিয়ে গেল, নদীর জলও গিয়ে ঠেকলো তলানিতে। কিলাও- এর জল খাওয়াও একটু একটু করে কমে আসতে লাগলো। একবার, তিন- চারদিন ধরে কিলাওইয়ের একটা নারকোলের মালার জল খেয়েই কাটাতে হল। চারদিনের দিন জলের অভাবে কিলাও- এর প্রায় মরো মরো অবস্থা। দুপুরবেলার তীব্র গরমে ঘরের মেঝেতে শুয়ে তেষ্টায় ছটফট করতে লাগলো বুড়ি। তার নারকোলের মালায় পড়ে ছিল তখন অল্প একটু জল। কিন্তু উঠে তা খেতে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না বুড়ির। মনে মনে বুড়ি চিন্তা করছে আর কতক্ষণ সে এভাবে বেঁচে থাকতে পারবে, ঠিক তখনই বাইরে থেকে একটা খস খস হিস হিস আওয়াজ এল। কিসের শব্দ তা দেখবার ইচ্ছে বা ক্ষমতা কোনটাই তখন ছিল না কিলাও- এর, তাই সে আগের মতোই শুয়ে রইল।

আওয়াজটা আস্তে আস্তে জোরালো হতে লাগলো। তারপর ঠিক যখন দরজার কাছ দিয়ে আওয়াজটা আসতে লাগলো, তখন সেদিকে চাইতে কিলাও দেখল একটা মোটাসোটা নীল সাপ দরজা দিয়ে তার ঘরে ঢুকছে। তার বিশাল দু'টো মাণিকের মতো চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ কিলাওকে জরিপ করে নিল সাপটা। তারপর কিলাওকে নিতান্ত নিরীহ দেখে সে কুঁড়ের ভেতরে ঢুকে পড়ল। কিলাও মনে মনে হিসেব করে দেখল যে সাপটা কম করে কুড়ি হাত লম্বা তো হবেই। সাপটার মোটা নীল শরীর ক্রমে ছোট ঘরটাকে ভরিয়ে ফেলল।

সাপটা হাঁপাচ্ছিল। কিলাও বুঝতে পারলো যে সাপটাও তার মতই জলতেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে। সাপটা কিছুক্ষণ আবার কিলাও- এর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ঘরের কোনে রাখা নারকোলের মালাটার দিকে। তার মধ্যে চিকচিক করছিল অবশিষ্ট জলটুকু। কিলাও কিছু বলার অবস্থাতে ছিল না তাই সে শুধু চেয়ে রইল। সাপটা নারকোলের মালার সবটুকু জল ঢকঢক করে খেয়ে নিল। জল খেয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল সাপটা। তারপর আস্তে আস্তে কিলাও- এর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে স্পষ্ট মানুষের গলায় তৃপ্তভাবে বলল,

"জল খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ।"

কিলাও বুড়ির অবাক হওয়ার বয়স অনেকদিন চলে গেছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল, "আমার তো যাওয়ার সময় এসে গেল বলে। আর বেশিক্ষণ বাঁচব বলে মনে হয় না। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার এই উপকার করে দিয়ে যেতে পারলাম, এই আমার অনেক।"

এই শুনে সাপটা যেন হাসল। বলল, "তোমার এখনো মরার সময় হয়নি বুড়িমা। তুমি আরও অনেকদিন বাঁচবে। তুমি আমায় তোমার শেষ সম্বলটাকে বিনাবাক্যব্যায়ে দিয়ে দিয়েছিলে, আমি এখন তোমায় তার প্রতিদান দেব।" তারপর

বুড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, "তোমার ছুরিটা দিয়ে আমার লেজের একটা টুকরো কেটে নাও। তারপর সেটাকে পাতায় মুড়ে নদীর পাশের জমিতে পুঁতে ফেলে দেখো কী হয়।"

কিলাও বুড়ি তা শুনে তো অবাক। বলল, "আমি জীবনে কোন প্রাণীর কোন ক্ষতি করিনি। আজ তোমার সুন্দর লেজ কাটি কেমন করে বল তো?"

সাপটা এবারও হেসে বুড়িকে বল, "চিন্তা কোরো না বুড়িমা। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যা বলছি তা কর তাহলে তোমায় আর কখনো জলকষ্টে থাকতে হবে না।"

কিলাও বুড়ি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সাপের কথামতো তার লেজের একটা টুকরো কেটে নিয়ে সেটাকে পুঁতে দিল নদীর ধারে। কিন্তু তারপরেই ক্লান্তির চোটে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। কয়েক ঘন্টা পর কিলাও বুড়ির ঘুম ভাঙলো জলের শব্দে। তখন রাত হয়ে গেছে। আকাশ ভর্তি তারা। সাপটাকে আশেপাশে দেখতে না পেয়ে বুড়ি ভাবলো সে বুঝি চলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে যেখানে বুড়ি সাপের লেজ পুঁতেছিল সেখানে শুকনো মাটির জায়গায় হঠাৎ করেই যেন তৈরি হয়ে গেছে একটা টলটলে জলে ভরা পুকুর। পুকুরটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। শুকিয়ে যাওয়া গাছেদের গোড়াগুলো ভেজাতে ভেজাতে পুকুরটা যেন বেড়েই চলেছিল। চাঁদের আলোয় কিলাও দেখতে পেল পুকুরের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউ। বেশ খানিকক্ষণ পর পুকুরটা বাড়া বন্ধ করল। কিলাও বুড়ির পা অবধি জল চলে এসেছিল ততক্ষণে। সে আঁজলা ভরে পুকুরের জল মুখে তুলে নিল। সে জলের স্বাদই আলাদা। যেরকম ঠান্ডা, সেরকমই মিষ্টি। কিলাও বুড়ি অনেকদিন পরে প্রাণ ভরে জল খেল। নারকোলের মালা ভর্তি করে সে পুকুরের জল নিয়ে গেল তার ঘরে। গায়ে তার পুরোন শক্তি যেন অল্প অল্প করে ফিরে এসেছে অনেকটাই।

রাতে অনেকক্ষণ শান্তিতে ঘুমোল সে। পরদিন সকাল সকাল উঠেই বনে ফলমূল খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল বুড়ি। আগে বনের ভেতর অল্প গিয়েই হাঁপিয়ে উঠত কিলাও বুড়ি, কিন্তু সেদিন অনেক দূরে গিয়েও সে একটুও ক্লান্ত হল না।

কয়েকদিন পুকুরের জল খেয়ে তার গায়ে জোয়ান বয়সের শক্তি অনেকটাই ফিরে এল। তারপর একদিন টিলা থেকে নেমে মরুভুমি অবধি গিয়ে প্রাণ ভরে খেজুর খেয়ে এল কিলাও। নিজের দুরন্তপনায় নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। এই কদিন আগেই তো সে মরতে বসেছিল জলতেষ্টায়। হাঁটতে চলতেও পারতো না ভাল করে। তাহলে হঠাৎ করে এ কী হয়ে গেল?

তাকে দেখতেও অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। পুকুরের টলটলে জলে একদিন নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে অবাক হইয়ে গেল কিলাও। তার কোঁচকানো

চামড়া টানটান হয়ে গেছে। ঝুলে পড়া গালগুলো আবার ফুলে গেছে যেন, গলার চামড়াও টানটান হয়ে গেছে অনেকটাই, মাথা ভর্তি সাদা চুল হয়ে গেছে চকচকে খয়েরি। কিলাও বুড়ির বয়স যেন বাড়ার বদলে কমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। সে বুঝতে পারলো সেই নীল সাপটা তার উপকারের কী প্রতিদান দিয়ে গেছে। মনে মনে সে সাপটাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানালো।

তারপর একদিন টিলার নিচের বসতি থেকে একটা অল্পবয়সী ছেলে টিলার মাথায় উঠে এল। তার গ্রামের মানুষ কিলাও- এর নাম শুনেছিল তাদের বাবা-কাকাদের মুখে। তারা বলত যে পাহাড়ের মাথায় এক থুড়ুথুড়ি বুড়ি একলা একটা

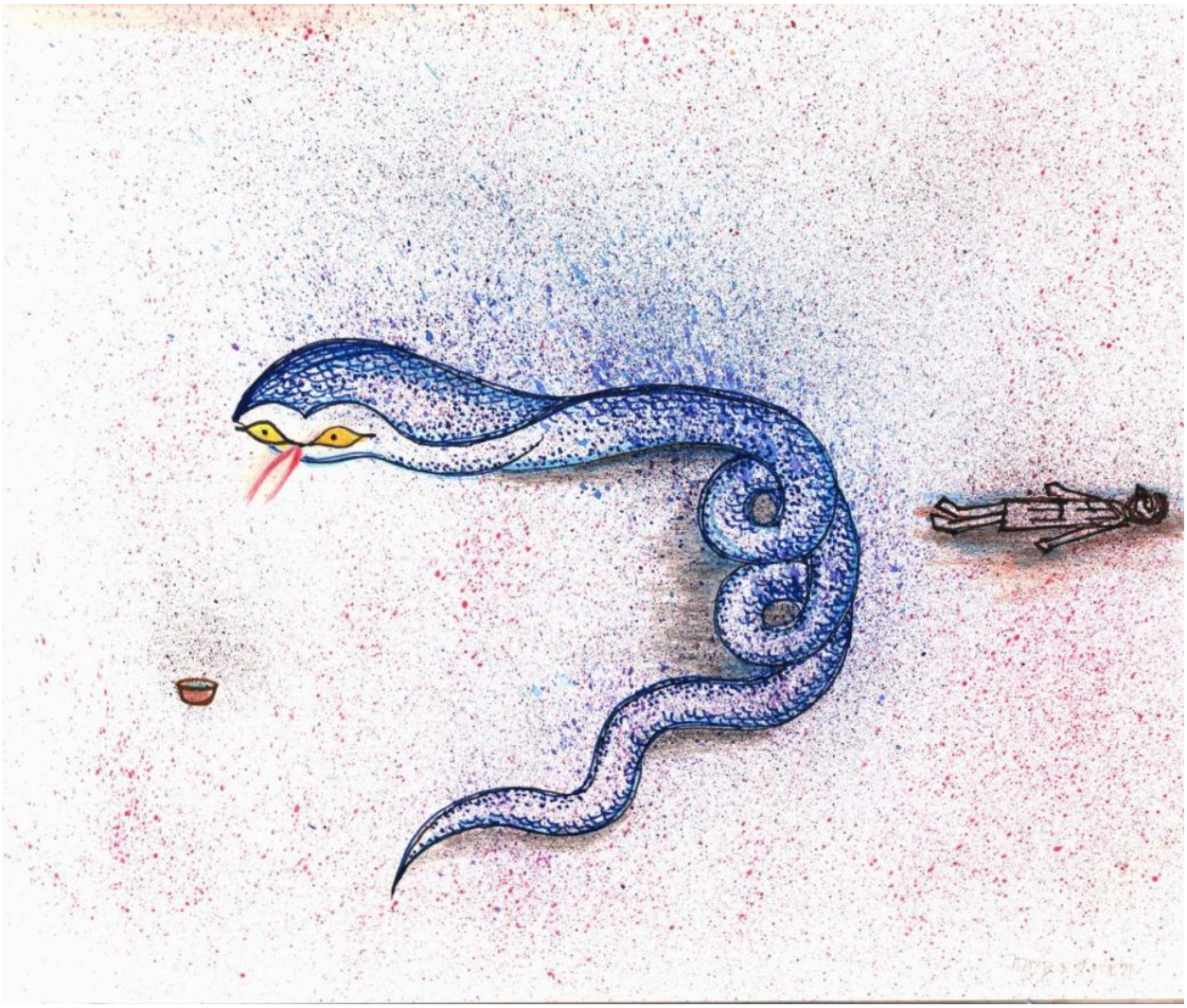

কুঁড়ে ঘরে থাকে। তার বয়সের কোন গাছ- পাথর নেই। সে ডাইনী, অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে। সে অনেকদিন আগের কথা। বুড়ি এখনও বেঁচে আছে কিনা তা কেউ জানতো না। তাই তারা এই খরার সময় ছেলেটাকে বুড়ির খোঁজে পাহাড়ের মাথায় পাঠিয়েছিল যদি সে তাদের কোন ধরণের সাহায্য করতে রাজি হয়।

ছেলেটা অনেক হেঁটে শেষ পর্যন্ত বুড়ির কুঁড়ে ঘরটাকে দেখতে পেল। জাদুমন্ত্রে সে ভয় পেত একটু আধটু। কিন্তু অতটা হেঁটে সে এতই ক্লান্ত যে সে ভয় চেপে কুঁড়ের দরজায় ধাক্কা দিল। ডাক দিল, "ও বুড়িমা, বুড়িমা? দরজাটা একটু খুলবে?" কিন্তু দরজা যে খুলল তাকে দেখে তো ছেলেটা অবাক! কোথায় থুড়থুড়ে বুড়ি, একজন পরমা সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুঁড়ের ভেতরে। সে হেসে বলল, "কী চাই?" ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, "আজ্ঞে, আমি কিলাও বুড়িকে খুঁজছিলাম। আপনি কি তাঁর নাতনি?"

মেয়েটা হেসে বলল, "না গো। আমিই কিলাও। এবার কী চাই বল তো?"

"কিলাও? কিন্তু-------- কী করে--- ?"

"একটু জল খাও না। এত হাঁপাচ্ছ। ভালো লাগবে। আমার সাথে এস, আমার পুকুরে অনেক জল আছে।" এই বলে সে তাকে সে তার জাদু পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। ছেলেটা আঁজলা ভরে জল খেল পুকুরটা থেকে। ততক্ষণে কিলাও ঘর থেকে তার জন্য একটা ফল কেটে নিয়ে এসেছে। সেটা পেয়েই ছেলেটা গবগব করে খেয়ে নিল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল অনেকদিন ভাল করে খায়নি সে। কিলাও- এর তা দেখে খুব মায়া হল।

খাওয়া শেষ হলে সে আমতা আমতা করে বলল, "আমি তো ভাবছিলাম কিলাও একজন----- "

"বুড়ি ডাইনী? না হে। আমিই কিলাও।"

ছেলেটা মনে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই মেয়েটা তাকে বোকা বানাচ্ছে। তারপর বেশ অনেকক্ষণ ধরে সে বুড়িকে পুরো টিলায় খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু সেরকম কাউকেই সে সেখানে খুঁজে পেল না। খালি সুন্দর মেয়েটি তার কাছে এসে গ্রামের গল্প শুনতে চাইল কয়েকবার। তাছাড়া সারা দুপুর টিলার মাথায় সে কাউকেই দেখতে পেল না।

সেদিন রাত্রিবেলা সেই জাদু পুকুরের জল খেয়ে গাছ তলায় ঘাস- পাতার বিছানা পেতে ছেলেটা শুতে গেল। কিলাও তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। পুর্ণিমার রাত। গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেই চাঁদের আলো তার গায়ে এসে পড়ছে তখনই ছেলেটা খেয়াল করল যে একটা অদ্ভূত জিনিস ঘটে গেছে। তার পায়ে একটা বিশাল বড় ঘা ছিল। একটা মশার কামর থেকে পেকে গিয়ে ওই ঘা- টা হয়েছিল। অনেক ওষুধ লাগিয়েও কোন কোন লাভ হয়নি। সেই ঘা- টা আর নেই। দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে নতুন চামড়া গজিয়ে গেছে ঘায়ের জায়গায়। অবাক কাণ্ড! তার হাতের একটা পুরোন কাটা দাগও দুপুরের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। ছেলেটা চালাক- চতুর ছিল। খুব শিগগিরিই সে দুয়ে দুয়ে চার করে পুকুরের কথা সব বুঝে গেল। আর যেই না বোঝা, ওমনি সে তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরটার কাছে গেল। নীচু হয়ে বসে হাতে করে

একটু জল নিয়ে সে তার কব্জিতে একটা ছোট্ট কাটায় ঢেলে দিল। ওমা! তার চোখের সামনে সেটা লাল থেকে খয়েরি হয়ে একেবারে শুকিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে নতুন চামড়াও গজিয়ে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ বসে বসে চিন্তা করল। এই জাদু পুকুরের জল নিয়ে কী করা যায়? এই জলের সন্ধান পেলে তার গ্রামের কত উপকার হবে তা সে জানতো। খরায়, অনাহারে একে একে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ছে তার গ্রামে। মারাও গিয়েছে কয়েকজন। তাদের কাছে এই পুকুর হবে ভগবানের আশীর্বাদ। তাছাড়া সে নিজে যদি এই জলের সন্ধান তাদের দেয় তাহলে তার সম্মানটাও তো কিছু কম হবে না। হয়তো গ্রামের প্রধানই বানিয়ে দিল তাকে। এইসব ভেবে ছেলেটা লুকিয়ে কিলাও-এর নারকোলের মালা দুটোতে করে পুকুরের একটু জল নিয়ে, সেগুলোকে পাতা দিয়ে মুড়ে নিয়ে সে সেই রাত্রেই তার গ্রামের দিকে পা বাড়ালো।

গ্রামের কেউই ছেলেটার গল্পটাকে শুরুতে বিশ্বাস করেনি। প্রথমে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তারপর রেগে গিয়ে মারধোর করারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন গ্রামের আঙুল- কাটা উম্বার হাতে সেই জাদু পুকুরের জল ঢেলে দেওয়ার পর তাদের চোখের সামনে কাটা জায়গা থেকে আঙুলগুলো আবার গজিয়ে উঠলো, তখন আর তারা ছেলেটার গল্পটাকে না বিশ্বাস করে পারলো না। তারপর আর তাদের কোন ঝগড়া, কোন কথা কাটাকাটি হল না। গ্রামের সবাই মিলে একসাথে বসে ঠিক করল যে তারা সবাই মিলে সেই পুকুরের কাছে যাবে। সেখানে বুড়ি ডাইনীর বাসা হোক আর যাই হোক, সেই জাদু পুকুরের জল তাদের চাইই চাই।

তারপর দু'দিন ধরে গ্রামবাসীরা খাবার- দাবার, পোষা জন্তু, কাপড়- চোপড় সব একজোট করে পাহাড়ে ওঠবার জন্য তৈরি হয়ে নিল। তারপর তৃতীয় দিন সকালে তারা সবাই মিলে কিলাও- এর বাড়ির উদ্দেশ্যে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল।

কিলাও অনেক দূর থেকে তাদের পায়ের শব্দ, চিৎকার- চ্যাঁচামেচি, তাদের সাথে আসা কুকুরদের ডাক শুনতে পেয়েছিল। তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময় জঙ্গলে আর শান্তি রইল না। পশু- পাখি সব তাদের আওয়াজে লুকিয়ে পড়লো। কিলাও তার কুঁড়ে ঘরের জানালা থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওরা আসুক। সে ওদের কোন কিছু করেই আটকাতে পারবে না। তাছাড়া কদিন পরেই সত্যিটা তো ওরা এমনিতেই জেনে যাবে----

সেই ছেলেটা সবার আগে, সবাইকে পথ চেনাতে চেনাতে আসছিল। গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছে। সেখানে পৌঁছোন মাত্র সে- ই প্রথম জাদু পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে, নারকোলের মালায় করে কিছুটা জল তুলে গ্রামের বুড়ো প্রধানের হাতে তুলে দিল। তারপর গর্বিত মুখ করে বলল, "খান প্রধান খান। খান আর জোয়ান হয়ে যান।"

কিছুক্ষণ পরেই বুড়ো গ্রাম প্রধানকে বাচ্চা ছেলের মতো মাথায় ফুল দিয়ে লাফাতে দেখা গেল। গ্রামের সব বুড়ো লোকেরা বাচ্চাদের মতো লাফালাফি করতে লাগলো। খোঁড়া লোকেরাও সেই জাদু জল খেয়ে দৌড়োতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা সবাই সেই পুকুরের জলে চান করে, দাপাদাপি করে নিজেদের যৌবন ফিরে পেল যেন। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে কেউ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কিলাওকে দেখল না। অঝোরে কাঁদছিল সে। তার লম্বা খয়েরি চুলের রাশিতে যে একটা দু'টো করে আবার পাকা চুল ফুটে উঠছিল, আর তার চকচকে, টানটান চামড়াও যে একটু একটু করে আবার ঝুলে পড়ছিল, সেটাও সে ছাড়া আর কেউ খেয়াল করল না।

দু'দিন ধরে গ্রামবাসীরা উদ্দাম আনন্দ করল সেই জাদু পুকুরের জল নিয়ে। কিন্তু তৃতীয় দিন পুকুরের জল আর আগের মতো রইল না। কদিনের বাঁধনহারা জলক্রীড়ার পর পুকুরের জল হয়ে গিয়েছিল ঘুলিয়ে, আর গায়ের ঘাম পড়ে পড়ে তার স্বাদও হয়ে গিয়েছিল নোনতা। পুকুরের চারধারের সবুজ, সতেজ ঘাস ও হাজার পায়ের পাড়ায় থেঁতলে গিয়েছিল পুরোপুরি। আজকের খেলায় আনন্দের চেয়ে নোংরামীই বেশি ছিল। একদল ছেলে তাদেরই দলের একজনকে ধরে বেঁধে জলে ছুঁড়ে ফেলছিল। আর পুকুরের ঘাটের কাছে কাদা কাদা জলে একদল মহিলা- পুরুষ পা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। খোঁড়ারা আবার খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে আর বুড়োরা আবার বুড়ো। হঠাৎ একজন প্রতিবাদ করে উঠল, "ধ্যাত! কোন কাজ হচ্ছে না! "

আরেকজন বলল, "সত্যি! আমার খোঁড়া পা- টায় আগের চেয়েও বেশি ব্যথা হচ্ছে এখানে চান করে।"

"আমার ঘা- গুলোর অবস্থা তো আগের চেয়েও খারাপ অবস্থা। কী জ্বালা করছে!"

"জলটা খারাপ হয়ে গেছে। জাদু সব চলে গেছে।"

"উল্টোপাল্টা কথা বলে কোথায় নিয়ে এল ছেলেটা! উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হচ্ছে দেখছি।"

তারপর একটা বাচ্চা পুকুরের জল আঁজলা ভরে মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিল। মুখ কুঁচকে বলল, "ইস! কি নোনতা। এত নুন এল কোত্থেকে?"

তারপর একটা বিশাল ঝগড়া শুরু হল। কথা কাটাকাটির পর যখন মারধোর শুরু হতে চলেছে তখন কে যেন সেই ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ওই তো। ওই যে ও- ই আমাদের এখানে এনে ঠকিয়েছে। ধর ওকে। উচিৎ শিক্ষা দাও।"

সবার চোখ পড়ল সেই ছেলেটার ওপর যে তাদের প্রথম সেই পুকুরের গল্প বলেছিল। দু'টো জোয়ান ছেলে গিয়ে তার দু'হাত ধরল। তারা বলল, "তুমি আর

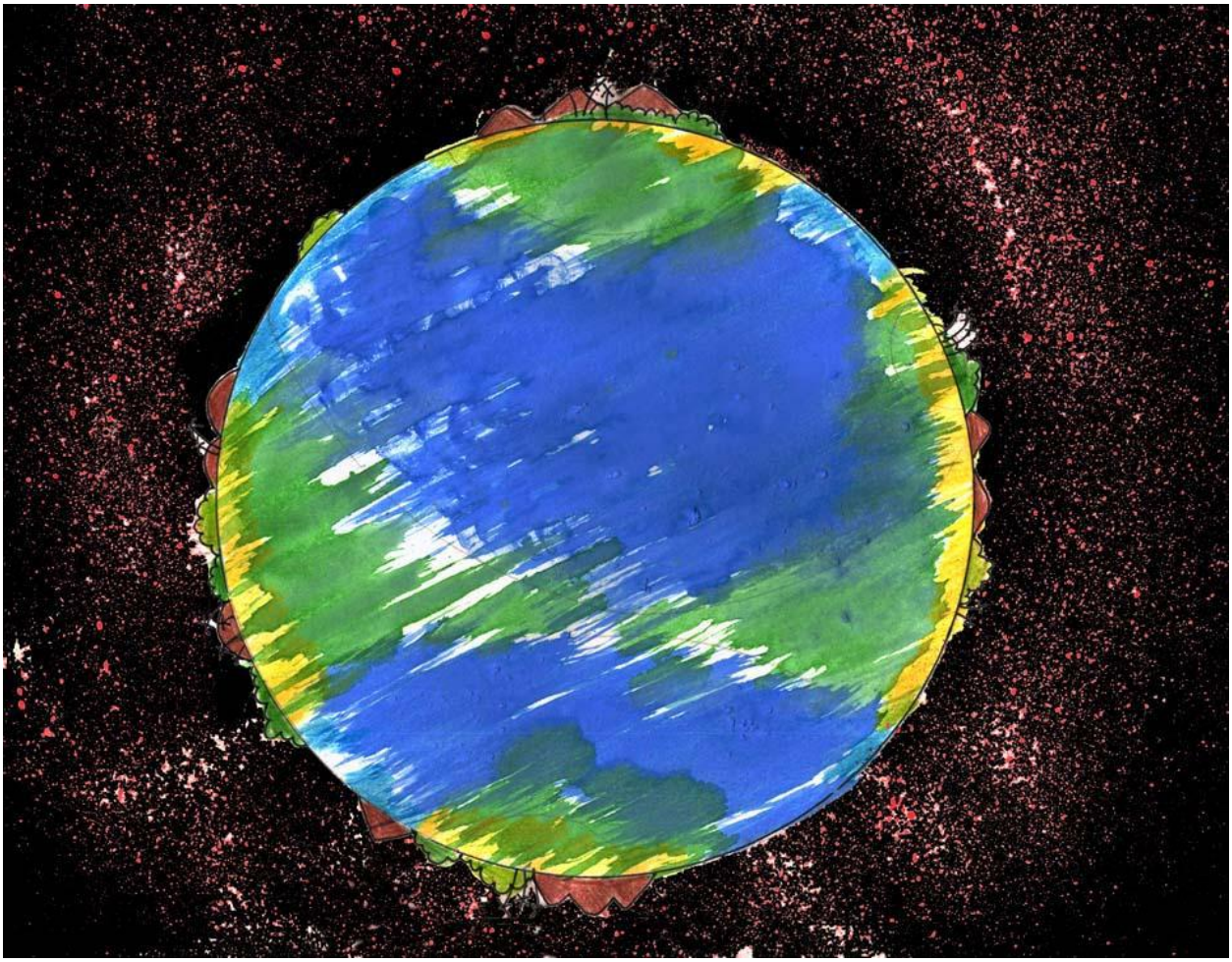

তোমার জাদু পুকুরের গল্প! যত্তোসব বস্তাপচা রূপকথা। আমাদের বোকা পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে এনে ঠকাতে পারবে ভেবেছিলে, তাই না? এবার দেখো কী করি।”

গ্রামবাসীরা সবাই তাদের কথায় সায় দিল আর রক্তজল করা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা কোনরকমে বলল, “আমি কিচ্ছু জানি না! কিলাও- কিলাও- ”

কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। গ্রামপ্রধান এগিয়ে এসে বলল, “তোমাকে এর শাস্তি তো পেতেই হবে। ওরে, একে এর জাদু পুকুরে ফেলে দে রে। দেখি। পুকুরের জাদু ওকে কী করে বাঁচায়।”

এই শুনেই তাকে ধরে থাকা দুই জোয়ান তাকে জলে ফেলে দেওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলো।

ছেলেটা ভয়ে চিৎকার করল, "আ- আমি সাঁতার জানি না! আমায় জলে ফেল না—"

ঠিক তক্ষুনি একটা প্রাচীন, জোরালো গলায় কে যেন বলে উঠল, "থামো--- "

সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখল থুড়থুড়ি বুড়ি কিলাও দাঁড়িয়ে রয়েছে পুকুরের ধারে। হাতে তার সেই সাপের লেজ কাটার ছুরি।

চিৎকার করে সে বলল, "তোরা যে না জেনে কত বড় ভুল করলি তা তোরা বুঝতি পারলি না। বোকার দল। তোরা কী হারালি তা তোরা কখনো জানতেও পারবি না। হায় হায়! কোন কুক্ষণে যে আমি তোদের এই জাদু পুকুরের সন্ধান দিয়েছিলাম। তোদের পাপে এর সমস্ত জাদু চলে গেছে। তোরা যা, ফিরে যা তোদের রাগ, দুঃখ, ঝগড়াঝাটি, অসুখ বিসুখের দুনিয়ায়। এই জাদু ভোগ করবার যোগ্য তোর নোস, আর কোনদিন হবিও না। তোরা জল চাইতিস, তাই না? তোদের আমি জল দেব। এত জল দেব যা তোরা কখনো কল্পনাতেও আনতে পারবি না। কিন্তু সে জল তোরা একফোঁটাও মুখে দিতে পারবি না। এই আমার প্রতিশোধ।" এই বলে সে তার ছুরি দিয়ে এক কোপ মারলো পুকুরের ধারে আর সেটাকে দু'ভাগ করে দিল। তারপর কিলাও বুড়ি মিলিয়ে গেল মাটিতে। কিন্তু তার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভুমিতে, চারিদিকে। গ্রামবাসীরা ভয়ার্ত মুখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

যেখানটাতে কিলাও বুড়ি তার ছুরি দিয়ে কোপ দিয়েছিল, সেখান থেকে পুকুরের জল সাপের মতো হিস হিস করে একটা শক্তিশালী নীল মোটা ধারায় লাফিয়ে ঝাপিয়ে নেমে যেতে লাগলো টিলার গা বেয়ে। গ্রামবাসীরা জলের তোড়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। গাছ ভেঙে, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর জল। মরুভূমি ভাসিয়ে দিল। যে দিকে দু'চোখ যায় তখন শুধু জল আর জল। সেই জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল গ্রামবাসীদের সবাইকে। তারপর গুমগুম করে সেই নীল জল এগিয়ে চলল তার রাস্তায় সবকিছুকে ধ্বংস করতে করতে। কিলাও বুড়ির কথাগুলো তখনো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আকাশে বাতাসে, "তোদের পাপের শাস্তি হবে। এর জবাব তোরা একদিন দিবি তোদের সত্যিকারের মালিকের কাছে। এখন প্রাণ বাঁচাতে হলে পালা। পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা কর।" কিন্তু তারা কেউ আর বাঁচতে পারল না সেই ভয়ংকর জলস্রোতের মুখে। এইভাবে সমুদ্রের জন্ম হল।

পাপুয়া নিউ গিনির লোককথা।
***উৎসঃ** ক্রিস্টোফার সমারভিল- এর 'সাউথ সি স্টোরিজ'*

ছবিঃ মৌসুমী

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ সোং (Song)

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
বাগেশ্বর - সোং	১৪২০ মি	৪০ কিমি	বাস
সোং - ঢাকুরি	২৬২১ মি	১৪ কিমি	হাঁটা
ঢাকুরি- খাতি	২০২৭ মি	৮ কিমি	,,
খাতি - ফুরকিয়া	৩২৪০মি	১৭ কিমি	,,
ফুরকিয়া - পিন্ডারি	৩৪৫৭ মি	৭ কিমি	,,

ট্রেনে হলদোয়ানি বা কাঠগোদাম আসুন। কাঠগোদাম থেকে বাগেশ্বর হয়ে সোং গ্রামে আসুন। বাগেশ্বর একটা রাত কাটিয়ে আসতে পারেন। গোমতি ও সরযুর সঙ্গম স্থলে একদিন থাকতে ভালই লাগবে। আগে ভারারি বা কাপকোট হয়ে আসতে হত। ভারারি থেকে ১০ কিমি হাঁটা পথে লোহারক্ষেত যেতে হত।

সোং থেকে লোহারক্ষেতে যেতে মোটে ৩ কিমি হাঁটতে হয়।এখন এপথটুকুও দিব্যি গাড়িতেই আসা যাচ্ছে, এমনকী আরও একটু এগিয়ে খালিধার বা আপার লোহারক্ষেত পি ডব্লিউ ডি বাংলো অবধি। যাঁরা বাগেশ্বর থেকে যাত্রা শুরু করবেন তাঁরা অবশ্য প্রথম রাতটি লোহারক্ষেতে (১৭০০ মি) কাটাতে পারেন। ডাকবাংলো আছে। সোং থেকে যাত্রা শুরু করলে ঢাকুরি গিরিপথ হয়ে ঢাকুরি বাংলোতে রাত কাটান। লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরি গিরিপথ ১১ কিমি কিন্তু কষ্টকর চড়াই ভাঙতে হবে ১১৩০ মি অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার ফুটেরও বেশি। এরপর অল্প উৎরাই ঢাকুরি

বাংলো অবধি।

খাতি থেকে অপেক্ষাকৃত কম চড়াই ভেঙে আসুন ১২ কিমি দূরের দোয়েলিতে, এখানে পিন্ডারি নদী ও কাফনি নালার সংযোগ স্থলে বাংলো রয়েছে। এখানে থাকা সম্ভব, অন্যথায় যারা পারবেন তারা আরও এগিয়ে ফুরকিয়ায় রাত কাটান। ফুরকিয়া থেকে ৭কিমি হেঁটে পৌঁছন পিন্ডারি হিমবাহে। এখান থেকে বালজৌরি, নন্দাকোট, নন্দাখাত,ছাঙ্গোছ, ট্রেলস্ পাস ইত্যাদির চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখে থাকতে ইচ্ছে করবে। তবে যাঁরা কাফনি হিমবাহ যেতে চান তাঁরা পিন্ডারি থেকে ফুরকিয়া হয়ে দোয়ালিতে (২৭৪৪ মি) বিশ্রাম নিন।

সুন্দরডুঙ্গা ও মাইকতোলি হিমবাহঃ-

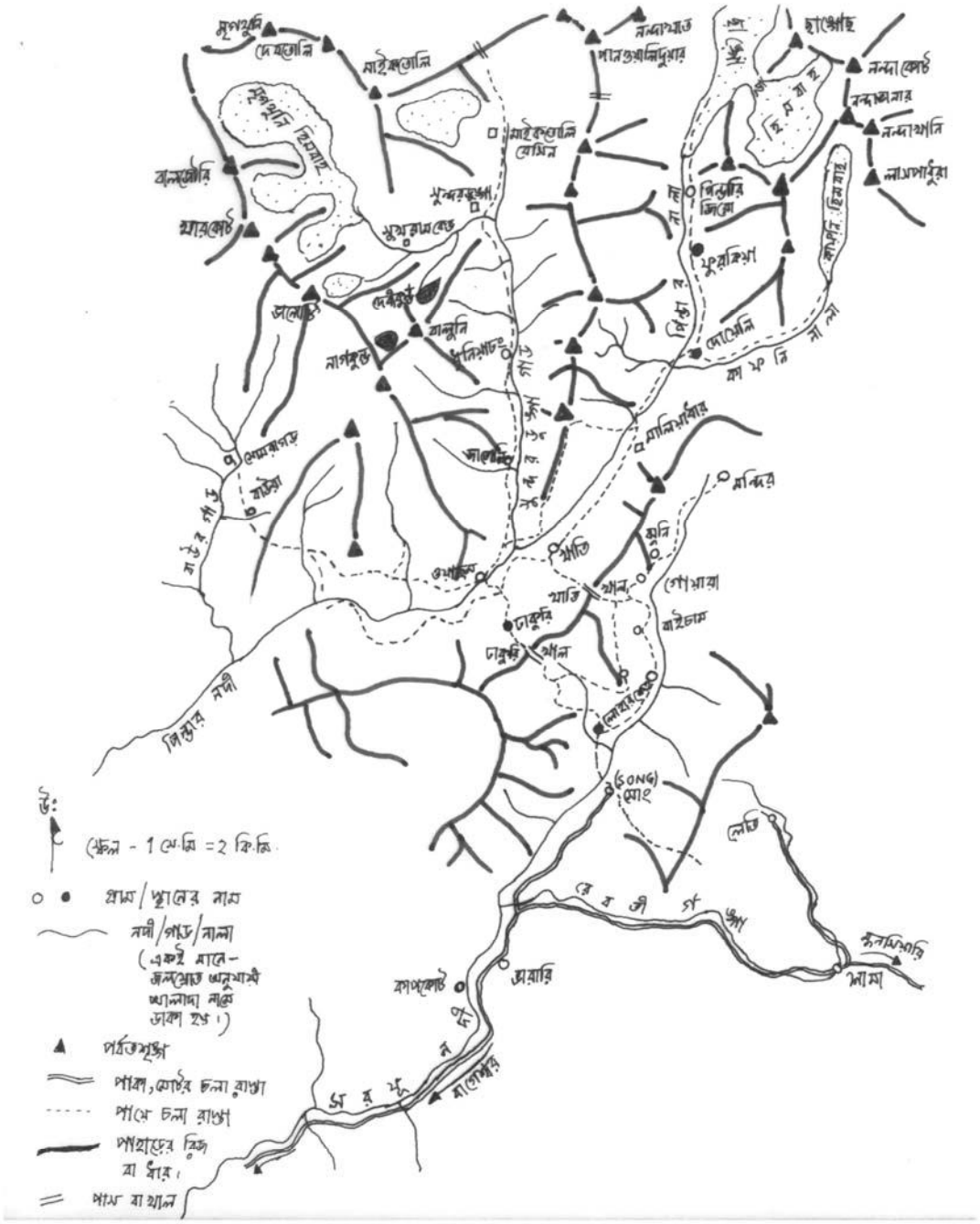

উপরোক্ত দুটি হিমবাহ এই সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকা দিয়ে পৌঁছন যায়। দোয়েলি থেকে কাফনি নালার উৎস কাফনি হিমবাহ দু-তিন দিনে দেখে ফিরে আসা যায়। কুমায়নী ভাষায় সুন্দরডুঙ্গা মানে সুন্দর পাথর। এই হিমবাহটি পিন্ডারির পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে মাইকতোলি ও মৃগথুনী শৃঙ্গের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়। এদুটি শৃঙ্গ থেকে দুটি ধারা এসে তৈরি হয়েছে সুন্দরডুঙ্গা নদীর।

কাফনী হিমবাহঃ-

কাফনি নালার উৎস এটি। নন্দাকোট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্পঃ খাতি

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
খাতি - দোয়েলি		১২	হাঁটা
দোয়েলি - কাফনি হিমবাহ	৩৮৬০ মি	১২	হাঁটা
কাফনি - খাতি	২০২৭ মি	২৩	হাঁটা
খাতি - জাতোলি	২৪৩৮ মি	১৬	হাঁটা
জাতোলি - ধুনিয়াঢঙ্গ	২৬৫০ মি	১০	হাঁটা
ধুনিয়াঢঙ্গ - কাঁটালিয়া	৩২৭৭ মি	৬	হাঁটা
কাঁটালিয়া - মাইকতোলি ময়দান	৩৮৮০ মি	৩	হাঁটা

যাঁরা মাইকতোলি বেস ক্যাম্পে যেতে চান তাঁদের আরো ৭ ঘন্টা প্রাণান্তকর চড়াই ভাঙ্গতে হবে। পর্বতারোহীরা ছাড়া সাধারণ ট্রেকাররা এ পথে যান না। সুন্দরডুঙ্গা যেতে হলে পিন্ডারির পথে খাতি পর্যন্ত আসুন। এখান থেকে ৫ কিমি হেঁটে উমল্যাগ্রামে পৌঁছন, স্কুলবাড়িতে থাকতে পারেন। পরদিন পিন্ডারি আর সুন্দরডুঙ্গা নদীর সঙ্গম পেরিয়ে টানা চড়াইএর পর পৌঁছন জাতোলি গ্রামে। এখানেও স্কুল ঘরে আশ্রয় নিতে পারেন। জাতোলি থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অরণ্য পথ পেরিয়ে ভৈরবনালা। আবার দুর্গম চড়াই। পথ বেশ বন্বুব । এখানে আগে ধুনিয়াঢঙ গুহায় রাত্রিবাস করা যেত। এখন সেপথ ভেঙেচুরে গেছে। পথ বেশ খানিকটা

ওপর দিয়ে চলে গেছে কাঠালিয়ার বোল্ডার নয় আলগা মাটির উপর পথ। প্রচন্ড ঢাল। সাবধানে ধ্বস পেরিয়ে চলে আসুন কাঠালিয়া ময়দানে, এখানে এদিনের মত চলা শেষদিকে। লম্বা পথ হলেও কঠিন পথে কাঠালিয়া ময়দানে এসেই রাত্রিবাস করতে হবে। পরদিন সুকরামনালা আর মাইকতোলি নালার মিলন স্থলে পৌছে যাবেন। এদুটি নদী মিলেই জন্ম দিয়েছে সুন্দরডুঙ্গার। সাধারণ ট্রেকাররা সুন্দরডুঙ্গা দেখে উপরে বর্ণিত পথে উমলা গিয়ে ওখান থেকে ঢাকুরি চলে যেতে পারেন। আর হিমালয়ের দুর্গম স্থানে হাঁটার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলে মাইকতোলি ময়দান পার হয়ে মাইকতোলি হিমবাহের কাছে পৌঁছতে পারেন।

চলবে

ম্যাপ: শান্তনু

বিশ্বের জানালা

বিশ্বের সবচেয়ে দুঃখী দেশ - বুরুন্ডি

উমা ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষা হয়েছিল যে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুখী দেশ কোনটি ; আলোচনায় পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় সবচেয়ে সুখী দেশ সুইজারল্যান্ড,আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ১২৫ তম জায়াগায় আর সবচেয়ে দুঃখী দেশটি হল বুরুণ্ডি। বলতো বুরুণ্ডি কোথায়?

পাশের ছবিটি দেখ, একটি দেশের মানচিত্র দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ড্রাম বাদক মহানন্দে ড্রাম বাজাচ্ছে। মানচিত্রটি হচ্ছে বুরুন্ডি দেশের, আর ড্রাম বাদকেরা হচ্ছে সেই দেশের বিখ্যাত রাজকীয় ড্রাম বাদকের দল। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে ড্রাম বাজাচ্ছে। ড্রামের গায়ে আঁকা আছে সে দেশের জাতীয় পতাকাটি। আয়তাকার পতাকাটি তেরঙ্গা—সবুজ, সাদা আর লাল এই তিনটি রং তিনটি বিষয়ের প্রতীক। বাদকেরা নিজেদের পোশাকেও এই তিনটি রঙই ব্যবহার করেছে। সাদা রং সার্বজনীন শান্তির প্রতীক, সবুজ রং সে দেশের মানুষের আশার প্রতীক, আর লাল রঙটি হল সে দেশের

মানুষেরা যে রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছে তার প্রতীক। যে ড্রামটি তারা বাজাচ্ছে সেটির নাম হল কারিয়েণ্ডা। ঐতিহ্যবাহী এই ড্রামটি দেশের মানুষের কাছে অতি পবিত্র, প্রায় স্বর্গীয় মহিমার। একসময় দেশের জাতীয় পতাকায় এটি আঁকা ছিল,দেশ স্বাধীন হবার পর ড্রামের পরিবর্তে সবুজ দিয়ে ঘেরা তিনটি ছোট লাল তারা আঁকা হয়। দীর্ঘ জাতিসংঘর্ষে লিপ্ত তিনটি বিবদমান জাতির ঐক্যের প্রতীক।

বুরুন্ডির অধিবাসীদের কথা

এবার শোন বুরুন্ডির তিনটি জাতির ইতিহাস। মানচিত্রে দেখ দেশটি মধ্য আফ্রিকার গ্রেট লেক অঞ্চলের আল্বারটাইন রিফটে অবস্থিত। এর তিনদিকে রয়েছে কঙ্গো,তাঞ্জানিয়া,রুয়ান্ডা এই তিনটি দেশ আর একদিকে আছে বিশাল টাঙ্গানিকা হ্রদ। তিন জাতির মিশ্র সংস্কৃতির দেশ বুরুন্ডি। তিনটি প্রধান জাতি হল ত্বোয়া, তুতসি,আর হুতু সম্প্রদায়। ত্বোয়া বর্তমানে দেশে সংখ্যায় অতি নগণ্য –মোট

জনসংখ্যার ১ শতাংশ মাত্র। পেশায় অধিকাংশই কুমোর। এরাই ছিল এখানকার আদিম অধিবাসী। পিগমি জাতীয় এই মানুষেরা ছিল শিকারী বনজীবি মানুষ। বন থেকে শিকার সংগ্রহ করত,বন্যফসল, ফলমূল সংগ্রহ করে আনত,বনের কাছেই গ্রামগুলিতে বাস করত। এদের বিপদ শুরু হল সপ্তম শতাব্দি থেকে হুতুদের আগমন শুরু হলে। পশ্চিমাঞ্চল থেকে হুতুরা একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত ক্রমাগত বুরুন্ডিতে চলে আসতে থাকে, বসতি স্থাপন করে। উচ্চতায় এরা ছিল মাঝারি মাপের। ক্রমবর্ধমান হুতু জনসংখ্যার চাপে ত্বোয়ারা বাস্তুহারা হতে থাকে এবং পিছু হটতে হটতে ক্রমশ অরণ্যসমৃদ্ধ উচ্চভুমির দিকে চলে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে এখানে আর একটি জাতির আগমন শুরু হয়। মোটামুটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দি জুড়ে নতুন চারণভূমির খোঁজে এখানে পশুপালক শ্রেণীর তুৎসি জনজাতির আগমন শুরু হয়। এরা ছিল দীর্ঘকায়।

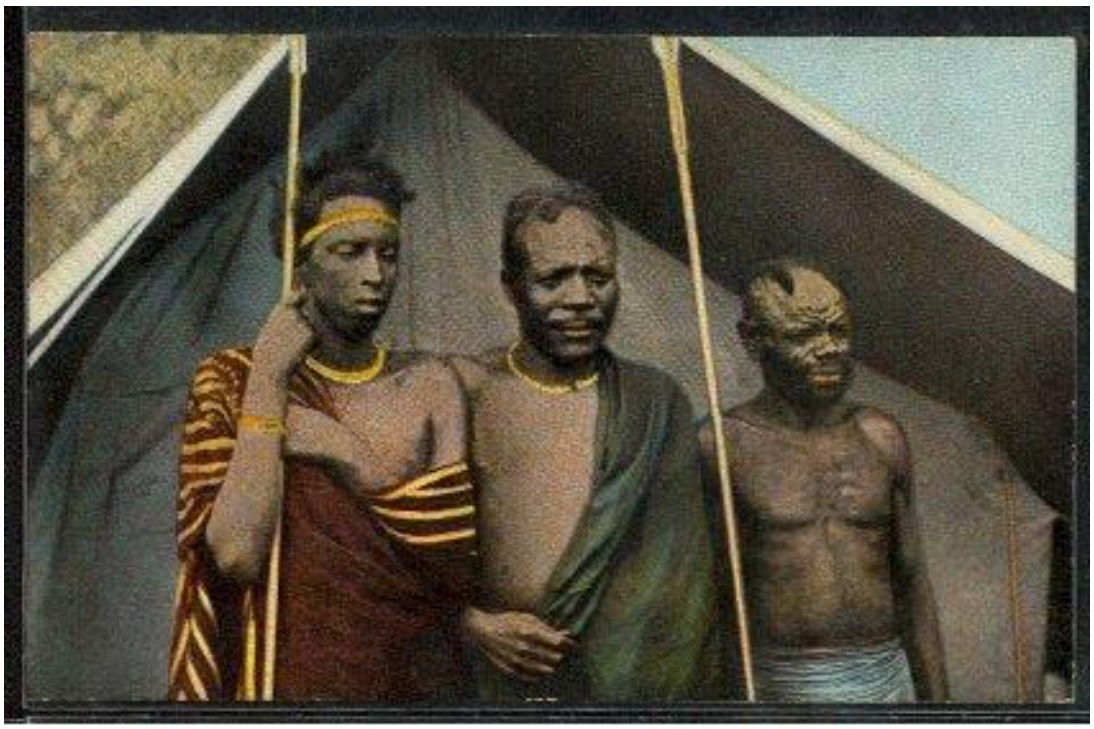

<u>বুরুণ্ডির তিন জাতি—তুতসি, হুতু, ত্বোয়া</u>

ক্রমে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, এরাই বর্তমানে সংখ্যার বিচারে দেশে দ্বিতীয় স্থানে।সংখ্যার বিচারে ১৫% হলেও এরাই ক্রমে সমাজে ক্ষমতা্ দখল করতে শুরু করে। দেশে যাবতীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক,রাজনৈতিক, সামরিক সুযোগসুবিধা

পেতে ও ক্ষমতা অর্জন করতে শুরু করে। পালিত পশুর সংখ্যাও বাড়াতে থাকে। এই পালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি এদের একটা বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। সেটা এইরকম—

বিংশ শতাব্দির শুরুতে জার্মানি ও বেলজিয়াম এই দেশ দখল করে এবং বুরুন্ডি ও রোয়ান্ডা অঞ্চলকে একত্র করে রোয়ান্ডা- বুরুন্ডি নামে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এই উপনিবেশটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি'' ট্রাস্ট টেরিটরি" তে পরিণত হয়, যার শাসন ক্ষমতা থাকে বেলজিয়মের হাতে। উপনিবেশ শাসনকর্তারা এখানে যে 'দশ গরু নীতি' চালু করেছিল তার ফলে যে ব্যক্তির ১০টি বা তার বেশি গরু বা পালিত পশু থাকত তাকে উচ্চবর্ণীয় হিসেবে ধরে নিয়ে সমাজে বিশেষ ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা দেয়া হত। এই বিচিত্র নীতি ও ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকদের চিরাচরিত ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির ফলে ক্রমে জনসংখ্যা বিন্যাসের তারতম্য হতে শুরু হল এখানে। ত্বোয়াদের সংখ্যা তো আগেই কমেছিল। হুতু- রা সমাজে সংখ্যায় বেশি হলেও দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতি ক্ষেত্রেই ক্ষমতার ও সুযোগসুবিধা লাভের দিক দিয়ে তুৎসিদের থেকে পিছিয়ে পড়ছিলো। এই পার্থক্য থেকেই জন্ম নিচ্ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী জাতিবিদ্বেষ। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হুতু আর তুতসিদের নিয়ে পার্লামেন্ট তৈরি হলেও রাজা হলেন একজন তুতসি। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই হুতুরা নিজেদের প্রতারিত বলে সন্দেহ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় হুতু বনাম তুতসিদের এক তেতাল্লিশ বছরব্যাপী নরমেধ যজ্ঞ।

দেশটিতে এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের যে কি দুর্দশা হয়েছে, কত মানুষ নিহত হয়েছেন, কত মানুষ ট্রমার শিকার হয়েছেন, কত যে বাচ্চা মানুষ অনাথ ঘরছাড়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৬২ সালের পর থেকে ২০০৫ সাল অবধি ৩০০,০০০ মানুষের জীবন নিয়ে তারপরে এই লড়াই থেমেছে। তবু এখনও পুরোপুরি বিদ্বেষ মুক্তি হয়নি। তাই আজ দেশটি এক দরিদ্রতম ক্ষুধার্ত দেশ, বিশ্বের প্রথম দশটি দরিদ্রতম দেশের অন্যতম।

কিছু তথ্য

- বুরুন্ডি মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত নিরক্ষীয় জলবায়ুর দেশ। এখানে দুটি বর্ষা ও দুটি শুষ্ক ঋতু।গড় তাপমাত্রা ৬৩ থেকে ৭৩ ডিগ্রি ফারেনহিটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ সেমি- র মত।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব- ৩৬৭.০/ প্রতি বর্গ কিমি তে । হুটু - ৮৫%, তুৎসি- ১৪%,ত্বোয়া- ১%। ২০১১র হিসেবমত জনসংখ্যা প্রায় ৮,২১৬,১৯০।
- ধর্ম –খ্রিষ্টান- ৭৫%, মুসলমান- ২০%, দেশিয়- অবশিষ্টাংশ।
- ভাষা— প্রধানত তিনটি ভাষা ব্যবহার হয় —কিরুন্ডি(সবচেয়ে বেশি),ফরাসি (সরকারি ভাষা), সোয়াহিলি(রাজধানি বুজুম্বারা এলাকায়)। কিছু ইংরেজিও ব্যবহৃত হয়।

- খেলা— ফুটবল, বাস্কেটবল, ট্র্যাক আণ্ড ফিল্ড খেলা দেখা যায়। এছাড়া ড্রাম বাদন,আবাতিম্বু নাচ এদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

- শিক্ষা—যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিতে শিক্ষার হার খুবই কম। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু ৬ বছর বয়সে । ২০০০ সালের হিসাব অনুসারে শিক্ষার হার ছিল প্রায় ৫৯.৩%(পুং ৬৭.৩% ,স্ত্রী ৫২.২%)।
- খাদ্য—মিষ্টি আলু,কাসাভা শেকড়, দানাশস্য, ভুট্টা, ইত্যাদি,অধিক দামের জন্য মাংস খুব কম খায়।
- স্বাস্থ্য—শিশুমৃত্যুর হার বেশি, অপুষ্টি দেশজুড়ে রাজত্ব করছে। চিকিৎসকের সংখ্যা প্রতি ১০০,০০০ জনে ৩ জন।
- মাথাপিছু মোট উৎপাদন খুব কম ।২০১০ র হিসাবে মোট জি-ডি-পি(পিপিপি) $৬৯.৩৯৭ বিলিয়ন।

এত দুঃখ, মৃত্যু ও রক্তপাত সত্ত্বেও দেশটি আজও তাদের প্রধান আর্ট দ্রুম বাদনকে ভোলে নি। ভোলেনি ছবি আঁকা। সঙ্গের এই ছবিটা এঁকেছেন বুরুন্ডির শিল্পী জাঁ আয়ান।